রাজকোট রাজপথ রাজঘাট

জগন্নাথ চক্রবর্তী

গান্ধী বিচার পর্ষদ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

Rajkot Rajpath Rajghat

a critical biography of Mahatma Gandhi

by

Dr. Jagannath Chakravorty,

Sponsored by

Gandhi Study Centre,
Jadavpur University, Calcutta-32

প্রথম প্রকাশ
১৯৬০

প্রচ্ছদ
খালেদ চৌধুরী

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক, রেজিস্ট্রার,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২
কর্তৃক প্রকাশিত

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ থেকে
শ্রীপরেশ চন্দ্র বসু কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

মাকে

গ্রন্থসূচি

ভূমিকা

যখন কলেজে পড়ি মাকে বলতে শুনতাম, "মহাত্মা গান্ধীকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। তিনি কলকাতায় এলে আমাকে একটু নিয়ে যাস, দেখে আসবো।" তখন কিন্তু কলকাতায় ছাত্রমহলে গান্ধীজীর প্রতি চরম বিরূপতা। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসায় তরুণ সমাজ ক্ষুব্ধ এবং গান্ধী-বিরোধী। স্কুলে প্রাইজপুস্তক হিসাবে যখন প্রথম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সংক্ষিপ্ত ইংরেজি আত্মজীবনী পড়ি, তখন গান্ধীকে মানুষ হিসেবে ভাল লেগেছিল। কিন্তু কলকাতায় পড়তে এসে দেখলাম, কলেজহস্টেলে ছাত্রবন্ধুদের কাছে গান্ধী একটি উপহসিত নাম। তখন বেশ কিছু ছাত্রের রাত্রের টেবিলবাতির নিচে সাইক্লোস্টাইল করা নিষিদ্ধ রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস ও কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো খোলা এবং শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুভাষচন্দ্রের তীব্র বৃটিশবিরোধী বক্তৃতা তখন অধিকাংশ তরুণের স্বপ্নে অনুরণিত। আমার কাছেও গান্ধীজীর রাজনীতি বড্ড বেশি নিরামিষ লাগতো: আইরিশ, ফরাসী, মার্কিন এবং বিশেষ করে রুশ বিপ্লবের কাহিনী সাগ্রহে পড়বার পর চরকা, সত্য, অহিংসা একেবারেই মনে ধরতোনা। "আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো"—সুভাষচন্দ্রের এই আহ্বানে অনেক বেশি মাদকতা ছিল এবং ছিল যৌবনের প্রতি অনন্ত আস্থা। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীকে আমার ভালো লাগতো, যদিও সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণও কম ছিলনা। যখন অন্য কেউ গান্ধীজীর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করতো, মন তাতে সায় দিত না, যদিও গান্ধীর রাজনৈতিক মতাদর্শ ঠিক কি সে সম্বন্ধেও আমার সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা। শুধু মাঝে মাঝে মার ঐকান্তিক আগ্রহের কথা মনে পড়তো— "আমাকে একটু কলকাতায় নিয়ে যাস, মহাত্মাকে দেখতে ইচ্ছে করে।"

একবার সত্যিই সুযোগ ঘটলো। ভারতবর্ষ তখনো পরাধীন, ১৯৪৫ কি ৪৬-এর শীতকাল। গান্ধীজী কলকাতার খুব কাছে সোদপুরে এসেছেন। কিন্তু তখন মা অসুস্থ, গ্রাম থেকে কলকাতায় তাঁকে নিয়ে আসা সহজ নয়। তার চেয়ে মনে মনে স্থির করলাম আমি নিজেই যাবো সোদপুর, গান্ধীর মুখ থেকে তাঁর ভাষণ শুনবো, নিজের জন্য নয় অনেকটা মায়ের প্রতিনিধি হয়ে; হয়তো তাতেই খানিকটা মার ইচ্ছা পূরণ করা হবে। যখন প্রার্থনা সভায় পৌঁছালাম, গান্ধীজী তখনো সভায় আসেননি। অগণিত লোক বসে বা দাঁড়িয়ে জায়গায় জায়গায় জটলা করছে। বেশ কিছু মহিলা, বালক-বালিকা ও হরিজন একেবারে সাম্নের দিকে বসে। দূরে একটা কিসের যেন বাজনা বাজছিল। সভার একেবারে পিছনে একটা প্ল্যাকার্ড দাঁড় করিয়ে রেখে কিছু অবাঙালী ভক্ত একত্র বসে ছিলেন, হিন্দীতে প্ল্যাকার্ডে লেখা "গান্ধীজী রামের অবতার", "গান্ধীজী শ্রীকৃষ্ণের অবতার", "গান্ধীজী স্বয়ং ভগবান" ইত্যাদি। সোদপুর স্টেশনে দেখেছিলাম দেয়ালে বড় বড় করে ইংরেজিতে লেখা—"ডাউন উইথ গান্ধী" (গান্ধী নিপাত যাক), "গো ব্যাক গান্ধী" (গান্ধী ফিরে যাও)। সব মিলিয়ে পরিবেশটি আমার কাছে বেশ কৌতুকপ্রদ মনে হয়েছিল। সভায় কোনো মঞ্চ ছিলনা। একটা জলচৌকির উপর শাদা কাপড় বিছানো, সেখানে বসে গান্ধীজী ভাষণ দেবেন। আমি চেষ্টা করে সাম্নে ঐ জলচৌকির খুব কাছে গিয়ে বসলাম। গান্ধীজী একটু পরেই এলেন, করজোড়ে চৌকির সাম্নে এসে বসলেন। আমি তাঁর প্রতিটি আচরণ খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। আমি তাঁর ভক্ত ছিলাম না এবং ভক্তের চোখ দিয়ে মোটেই তাঁকে দেখিনি; মনোযোগী উৎসুক এক তরুণ হিসাবে আমি তাঁকে লক্ষ্য করছিলাম। কৌতুহল এবং ঈষৎ বিরূপতা দুয়েরই মিশ্রণ তখন আমার মনে। তিনি এসে পৌঁছানর পরও সভায় গণ্ডগোল সমানেই চলছিল, বরং যেন একটু বেড়েই গিয়েছিল। মনে

হচ্ছিল এই গণ্ডগোল সহজে থামানো যাবে না। স্বেচ্ছাসেবকরা বারণ করছিলেন হৈ চৈ করতে, কিন্তু কেউ কারো কথা শুনছিলনা, বরং ওতে গণ্ডগোল আরো বেড়ে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম দেখা যাক গান্ধী এই অবস্থায় কী করেন। গান্ধীজীর সামনে একটি ছোট মাইক ছিল। কিন্তু তিনি মাইক থেকে বেশ দূরেই ছিলেন; কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু গেলেন না, শুধু হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে ইংগিত করলেন, এবং নিজে চুপ করেই বসে রইলেন। তারপর বেশ নীচু গলায় মাইক থেকে দূরে বসেই কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন, "শান্ত্‌ হো জাইএ, শান্ত্‌ হো জাইএ।" খুব কাছে বসে আমি শুনছিলাম, তাই আমার কাছে একটু আশ্চর্যই লাগছিলো, কারণ এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে ঐ কথাগুলি তিনি সভার কাউকেই বলছিলেন না, এবং কেউই ঐ কথাগুলি শুনতে পাচ্ছিলনা। গান্ধীজী নিজেও শোনাবার জন্য কোনো চেষ্টা বা আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন না; তিনি গলা চড়াননি, মাইকও কাছে টানেন নি। অথচ ঐ কথাগুলি তিনি খুব নিবিড় আন্তরিক ভাবেই বলছিলেন, এবং এখনো আমার তা স্পষ্ট মনে আছে। আমার স্পষ্টই বোধ হচ্ছিল যে গান্ধীজী ঐ কথাগুলি আত্মগতভাবে নিজেকেই বলছিলেন; যেন ঐ বিরাট সভার গণ্ডগোল থামাবার চেয়েও তাঁর জরুরি কাজ ছিল নিজের মনকে শান্ত রাখা, নিরুত্তাপ রাখা। সেদিন তাঁর বক্তৃতার বিষয় আমার মনের উপর কোনোই দাগ রাখেনি, কিন্তু তাঁর আত্মগত "শান্ত্‌ হো জাইএ" আমি এখনো স্পষ্ট শুনতে পাই। সভা অবশ্য আধ মিনিটের মধ্যেই একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং তারপর ধীরে ধীরে গান্ধীজী যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন একটিমাত্র কণ্ঠস্বরই বাতাসে ভাসছিল। সেদিনকার বক্তৃতার মর্ম আমার মনে নেই, কিন্তু বক্তার মর্ম আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম—অপরকে শান্ত করার মন্ত্র হচ্ছে নিজেকে শান্ত করা, অপরকে জয় তিনিই করবেন যিনি নিজেকে জয় করেছেন। এর অনেক দিন পর গান্ধীজীর

রচনাবলী গুরুত্বসহকারে পড়তে আরম্ভ করি, এবং এখনো সব রচনা পড়ে শেষ করতে পারিনি। কিন্তু যতোই তাঁর রচনার সংগে পরিচিত হয়েছি দেখেছি ঐ প্রার্থনা সভার কণ্ঠস্বরই তাঁর সব লেখার মধ্যে প্রতিধ্বনিত। গান্ধীর সব কথাই আত্মকথা বা আত্মগত কথা। তিনি যখন রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মযোগী তখনও তাঁর কর্মের বাণী আসলে মর্মেরই বাণী।

আমি গান্ধীবাদী নই, কিন্তু গান্ধী-অনুরাগী। গান্ধীবাদ বলতে যদি অনড়, অপরিবর্তনীয় কয়েকটি নীতিবাক্য বোঝায়, তবে গান্ধীজীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে আর যিনিই গান্ধীবাদী হোন না কেন, গান্ধীজী নিজে কখনোই সেরকম গান্ধীবাদী ছিলেন না। যেমন কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন, "আমি মার্ক্সবাদী নই", তেম্নি গান্ধীও নিশ্চয়ই বলতে পারতেন যে তিনি গান্ধীবাদী নন। একটি মন্ত্রপূত মতবাদ কল্পনা করে নিয়ে গান্ধীজীর জীবনকে সেই মতবাদের অভ্রান্ত এবং একমাত্র দর্পণ বলে ধরে নেওয়ার রীতিটি পরিহার না করলে গান্ধীচর্চা এক অন্ধ গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে মরতে বাধ্য হবে। গান্ধীর জীবনে ও কাজে বহু অসংগতি আছে। তিনি নিজের জীবন ও কাজকে এক্সপেরিমেণ্টের বেশি কিছু বলে দাবী করেননি। সবই যে সফল এক্সপেরিমেণ্ট তাও নয়। আবার যা আপাতত অসফল তাই যে ব্যর্থ তাও নয়; বলা যায় অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ এক্সপেরিমেণ্ট থেকে ব্যর্থতা বা সার্থকতার ধ্রুব সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। কোনো বিরাট তাৎপর্যময় প্রচেষ্টা একটি-মাত্র মানুষের মধ্যে, এক পুরুষে, বা এক জীবনে সম্পূর্ণ না হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষের বিরাট মহাকাশ প্রচেষ্টা কি আমরা একজন গাগারিনের মধ্যেই আরব্ধ এবং সম্পূর্ণ দেখবার আশা করি? যদি এমন হয় গান্ধীর মতাদর্শের—যাকে গান্ধীবাদ বলে থাকি—সত্যা-সত্য গান্ধীর মধ্যেই শুরু ও শেষ, গান্ধীর পরে ও গান্ধীর বাইরে তার আর কোনো প্রাসংগিকতা নেই, তাহলে অবশ্য সেসম্বন্ধে

কোনো আলোচনারই প্রয়োজন হয় না। গান্ধী বহু ভুল করেছেন, ভুল স্বীকারও করেছেন। অন্যান্য মানুষের মতো তিনিও এক এক সময় বিচলিত বোধ করেছেন, পথ খুঁজেছেন, কখনো পথের আলো দেখতে পেয়েছেন কখনো বা পাননি। তবু তাঁর বহু ভুলের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট, তাৎপর্যপূর্ণ, অনন্য। এই ভাবেই তাঁকে দেখতে হবে। তাঁকে ভগবান বানালে যেমন ভুল করা হবে, তেমনি তাঁর ভুলগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গান্ধী বা গান্ধী আদর্শকে বাতিল বলে ঘোষণা করলেও ভুল করা হবে। বাস্তব তাৎক্ষণিক সাফল্য দিয়ে গান্ধীকে বিচার করলে তা সুবিচার হবেনা। গান্ধীজী সত্য ও অহিংসায় জাতিকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখা যায় তাঁর সবচেয়ে অনুগত মন্ত্রশিষ্যরাই সেভাবে দীক্ষিত হতে পারেননি। তাহলে কি বোলবো গান্ধীর আদর্শ প্রথম থেকেই ব্যর্থ? এমন নগদ বিদায় দিয়ে গান্ধীকে বিচার করা সংগত হবেনা। দেখতে হবে তাঁর জীবনের, তাঁর আন্দোলন ও কর্মপদ্ধতির, মধ্যে এমন কিছু আছে কি না যা এখনো প্রাসংগিক, যা বহুকাল ধরে প্রাসংগিক থাকবে। বিশ্বের ও দেশের বহু সমস্যাই গান্ধীর জীবদ্দশায় যা ছিল এখন তার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে বহুগুণিত ও জটিলতর হয়েছে ; দেখতে হবে এগুলির সমাধানের পথে গান্ধীনির্দেশ এখনো মূল্যবান কি না।

গান্ধী মতাদর্শের শক্তি নির্ভর করবে নূতন নূতন পরিস্থিতি মোকাবিলায় তার ব্যবহার্যতার মধ্যে। নূতন সৃষ্টিধর তরুণ নেতারা—যেমন মার্টিন লুথার কিং—গান্ধীর মূল দৃষ্টিভংগি ও আদর্শকে যদি বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে সার্থক সৃষ্টিশীল ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, তবে গান্ধীর প্রকৃত শক্তি ও তাৎপর্য প্রমাণিত হবে। গান্ধী-জীবনীর মধ্যে গান্ধীবাদ বা গান্ধী আদর্শের চরম সার্থকতা লিপিবদ্ধ আছে এমন মনে করিনা, বরং অনেক ব্যর্থতা ও অসার্থকতার দৃষ্টান্তই সেখানে পাওয়া যাবে। গান্ধীর অসার্থকতা প্রমাণ করতে যাঁরা ব্যস্ত তাঁরা গান্ধার আত্মজীবনী থেকেই যথেষ্ঠ উদ্ধৃতি দিতে পারেন।

অপর পক্ষে, পুঁথিপড়া গান্ধীবাদ, উদ্ধৃতিমুখর গান্ধী-প্রবক্তা খুব কাজে আসবে না। ভারতবর্ষে, বা কোনো দেশেই, নেতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, বরং সাহসী আদর্শবাদী একদল তরুণের প্রয়োজন আরো বেশি করে দেখা দিচ্ছে। গান্ধীর নামকীর্তনেরও দরকার নেই; গান্ধীর মতো করে হ্রস্ব পোষাক পরিধানেরও প্রয়োজন নেই, বা তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও কর্মপ্রণালীর বাইরের দিকগুলিকে হুবহু অনুকরণ করারও সার্থকতা নেই। গান্ধীর সমস্ত জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার সংগে পরিচিত হলে আমরা তাঁর যে মূল জীবনদর্শন বা দৃষ্টিভংগির পরিচয় পাই তার যতোখানি বা যতোটুকু দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনে ও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি ততোই ভালো। গান্ধীর বাণী সর্বক্ষণ কণ্ঠস্থ না রাখলেও ক্ষতি নেই যদি ন্যায়-অন্যায় বোধ আমাদের তীক্ষ্ণ থাকে।

গান্ধীবাদের চমৎকারিত্ব এই যে, দলীয় রাজনীতির যুগে, নানা দল নানা মত থাকা সত্ত্বেও, বহু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য রূপায়ণের দেশকাল নিরূপণে মতভেদ থাকলেও, প্রত্যেক দল বা ইজমের সংগে গান্ধী-দৃষ্টিভংগিকে যুক্ত করা সম্ভব, এবং যুক্ত করলে তা এই দলগুলিকে গুণগত ভাবে উন্নত করবে, এবং সার্থক ভাবে দেশের রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন, ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী ও প্রকৃতই জনগণমুখী করে তুলতে পারবে। দলের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য দল, একথা তখন স্বীকৃত হবে।

সব মতবাদই—ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ-দর্শন যারই হোক না কেন—থিওরিতে সুন্দর শোনায়, যুক্তিতে নিখুঁত মনে হয়। কিন্তু যখনই প্রয়োগ করতে যাই তখনই নানা অপভ্রংশ ঘটে। তার কারণ, "মানুষ" একটি নিছক জীব বা যন্ত্র নয়, তার সম্বন্ধে অঙ্ক কষে বা ফর্মুলা দিয়ে কোনো চূড়ান্ত রায় দেওয়া যায় না। মতবাদ মানুষকে যতোটা না বদলাতে পারে মানুষ মতবাদকে তার চেয়ে অনেক বেশি বদলে দিতে পারে। মানুষই শুধু মানুষকে বদলাতে

পারে, মতবাদ মানুষকে বদলাতে পারে না। মানুষ যাতে নিজেকে বদলাতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টিই সমাজ বা রাষ্ট্রের কাজ হওয়া উচিত। একই মতবাদের পরস্পর বিপরীত প্রয়োগ কেন হয় এটি অনুধাবন করতে হবে। এর কারণ এই নয় যে, একজন মতবাদ সঠিক বুঝেছে ও প্রয়োগ করেছে এবং আরেকজন বোঝেনি। এর কারণ, প্রত্যেক মানুষই পৃথক। আমরা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বলি বটে, জনসাধারণই রাষ্ট্রশক্তির আধার। কিন্তু বাস্তবে দেখি, রাষ্ট্রশক্তি জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে; রাজধানীতে, সেক্রেটারিয়েটে, রাজনৈতিক দলের ওয়ার্কিং কমিটি বা পলিটব্যুরোতেই ক্ষমতা ন্যস্ত। "শক্তি" বা "ক্ষমতা" কারো দয়ার দান হিসাবে আসে না, অর্জন করতে হয়, রক্ষা করতে হয়। আশ্চর্য এই যে দলগত রাজনীতিতে ব্যক্তির ভূমিকাকে স্বেচ্ছায় ছোট করতে বলা হয়। ব্যক্তি ক্ষমতার উৎস, ব্যক্তিকে সেই ক্ষমতা পার্টি বা পার্টি পরিচালিত সরকারের হাতে হস্তান্তর করতে বলা হয়, ব্যক্তির বিচারবিবেককে পার্টির বা কোনো সংস্থার বিচারের সংগে মিলিয়ে দিতে বলা হয়। "আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে মুক্তি দেবো" এটি সব পার্টি নেতৃত্বেরই কথা। "ভোট দাও, ট্যাক্স দাও, আনুগত্য দাও, আমি তোমাকে ভাতরুটি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেবো" এটি সব ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রকর্তাদের কথা। সব ক্ষমতা ব্যালট বাক্সের মধ্য দিয়ে হস্তান্তরিত হবার পর সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের বা সরকারের কাছে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা—দেহি, দেহি, দেহি; যেন 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি' মন্ত্রেরই রূপায়ণ; চাকরি দাও, খাদ্য দাও, পদোন্নতি দাও, আক্রমণ থেকে বাঁচাও। এর মধ্যে কোথাও আত্মনির্ভরশীলতার কথা নেই। রাষ্ট্রনির্ভরশীলতা যে পরনির্ভরশীলতাই তা আমরা মনে রাখি না বলেই নিজেরা কোনো সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি না। আমরা পুলিশ ডাকি, মন্ত্রী ডাকি, গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ চাই। বাইরের কেউ বা কোনো সংস্থা এসে সাহায্য না

করলে, উদ্ধার না করলে, উপায় বাতলে না দিলে, আমরা নিরূপায়, অসহায়। সরকার ভোটদাতাদের বলেন—দাও দাও দাও ; ভোট দাতা সরকারকে বলে—দাও দাও দাও ; রাস্তাঘাট দাও, পানীয় জল দাও, ট্রেন এরোপ্লেন দাও। আমরা পরস্পরের প্রার্থী। আগে ঈশ্বরের কাছে যেমন লোকে বিপদে আপদে প্রার্থনা করতো, এখন তেমনি সরকারের কাছে করে। উভয় ক্ষেত্রেই চাই নির্ভরশীলতা, নইলে প্রার্থনা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই।

আগামী দিনের ভারতবর্ষ কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও যুবশক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। গান্ধীজী ছিলেন চিরতরুণ, অকুতোভয় আদর্শবাদী। গান্ধীজীর স্বপ্ন তরুণের স্বপ্ন না হলেও, তারুণ্যেরই স্বপ্ন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান্ধী ছিলেন তারুণ্য ও প্রাণশক্তিতে প্রাণবন্ত। দুঃখের বিষয়, তরুণ বন্ধুদের কাছে গান্ধীর এই সাহসী তারুণ্যের ছবিটি একেবারেই তুলে ধরা হয়না। যেন গান্ধী পাড়ার বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্তদের ধর্মীয় আলোচনার অন্যতম উপকরণ মাত্র, যেন আধুনিক যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সংগে গান্ধীর কর্মধারা ও ধ্যান ধারণার কোনোই যোগসূত্র নেই। কিন্তু একদিন ভারতের তরুণদের কাছেই, তরুণ ইনটেলেকচুয়ালদের কাছেই গান্ধীর প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্ফুট হবে। কারণ ন্যায়-অন্যায়ের বোধ তরুণদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত। তারা বুঝবে, অজ্ঞতায় কোনো বাহাদুরি নেই ; অজ্ঞান কোনো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।

গান্ধীকে প্রথম হত্যা করা হয় ১৯৪৮ খৃঃ র ৩০শে জানুয়ারি ; কিন্তু সেই তাঁর শেষ হত্যা নয়। তারপরও বহুবার বহুভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, এবং এখনও প্রতিদিন করা হচ্ছে। তাঁর রাজ-নৈতিক চরিত্র হননের বিরাম নেই, বিরাম নেই তাঁকে নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করার। কিন্তু বুলেট দিয়ে হত্যা করেও তাঁকে একেবারে মেরে ফেলা সম্ভব হয়নি, বিকৃতি ও কুৎসা ছড়িয়েও তাঁকে

নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হবে না; অজ্ঞতা, বিকৃতি ও অবহেলায় নিক্ষেপ করেও তাঁকে মুছে ফেলা যাবে না। এরকম চেষ্টা যাঁরা করবেন ক্ষতি তাঁদেরই।

গান্ধীর উপরে কোনো ব্যক্তি বা দলের ট্রেডমার্ক দেওয়া নেই, গান্ধী তা দিতে দেননি। তিনি কারো নিজস্ব সম্পত্তি নন, যদিও এভাবে তাঁর নাম ব্যবহার করার চেষ্টা সর্বদাই হয়ে থাকে। যাঁরা নিজেদের গান্ধীর সবচেয়ে বিরোধী বলে ভাবেন তাঁরাই দেখা যাবে জেনে বা না জেনে গান্ধীর অনেক কিছুই অনুকরণ ও অনুসরণ করছেন, এবং আজ না করলেও কাল বা পরশু করতে বাধ্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীকে আত্মসাৎ না করে শুধু গান্ধী-বিরোধিতার পথে ভারতবর্ষে প্রকৃত স্থায়ী, কল্যাণকর কোনো রাজনীতি বা সমাজনীতি গড়ে ওঠা শক্ত। এক হিসাবে গান্ধীর সংগে কোনো দলেরই বিরোধ নেই, কারণ তিনি সব দলমতেরই একটি প্রয়োজনীয় পরিপূরক। বৃটিশরাজ সাম্রাজ, ফৌজীরাজ, ধর্মরাজ, ধনিকরাজ, বণিকরাজ, আমলারাজ, একনায়করাজ, পার্টিরাজ, কোনটিই পৃথিবীর কোথাও জনগণরাজ বা স্বরাজ কায়েম করতে পারেনি। কাজেই যতদিন এইসব রাজ কোনো না কোনো আকারে প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন গান্ধীর প্রয়োজনীয়তাও থাকবে। মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার চেয়ে বড় আর কিছুই হতে পারে না। কোন কিছুর বিনিময়েই মানুষ এ অধিকার হারাতে রাজী হতে পারে না। আর্থিক সুখ ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্য, এগুলির জন্য সংগ্রাম চলবেই; কিন্তু এই সংগ্রামের অজুহাতে মুক্তি বা স্বাধীনতার সংগ্রাম, স্বরাজের সংগ্রাম, বন্ধ থাকবে তা নয়; তাও একই সংগে চলতে থাকবে। তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যেন মুক্তমনে সবকিছুই বিচার করে, যাচাই করে, দেখে নিতে পারেন। গান্ধী, নেহেরু, নেতাজী, বা মার্ক্স, লেনিন, মাওসেতুং কেউই সমালোচনার উর্দ্ধে নন, কাউকেই সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করার দরকার নেই। লক্ষ্যে পৌছাবার পথ মাত্র একটিই, এমন গোঁড়ামি

যেন তাদের পেয়ে না বসে। গান্ধী কাউকে গান্ধীবাদী হতে বলেন নি, তিনি চেয়েছেন প্রত্যেকেই যেন শেষপর্যন্ত আত্মবাদী থাকতে পারেন, বিবেকবান থেকে নিজের পথ খুঁজে নিতে পারেন, এবং আদর্শে তন্নিষ্ঠ থাকতে পারেন। কোন্ দল ভাল কোন্ দল মন্দ, গান্ধীর কাছে এই বিচার একেবারেই অপ্রাসংগিক। ব্যক্তি ও ব্যক্তিবিবেকের চেয়ে কোনো দলকেই তিনি বড় বলতে প্রস্তুত ছিলেন না। আবার কোনো দলেরই তিনি নিছক বিরোধিতা করেন নি।

গান্ধীর আত্মজীবনী একটি মূল্যবান দলিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আত্মচরিত ঠিক জীবনচরিতের অভাব পূরণ করতে পারে না। আত্মচরিতের বাংলা অনুবাদ অবশ্য আছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় একখানি ছোট গান্ধী জীবনচরিতের প্রয়োজন তবু রয়ে গেছে। টেণ্ডুলকরের সুবৃহৎ গান্ধীজীবনী আসলে একটি বৃহৎ আকর গ্রন্থ এবং এর কোনো বাংলা অনুবাদও নেই। তাছাড়া একালের তরুণ সমাজের কাছে একালের বিশিষ্ট ভাবনাচিন্তা, ধ্যানধারণা, দর্শন ও দৃষ্টিভংগির পক্ষে প্রাসংগিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কোনো গান্ধীজীবনীই পরিবেশিত হয়নি। আমার সীমিত জ্ঞান ও পরিমিত সাধ্য নিয়ে আমি এই অভাব পূরণের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র। জীবনী অংশে কোনো নতুন সংযোজন সম্ভব নয়, যেহেতু গান্ধীর জীবনী এখন ইতিহাসের অংশ। কিন্তু জীবন-ভাষ্য যেখানে যা যোগ করেছি তা অনেকটাই ব্যক্তিগত এবং তা যে সর্বত্রই অভ্রান্ত এমন দাবী করি না। জীবন-ভাষ্যে বিতর্কের অবকাশ আছে এবং থাকবে। প্রত্যেক যুগই নিজের মতো করে গান্ধীকে ব্যাখ্যা করবে। আমি অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি বা ই-এম-এস নাম্বুদিরিপাদের মতো নির্ব্যক্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের পথ গ্রহণ করিনি। অবশ্য রাজনৈতিক ব্যাখ্যাতারাও গান্ধীর ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন নি। অধ্যাপক হীরেন

লিখেছেন :—"গান্ধীর কাছে ভারতের ঋণ অপরিশোধ্য। বিশেষ করে তিনিই আমাদের সমস্ত জনগণকে শিখিয়েছেন বিজেতা শাসককে ভয় না করতে। তিনি আমাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছেন, আমাদের আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছেন। তাঁর প্রশান্তির মধ্যে তিনি আমাদের ভারতবর্ষের আত্মাকেই মূর্ত করে তুলেছেন" (Gandhiji A Study পৃ : ৯০)। নাম্বুদিরিপাদ লিখেছেন :—"আমার প্রথম রাজনৈতিক চেতনার উৎস মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব এবং ১৯২০-২১ খৃঃ মহাত্মা পরিচালিত ভারতব্যাপী আন্দোলন……তখন থেকে শুরু করে আমি মহাত্মা ও তাঁর শিক্ষার মধ্যেই বড়ো হয়ে উঠেছি……এবং নিজে গান্ধী অনুবর্তী গঠনমূলক কর্মীদের ডিসিপ্লিন গ্রহণ করেছি, যে ডিসিপ্লিনের কিছু কিছু চিহ্ন এখনো আমার মধ্যে বিদ্যমান" (The Mahatma and the Ism, পৃঃ vii)। তিনি আরো লিখেছেন :—"তাঁর জীবন এমন ঘটনাবহুল, তাঁর ভাষণ ও রচনা এত বিপুল ও জীবনের এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত, নানা পর্যায়ে তাঁর কার্যাবলী এত নাটকীয় যে, তাঁর জীবনী ও বাণী থেকে যে কোনো শিক্ষাথা গান্ধীজী বা গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তার নিজের প্রিয় থিওরির প্রামাণ্য সমর্থন সহজেই পেতে পারে" (পৃঃ ১১২)।

আমার মনে হয়েছে, নির্ব্যক্তিক রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে গান্ধীর কর্মমূলে পৌঁছান গেলেও মর্মমূলে পৌঁছান যায় না, আর মর্মমূলে না পৌঁছালে গান্ধীর কিছুই জানা বা বোঝাও হয় না। প্রসংগত অনেক বই আমাকে পড়তে হয়েছে, তবে বর্তমান গ্রন্থে লুই ফিশার, প্যারেলাল, নির্মল বসু, জওহরলাল নেহরু, রিচার্ড গ্রেস, জফ্রে অ্যাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, হীরেন মুখার্জি, নাম্বুদিরিপাদ, রম্যাঁ রলাঁ, কুমারাপ্পা, মার্টিন লুথার কিং, রাইনহল্ড-নীবুর এবং বিশেষ করে টেণ্ডুলকর ও স্বয়ং গান্ধীজীর বই থেকেই বেশি সাহায্য নিয়েছি। মূল আত্মজীবনা পড়বার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি বলে গুজরাতী ভাষাও কিছুটা আয়ত্ত করতে হয়েছে।

এবিষয়ে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন প্রখ্যাত গুজরাতী কবি ও গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীউমাশংকর যোশী। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র সম্পূর্ণ ফাইলটি কবে গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত পাওয়া যাবে জানিনা। এর অভাব প্রতি পদেই অনুভব করেছি। উদ্ধৃতি সবই বাংলাতেই দিয়েছি, এবং সব ক্ষেত্রেই অনুবাদ আমার নিজের। তবে যেখানে অনুবাদ অনেকটা সচ্ছন্দ, হয়তো একেবারে হুবহু নয় সেখানে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করিনি। উদ্ধৃত কবিতাংশগুলিও যতোটা পেরেছি বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে, বইটিতে আরো বেশি সময় ও মনোযোগ দিতে পারলে ভালো হত; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের মধ্যে এর চেয়ে অতিরিক্ত সময় কিছুতেই সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি, এজন্য দুঃখ রয়ে গেল।

এই বইয়ের যা কিছু ত্রুটি সবই আমার; এর যদি এক কণা কৃতিত্ব থাকে তবে তা সম্পূর্ণই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গান্ধীবিচার পর্ষদের, বিশেষ করে অধিকর্তা অধ্যক্ষ অসীম দত্ত ও সচিব অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁদের উৎসাহ ছাড়া আমার মতো স্বল্প বিদ্বানের পক্ষে এই গ্রন্থ রচনায় হাত দেবার প্রশ্নই উঠতো না এবং সেজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার সামান্য সুযোগটুকু গ্রহণ না করে পারছিনা। কলাবিভাগের ডীন, ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এই সামান্য রচনার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন এজন্য আমি তাঁর কাছেও বিশেষ ভাবে ঋণী।

এই বইয়ের প্রেসকপি তৈরি করেছেন শ্রীসত্যেন চক্রবর্তী, এবং গান্ধীভবনের যাবতীয় গ্রন্থ যে কোনো প্রহরে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছেন গান্ধী বিচার পর্ষদের যুগ্মসম্পাদক শ্রীহিমেন্দু বিশ্বাস। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

রাজকোট রাজপথ রাজঘাট

প্রথম অধ্যায়

"আমাদের বংশধররা হয়তো বিশ্বাসই করতে পারবে না যে এরকম একজন রক্তমাংসের মানুষ কোনদিন সত্যিই এই পৃথিবীর উপর বিচরণ করেছিলেন।" একথা যিনি বলেছিলেন তাঁর নাম আইনস্টাইন, এবং এ উক্তিটি যাঁর সম্বন্ধে তিনি হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, আমাদের গান্ধীজী।

"এ রকম একজন মানুষ" বলতে আইনস্টাইন ঠিক কী বুঝাতে চেয়েছিলেন? স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে, গান্ধীজীর মধ্যে অসাধারণত্ব কী ছিল? রাজকোটের ইস্কুলে তিনি ছিলেন একেবারেই সাধারণ ছাত্র, নামতা মুখস্থ করতেই গলদঘর্ম; টেনিস ক্রিকেট খেলেছেন কিন্তু উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হতে পারেননি; বেলুন উড়িয়েছেন, লাট্টু ঘুরিয়েছেন, মাউথ অর্গানেও মুখ দিয়েছেন কিন্তু সুর তুলতে পারেন নি; আত্মহত্যা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে এসেছেন; হরিশচন্দ্র নাটকে রাজা হরিশচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা অল্প বয়সে তাঁর মনে খুব দাগ কেটেছিল ঠিকই, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে তিনিই আবার বিড়ি সিগারেট খাওয়াও অভ্যাস করেছেন। সিগারেট কিনবার জন্য এমনকি বাড়ীর চাকরের পকেট থেকে পয়সা চুরি করতেও তাঁর বাধেনি। অনুতাপ অবশ্যই করেছেন, এমনকি সারা জীবনে আর সিগারেট খাননি। কিন্তু এর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নেই। অল্প বয়সে পবিত্রতা বা পাপ পুণ্যের বোধ অনেক যুবককেই মনস্তাত্ত্বিক সংকটে ফেলে; আত্মহত্যার ইচ্ছা অনেকের মনেই উদয় হয় এবং সিগারেট খাওয়া অনেকেই ধরে এবং কেউ কেউ ছেড়েও দেয়। আজকাল অবশ্য তের বছর বয়সের কোনো ছেলে বিয়ে করে না, কিন্তু গান্ধীজীর যুগে সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তের বছর বয়সে কস্তুরবাঈয়ের সংগে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর মোহনদাস কখনই

কস্তুরবাঈকে কাছ ছাড়া করতে চাইতেন না, সর্বদাই সন্দেহ ও ঈর্ষায় জ্বলে মরতেন। এমনকি কস্তুরবাঈ মন্দিরে বা বন্ধুদের বাড়ীতে গেলেও তিনি ঈর্ষান্বিত হতেন। বালিকা কস্তুরবাঈ ভয়ানক রেগে যেতেন বালক স্বামীর এই ঈর্ষাকাতরতায়। কস্তুরবাঈ একগুঁয়ে কম ছিলেন না। স্বামী মোহনদাস খুব চেষ্টা করেও তাঁকে সামান্য অ-আ-ক-খ র বেশি লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি, কারণ লেখাপড়ায় কস্তুরবাঈয়ের কোনো আগ্রহ ছিল না।

স্কুলে গান্ধী ছিলেন একেবারে সাধারণ ছাত্র। তিনি পাঠ্য বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি, এমনকি তাঁর হাতের লেখাও ভাল ছিল না। খেলাধুলা ভালবাসেননি, তুখোড় একেবারেই ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভয়ানক ধরণের ভীতু। অন্ধকারে ভয় পেতেন, চোরের ভয় ছিল, তদুপরি ছিল ভূতের ভয় ; তাই সারারাত ঘরের এক পাশে একটা আলো জ্বেলে রাখতেন। কস্তুরবাঈয়ের অবশ্য এ সব ভয় একেবারেই ছিল না।

গুজরাতী কবি নর্মদের একটি ছড়া তখন ইস্কুলের ছেলেদের মুখে মুখে :—

অংগ্রেজো রাজ্য করে, দেশী রহে দবাঈ,
দেশী রহে দবাঈ, জোনে বেনাঁ শরীর ভাঈ
পেলো পাঁচ হাত পূরো, পূরো পাঁচ সেনে।

অর্থাৎ :—

ইংরেজ রাজত্ব করে দ্বিগুণ চেহারা
দেশীকে দাবিয়ে রাখে পালোয়ান গোরা
মাথায় পাঁচ হাত যেন পাঁচজন তারা।

স্কুলেই মোহনদাস শেখ মেহতাব নামে একটি যুবকের সংস্পর্শে আসেন। শেখ মেহতাব তাঁকে বোঝায় যে মাংস না খেয়ে ভারতীয়রা শক্তিমান হতে পারবে না, স্বাধীন হতে পারবে না। ইংরেজ রাজত্ব করছে কারণ ইংরেজ শক্তিমান, ইংরেজ শক্তিমান কারণ ইংরেজ মাংস

খায়। অতএব গান্ধী রাজী হলেন মাঝে মাঝে গোপনে নদীর ধারে গিয়ে রুটি আর গোস্ত খেতে। গান্ধীর গোঁড়া পরিবারে কেউই মাংস খেতনা। সবাই ছিল নিরামিষাশী। গান্ধী মাকে মিছে কথা বলতেন যে শরীর ভালো নেই, ভাত খাব না, এবং লুকিয়ে লুকিয়ে মাংস খেয়ে আসতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই মাংস খাওয়া চললো। শেখ মেহতাব তাঁকে শুধু মাংস ভক্ষণই নয়, গণিকালয়ে পর্যন্ত নিয়ে গেল; মোহনদাস তাঁর ভাইয়ের হাতের সোনার গহনা চুরি করে বিক্রি পর্যন্ত করলেন। এর কোনটিতেই আমরা গান্ধীর অসাধারণত্ব দেখি না। কিন্তু তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তখন সবে অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। তিনি অসৎ সংগে পড়ে দুষ্কর্ম করতে থাকলেন, কিন্তু পশ্চাত্তাপও তাঁর হতে লাগলো প্রচণ্ড। তিনি তাঁর রুগ্ন শয্যাশায়ী বাবার কাছে একটি লিখিত স্বীকারোক্তি করলেন। সেই কাগজের টুকরো পড়ে তাঁর বাবার চোখে জল এল। এই স্বীকারোক্তির মধ্যে মোহনদাসের ভাবী জীবনের ইংগিত আমরা পাই। গোপনতাই পাপ, যিনি সত্য সন্ধানী, তিনি কিছুই গোপন করতে চান না, কারণ সত্যের মধ্যে গোপন করবার মতো কিছু নেই, সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। পরবর্তীকালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যে আত্মকথা লেখেন তার নাম দিয়েছিলেন "সত্যনা প্রয়োগো" অর্থাৎ সত্যের নানা পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেণ্ট। এই আত্মকথায় তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় এবং নৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতি ও যৌন জীবনের কথাও খুব খোলাখুলি লেখেন। তাঁর বাবা কাবা গান্ধী যখন মৃত্যু শয্যায় তখন মুমূর্ষু পিতার কাছে বসেও তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা, কস্তুরবাঈয়ের কথা; এবং রাত্রে রোগী পরিচর্যার কর্তব্য ফেলে চলে গিয়েছিলেন ঘুমন্ত আসন্ন প্রসবা কস্তুরবাঈয়ের কাছে, যৌন সংগ লাভের জন্য। যখন ফিরে এলেন, দেখলেন তার একটু আগেই পিতার মৃত্যু হয়েছে। এই একদিনের অন্যায় যৌন লালসার জন্য গান্ধীজী সারাজীবন অনুতাপ করেছেন। আত্মজীবনীতে এই কাহিনী বর্ণনা করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, পরে

ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তিনি খুবই গোঁড়া মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং ধীরে ধীরে নিজের স্ত্রীর সংগে পর্যন্ত যৌন সংসর্গ ত্যাগ করেছেন।

বাবার অসুখের মধ্যে মোহনদাসের মনের উপর আরো একটি জিনিষ গভীর ছাপ ফেলেছিল। রোগীর নিরাময়ের জন্য পরিবারের একজন বন্ধু, লাধা মহারাজ, মাঝে মাঝে এসে রামায়ণ পাঠ করতেন। গান্ধী রামচরিত মানসেরকাহিনী খুব নিবিষ্ট মনে শুনতেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সব কিছু ত্যাগের দৃষ্টান্ত তাঁকে উদ্বুদ্ধ কোরতো। গান্ধী পরিবার হিন্দু হলেও পরিবারের সংগে অনেক গণ্য-মান্য মুসলমান, পার্শী ও জৈন ভদ্রলোকের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাবা গান্ধীর মৃত্যুর পর পুতলীবাঈ পারিবারিক সমস্যায় পরামর্শের জন্য যাঁকে খুব বেশী ডাকতেন তিনি হচ্ছেন একজন জৈন সাধু, বেচারজী স্বামী। গান্ধীর নিজের ধর্মমত এই সব প্রভাবের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠছিল। কোনো একটি বিশেষ ধর্ম বা ধর্মমত বা ঈশ্বর নয়, বলা যায় একটি দৃঢ় নীতি-ধর্ম বা নৈতিক জীবনকেই তিনি মনে মনে নিজের ধর্ম বা বিশ্বাস-ভুমি বলে মনে করতে আরম্ভ করেছিলেন। নীতিই সব কিছুকে ধরে আছে এবং সব নীতিরই সার হচ্ছে সত্য। এই সত্যই তাঁর ধর্ম হয়ে উঠলো। অন্যান্য পূজা-অর্চনা যাগ-যজ্ঞের তুলনায় হরিশচন্দ্র নাটক ও রামায়ণ মহাকাব্যই তাঁর জীবনের ধর্ম-বিশ্বাসকে বেশী দৃঢ় করেছিল। অন্যায়ের বদলা অন্যায় নয়, অন্যায়ের উত্তর দাও ন্যায় দিয়ে, অপকারের বদলে উপকার করো, এই হল তাঁর নীতি। গুজরাতী কবি শ্যামল ভট্টের কয়েকটি শ্লোক এই সময় গান্ধীর খুব প্রিয় হয়ে ওঠে :—

পাণী আপনে পায়, ভলুঁ ভোজন তো দীজে ;
আবী নমাবে শীশ, দণ্ডবত কোডে কীজে।
আপণ ঘাসে দাম, কাম মহোরোনুঁ করীএ ;
আপ উগারে প্রাণ, তে তণা দুঃখমাঁ মরীএ।
গুণ কেডে তো গণ দশগুণো, মন, বাচা, কর্মে করী
অবগুণ কেডেজে গুণ করে, তে জগমাঁ জীত্যোসহী

অর্থাৎ ঃ—

জল নিয়ে দান করো সুখাদ্য অপরে
যে কুশল পোছে করো দণ্ডবৎ তারে।
দাম নাও নামমূল্য কাজ দাও সোনা
তোমাকে বাঁচালে কেউ প্রাণ রাখিও না।
মন মুখ কাজে এক গুণীজন যিনি
এক গুণ পেলে দেন দশগুণ তিনি,
অপকার পেয়ে তবু দেন উপকার
এ জগতে নেই জেনো তুলনা তাহার।

১৮৬৯ খৃঃ ২রা অক্টোবর গুজরাতের পোরবন্দরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম। ১৮৮৭ খৃঃ অর্থাৎ আঠারো বছর বয়সে আমেদাবাদ থেকে তিনি বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। শতকরা ৪০ ভাগেরও সামান্য কিছু কম নম্বর পেয়ে তিনি কোনোমতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ভবনগরে শ্যামলদাস কলেজে পড়াশুনা করতে যান, কিন্তু পড়াশুনায় উন্নতির বদলে মাথাধরা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া ইত্যাদি রোগে ভুগতে থাকেন। এই ব্যাধি কতটা শারীরিক কতটাই বা মানসিক তা বলা কঠিন। যখন তিনি রাজকোটে ফিরে এলেন তখন আত্মীয়স্বজনেরা মোহনদাসের ভবিষ্যত নিয়ে খুবই চিন্তিত। তিনি কি বংশের ধারা অনুসরণ করে পোরবন্দরের মুখ্যমন্ত্রী হবেন? এবং সেজন্য কী পড়লে ভাল হবে? তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল ডাক্তারি পড়া, কিন্তু অভিভাবকদের কারো এতে সায় ছিল না। তাঁরা স্থির করলেন গান্ধী আইন পড়বেন, এবং আইন পড়বার জন্য ইংলণ্ডে যাবেন। এজন্য খরচ লাগবে, সে না হয় মেটানো যাবে, কিন্তু কালাপানি পার হবার পর ছেলের ধর্ম থাকবে তো? পুতলী বাঈ যথারীতি বেচারজীকে ডেকে পাঠালেন। বেচারজী এক অভিনব পন্থা বের করলেন। পুতলীবাঈয়ের ছেলেকে মায়ের সাম্নে বসিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন—প্রবাসবাসের সময় মদ মাংস বা নারী ছোঁবেন না।

১৮৮৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধী জাহাজে চড়লেন। উনিশ বছরের এই বিবাহিত যুবক গান্ধীর মধ্যে তখন পর্যন্ত এমন কোনো বিশেষ গুণ বা প্রবণতার প্রকাশ আমরা দেখিনা যা থেকে নিশ্চিত কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। সাধুসন্ত তো ননই বরং অনেকটা অবিশ্বাসী; জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকের বদলে দেখি তিনি ইংলণ্ড সম্বন্ধে এক স্বপ্নালু উচ্চ ধারণার পোষক।

অক্টোবর মাসের শেষে জাহাজ ইংলণ্ডে পৌঁছালো। গান্ধীর পকেটে অনেক গণ্যমান্য লোকের নামে পরিচয়পত্র ছিল, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য রণজিৎ সিংজী, দাদাভাই নওরোজী এবং ডঃ মেহতা। ডঃ মেহতা লণ্ডনের "ভিক্টোরিয়া" হোটেলে গান্ধীর সাথে দেখা করতে এসে তাঁকে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। ইংলণ্ডে থাকতে হলে কতকগুলি ইংরেজি সহবত শিখতে হবে। চেঁচিয়ে কথা বলবেনা, প্রথম সাক্ষাতেই অন্যকে প্রশ্ন করবেনা, ভুল সময়ে কাউকে "স্যার" এই সম্বোধন করবেনা, অন্যের জিনিষে, যেমন টুপিতে, হাত দেবেনা, ভিক্টোরিয়া হোটেলের মতো দামী হোটেলে থাকবেনা, ইত্যাদি। যেমনি কথা তেমনি কাজ। ডঃ মেহতা গান্ধীর জন্য রিচমণ্ডে তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই বন্ধুর বাড়ীতে তাঁর ইংরেজি শেখার খুব সুবিধা হল, এবং জীবনে এই প্রথম তিনি মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। তাঁর প্রিয় সংবাদপত্র ছিল ডেইলি নিউজ, ডেইলি টেলিগ্রাফ ও পেল্‌মেল্‌ গেজেট।

রিচমণ্ডের বাড়ীতে নিরামিষ খাওয়া নিয়ে গান্ধী খুব অসুবিধায় পড়লেন। গৃহকর্ত্রী প্রতিদিন তাঁকে উপদেশ দিতে লাগলেন, ইংলণ্ডের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মাংস না খেলে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটবে, এমন কি বেন্থামের "থিওরি অব ইউটিলিটি" বই থেকে স্বপক্ষে যুক্তি উদ্ধৃত করেও শোনালেন। গান্ধী এই সব যুক্তি খণ্ডন করতে পারলেন না। অথচ মার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং পুরাণ ও মহাকাব্যে

বর্ণিত সত্যবাদিতার যে সব কাহিনী—যেমন হরিশচন্দ্রের—তাঁর মনে এমনই মুদ্রিত হয়ে ছিল যে তিনি মন শক্ত করবার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। অথচ তখন ঈশ্বরে তাঁর খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। এই সময়ে তিনি শুনলেন যে লণ্ডনে কয়েকটি নিরামিষ রেস্তোরাঁ আছে, কিন্তু তিনি এদের কোনো ঠিকানা জোগাড় করতে পারলেন না। একদিন এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে তিনি ফ্যারিংটন স্ট্রীটে "সেন্ট্রাল" রেস্তোরাঁটি আবিষ্কার করলেন। শোকেসে রাখা একটি পুস্তিকা কিনে মন দিয়ে পড়লেন, পুস্তিকাটি হচ্ছে "নিরামিষ ভোজনের সপক্ষে", লেখক হেনরি স্টিফেন্স সল্ট, প্রকাশের তারিখ ১৮৮৬ খৃঃ। সল্টের পুস্তিকাটিতে তরুণ গান্ধী তাঁর মনের অনেক না-বলা-বাণী যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন। সল্ট লিখেছিলেন, মানুষ পুরোনো অভ্যাস ও ধরণধারণ সংস্কার করে, পরিবর্তন করেই সভ্য হয়েছে। নিরামিষ আহার ও খাদ্য সংস্কারও একটি প্রয়োজনীয় সংস্কার; নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত হলে শরীর ত অটুট থাকবেই, পরন্তু স্নায়ু স্নিগ্ধ থাকবে এবং মদ বা ধুমপানের আকাংক্ষা সহজেই দুরীভূত হবে। মানুষের সঙ্গে সব চেয়ে বেশি মিল বানরের; অথচ বানর ফলভোজী। পশুপালন করে পরে মাংসের জন্য পশু হত্যা করা শুধু নিষ্ঠুর নয়, ব্যয়বহুল ও বীভৎস। শেলী, থোরো এবং রাসকিনের দৃষ্টান্ত দিয়ে হেনরী সল্ট তাঁর যুক্তিকে জোরালো করেছিলেন। সল্ট বিশ্বাস করতেন সমাজে সোশ্যালিজম বা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উন্নত সোশ্যালিস্ট সমাজের সংগে নিরামিষ ভোজনই হবে সুসংগত। এই পুস্তিকার লেখক একজন ইংরেজ; এবং এতে কোন হিন্দুশাস্ত্র বা সংহিতার কথাই ছিলনা; উদ্ধৃতি তো দূরের কথা, পরন্তু লেখক কোনো গোঁড়ামি না দেখিয়ে পাঠককে আহ্বান করেছেন পরীক্ষা করে দেখতে সত্যিই নিরামিষ আহারে শরীর ও মনের ক্ষতি হয় না উন্নতি হয়। সল্টের লেখা পড়ে গান্ধীর আরেকটা ভুল ভেঙে গেল, স্কুলের সেই ছড়া, যা বাল্যকালে

তিনি বিশ্বাস করেছিলেন,—"অংগ্রেজো রাজ্য করে, দেশী রহে দবাঈ" ; মাংসভোজী বলেই ইংরেজরা শক্তিমান এবং শাসক, একথা একজন ইংরেজ মিথ্যা প্রমাণ করলেন। তিনি আরো একটি পুস্তিকা পড়লেন—"আহারের সেরা পদ্ধতি"—লেখিকা একজন ইংরেজ মহিলা ডাক্তার, নাম অ্যানা কিংসফোর্ড। আরো একটি বই পড়লেন, ডাঃ অ্যালিনসনের নিরামিষ ভোজীদের জীবনী সম্বলিত একটি অভিধান এতে ছিল হাওয়ার্ড উইলিয়মস রচিত "খাদ্যনীতি" ; এতে কবি শেলীর উল্লেখ ছিল এবং শেলী সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা ছিল। এই সব রচনায় শরীর গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয়তার দিকটাই গান্ধীর মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। নিরামিষভোজীদের সংস্পর্শে এসে গান্ধী তখনকার আধুনিকতম অন্যান্য ভাবধারার সংস্পর্শেও এলেন। ভারতের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা যখন বার্ক বা মেকলের আলোচনাতে ব্যস্ত গান্ধী তখন অনেক বেশি আধুনিক গ্রন্থ ও ভাবধারার সংগে পরিচিত হচ্ছিলেন।

একই সময়ে গান্ধী আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন কি করে পুরোদস্তুর ইংরেজের মতো ইংরেজ সমাজে চলাফেরা করতে পারেন, ইংরেজি কেতাদুরস্ত হতে পারেন। কিনলেন হ্যাট, কোট, ওয়েস্টকোট, সান্ধ্যস্যুট, দস্তানা, টাই, রেশমী শার্ট, রূপোবাঁধানো ছড়ি, কিছুই বাদ গেলনা। এমন কি বাড়িতে লিখলেন ঘড়ির জন্য সোনার চেন পাঠাতে। সকালে টাই বাঁধতে ও চুল মকসো করতেই তাঁর অনেক সময় ব্যয় হত। তাছাড়া ফরাসী ভাষা শেখা থেকে নাচ শেখা পর্যন্ত নানাধরণের ক্লাশেও ভর্তি হলেন। কিন্তু তিন মাস যেতে না যেতে তাঁর চৈতন্য হল, এসব কী হচ্ছে ? খালি টাকা খরচ। তাঁর বেনিয়া মন এই বেহিসাবী খরচে একেবারেই সায় দিল না। তিনি আলাদা একটি ঘর ভাড়া নিয়ে নিজের মতো থাকতে আরম্ভ করলেন ; নিজের রান্নাও নিজে করতে লাগলেন। জোর পড়াশুনা চললো লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার জন্য। ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ ও রসায়নের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু ১৮৯০ খৃঃ জানুয়ারি মাসের পরীক্ষায় দেখা গেল ল্যাটিনে তিনি ফেল করেছেন। ছ'মাস বাদে জুনমাসের পরীক্ষায় অবশ্য তিনি পাশ করলেন।

আমিষ-নিরামিষ প্রশ্ন আমাদের কাছে অবান্তর মনে হয়। "আপ রুচি খানা" এবং "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" খাওয়া ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার; এ নিয়ে গোঁড়ামি করার কিছু নেই। কিন্তু ইংলণ্ডে যাঁরা খাদ্যবিপ্লবের কথা ভাবছিলেন তাঁরা শুধু খাদ্যবিপ্লবই নয়, সমাজ-বিপ্লব সম্বন্ধেও মাথা ঘামাচ্ছিলেন। এই দলের সংস্পর্শে এসে গান্ধী প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন সমাজ পরিবর্তনের নবীন ধারণাগুলির সংগেও পরিচিত হচ্ছিলেন। নিরামিষভোজীদের দলে হেনরি সল্ট তো ছিলেনই, তাছাড়াও ছিলেন দলপতি এডোয়ার্ড কার্পেন্টার। এঁর অনুবর্তীরা সমাজবিপ্লব সম্বন্ধে নানারকম চিন্তা করছিলেন। ভিক্টোরিঅ সমাজ সম্বন্ধে এঁরা ছিলেন বীতস্পৃহ, এবং প্রচলিত মানবসভ্যতাকে তাঁরা চাইছিলেন ঢেলে সাজতে। মানুষের খাদ্যাভ্যাস, যৌন সম্পর্ক ও ধর্মীয় ধারণাগুলি তাঁরা নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে চাইছিলেন। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে মৌল পরিবর্তন আনতে পারলে তবেই হবে প্রকৃত বিপ্লব। কেউ চাইলেন শেলীর মত "ফ্রী লভ" বা অবাধ প্রেম, কেউ বা চাইলেন পূর্ণ সংযম বা ব্রহ্মচর্য; আবার কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ওকালতি করলেন। তবে একটি বিষয়ে তাঁরা ছিলেন একমত। ভিক্টোরিঅ বিবাহ প্রথাকে তাঁরা সকলেই মানুষ কেনাবেচার প্রথা বলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করতে চাইলেন। ধর্ম বিষয়েও নানারকম মতবাদ এই নব্য সংস্কারকেরা আমদানি করেছিলেন। কেউবা অজ্ঞেয়বাদ বা অ্যাগনস্টিসিজমের প্রবক্তা হলেন, কেউবা কুসংস্কার মুক্ত নব্য চার্চের এবং যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত উপদেশের কথা তুললেন, বা মরমীআ সাধনাকে স্বাগত জানালেন। আবার কেউ কেউ সর্বধর্মের অন্তর্নিহিত সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানুষের ধর্মের সপক্ষে ওকালতি করলেন। সকলেরই এক

বিষয়ে মতৈক্য দেখা গেল—প্রচলিত খ্রীষ্টীয় চার্চের বিরোধিতা। এই দলের সভ্য হিসাবে গান্ধী তখনকার দিনের সর্বাধুনিক মতবাদগুলির সংগে শুধু পরিচিতই হলেন না, এইসব ভাব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি নিজস্ব জীবনদর্শন উপলব্ধি করতে বা গড়ে তুলতে অনেক বেশি সমর্থ হলেন। সরল জীবন ও সু-উচ্চ ধ্যানধারণার এঁরা সকলেই প্রবক্তা। এঁদের চিন্তা ছিল নৈতিক সমাজবাদ থেকে নৈরাজ্যবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। মিঃ সল্টের বন্ধুদের মধ্যে নির্বাচিত ক্রোপটকিনও ছিলেন অন্যতম। এঁদের আরাধ্য ছিলেন শেলী ও থোরো। শেলী ও থোরোর রচনা পড়ে তাঁরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন যে প্রেমের স্থান সবার উপরে; অহিংস প্রতিবাদ ও অসহযোগের অস্পষ্ট ধারণাও তাঁরা পেয়েছিলেন শেলী ও থোরোর কাছ থেকেই। অবশ্য এরকম আইন অমান্যের কোনো বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষা তখনও কোথাও হয়নি। এঁদের সংগে রুশ কথাসাহিত্যিক তলস্তয়ের সংযোগ ঘটে। তলস্তয় নিজেই মিঃ সল্টকে স্বরচিত নিরামিষ ভোজনের সপক্ষে লিখিত একটি পুস্তিকা পাঠান। এর আগেই উইলিয়ম মরিস "নিউজ ফ্রম নো হয়ার" শীর্ষক রচনায় অহিংস বিপ্লব ও স্বেচ্ছা-ব্রহ্মচর্যবাদের কথা বলেছিলেন।

এই নিরামিষ প্রবক্তাদের সংগে আরেকটি গ্রুপের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই গ্রুপটি "ফেবিআন সোসাইটি" নামে সুপরিচিত। সল্ট নিজে ফেবিআন সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ফেবিয়ান সোসাইটির অনুমোদিত "হিউম্যানিটেরিয়ান লীগ" নামে আরও একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থা অর্থনৈতিক সংস্কারের চাইতে নৈতিক সংস্কারের উপরই জোর দিতে চাইল বেশি। সিডনি অলিভিয়ার, এডোয়ার্ড কার্পেণ্টার, অ্যানি বেসান্ত, হাওয়ার্ড উইলিয়মস প্রভৃতি উৎসাহী বৃন্দ এই লীগের সক্রিয় সদস্য হলেন।

অ্যানি বেসান্তের নাম আমাদের দেশে খুবই পরিচিত। থিও-

সফিক্যাল সোসাইটির তিনি ছিলেন প্রাণ ও প্রতিষ্ঠাত্রী। শ্রীমতী বেসান্ত নারীস্বাধীনতা, শ্রমিক কল্যাণ, সমাজ সংস্কার, প্রকৃত পক্ষে তখনকার সব কিছু প্রগতি আন্দোলনেন সংগেই যুক্ত ছিলেন। সল্ট নিজেকে অজ্ঞেয়বাদী বা অ্যাগনস্টিক বলতেন, তাঁর বন্ধুরা অনেকেই ছিলেন ফ্রীথিংকার বা স্বাধীনচিন্তক, কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাস তাঁরা মানতেন না। ১৮৮৯ খৃঃ স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তাদের অনেকের মধ্যে সংশয়ের দোলা দেখা দেয়। অ্যানি বেসান্ত তো সরাসরি থিওসফি বা পরমার্থ নিয়েই এই সময় মেতে উঠলেন। থিওসফির যোগিনী ছিলেন মাদাম ব্লাভাতস্কি। মাদাম ব্লাভাতস্কির গ্রন্থ "কী টু থিওসফি" বা "পরমার্থবাদের চাবিকাঠি" গান্ধী মন দিয়ে পড়লেন। "সত্যের চেয়ে বড়ো কোনো ধর্ম নেই" এই উক্তি গান্ধীর মনে মুদ্রিত হল। মাদাম খ্রীষ্টধর্মের কঠোর সমালোচনা করেন এবং জন্মান্তরবাদ, ব্রহ্মচর্য ও নিরামিষ ভোজন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি দাবী করেন অদৃশ্য মহাত্মারা সূক্ষ্ম দেহে তাঁকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। গান্ধী থিওসফির প্রতি খুব আকৃষ্ট হন নি, কিন্তু এই বিদেশীদের বক্তৃতা ও রচনা থেকে হিন্দু ধর্ম যে একেবারে অসার নয় এই ধারণা তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়। সব ধর্মের ঘনীভূত সার সত্য পরমার্থ, মাদাম ব্লাভাতস্কি তারই পক্ষে প্রচার করছিলেন। এর পিছনে যে অনুপ্রেরণা ছিল তা প্রধাণত প্রাচ্যদেশীয়, বিশেষ করে হিন্দু ধ্যান-ধারণা। "ডেইলি টেলিগ্রাফ"-এর সম্পাদক স্যার এডুইন আরনল্ড "দ লাইট অব এশিয়া" বা "এশিয়ার আলো" নামক দীর্ঘ কাব্যটি লিখে ইতিমধ্যেই ইংরেজ পাঠকদের কাছে বুদ্ধকে পরিচিত ও জনপ্রিয় করেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর গীতার ইংরেজি অনুবাদ হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্বের সংগে পাশ্চাত্য পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়েছিল। গান্ধী এদের প্রত্যেকের সংগে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়েছিলেন, প্রত্যেকের চিন্তাধারা তাঁর নিজের চিন্তাধারা সন্ধানে সাহায্য করেছিল। কোনো সংস্কার বা বিপ্লবকেই সুনির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রমে

বা প্রোগ্রামের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। সমাজ, অর্থনীতি, নীতি, নরনারীর সম্পর্ক, যে কোনো বিষয়ে নাড়া দিতে গেলেই দেখা যাবে মানুষের সামগ্রিক মুক্তির প্রশ্ন মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহা, যুক্তির স্পৃহা, মুক্তির স্পৃহা, সাম্যের স্পৃহা, আত্মজিজ্ঞাসার বিবিধ রূপ, সবই সামনে এসে পড়ে। খাদ্যসংস্কার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছিলেন তাঁরাই আবার স্বাধীন চিন্তার জন্য আন্দোলন করছিলেন, তাঁরাই ফেবিআন সোসাইটি, থিওসফিক্যাল সোসাইটি, হিউম্যানিটারিয়ান লীগেরও সদস্য ছিলেন। একই পরিবেশ থেকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দিকে আত্মবিকাশ খুঁজে পায়। একই লণ্ডন পরিবেশ, একই থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও ফেবিআন সোসাইটির আঁওতায় বার্ণার্ড শও এসেছিলেন। গান্ধী ও শ ঘুটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব; এঁরা পরে দুটি আলাদা পরিমণ্ডলে খ্যাত হয়েছেন। আমাদের দেশেও দেখি শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখরা যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন" পত্তন করছিলেন তখন নানা ভাবের ও আদর্শের মানুষ এসে মিলিত হয়েছিলেন এক সাথে, একটি সহানুভূতিকে রূপ দিতে, সেই সহানুভূতি হচ্ছে জাতীয় নবজাগরণ। লণ্ডনের এই নব্য সংস্কারকগণও দেখি প্রায় বিপরীত মেরুতে অবস্থিত থেকেও একই সমিতির সদস্য হয়েছেন।

১৮৯০ খৃঃ গান্ধী লণ্ডন নিরামিষ ভোজী সমিতির ("লণ্ডন ভেজিট্যারিআন সোসাইটি") সভ্য হন। অচিরেই তিনি যে পাড়ায় থাকতেন সেখানে একটি স্থানীয় "নিরামিষ ভোজী ক্লাব" স্থাপন করেন। তাঁর অনুরোধে "দ ভেজেট্যারিআন" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ডঃ ওল্ডফিল্ড সভাপতি এবং স্যার এডুইন আরনল্ড সহ সভাপতি হতে রাজী হন। বলতে গেলে এখানেই গান্ধীর নিজ দায়িত্বে একটি সমিতি পরিচালনার হাতে খড়ি। এই ভাবে পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতিপর্ব গান্ধীর প্রায় অজ্ঞাতেই শুরু হয়েছিল।

তবু এই প্রস্তুতি পর্বেও গান্ধী অসাধারণ কিছু ছিলেন না। পরবর্তী জীবনে গান্ধীজীর অসাধারণত্ব সত্বেও তিনি সাধারণ মানুষই ছিলেন এটি বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। সাধারণ মানুষ ছিলেন বলেই সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য ও আচরণযোগ্য কথাই তিনি বলেছেন বার বার; কোনো অতিরিক্ত বা অলৌকিক আলোকচ্ছটা তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপর লাগাবার কোনো প্রয়োজন হয় না।

ভারতবর্ষের বাল্যবিবাহ প্রথা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের কোনো ধারণাই ছিল না। বালক বালিকার মধ্যে যে বিয়ে হতে পারে এটা তারা ভাবতেই পারতো না। যে সব ভারতীয় ছাত্র বাল্যবিবাহিত তারা যে বিবাহিত একথা লজ্জায় কখনোই প্রকাশ কোরতো না, এবং অন্য অবিবাহিত যুবকের মতোই বিলেতে মেয়েদের সংগে অবাধ মেলামেশার সুযোগ নিত। গান্ধীও ব্যতিক্রম ছিলেন না। এমনকি কেনসিংটনে থাকবার সময় তাঁর বাড়ীঅলীর (ল্যাণ্ডলেডী) মেয়ের সাথে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব করবার সময় কস্তুরবাঈ ও নিজের সন্তানের কথা তিনি বেমালুম চেপে থাকতেন। তাঁর মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই ছিল, হয়তো অন্যদের তুলনায় একটু বেশিই ছিল; কিন্তু এই দ্বন্দ্ব কারই বা না থাকে? তিনি নারী পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে বরাবর পিউরিটান পন্থী ছিলেন; কিন্তু পিউরিটানরাও রক্তমাংসেরই মানুষ এবং গান্ধীও তাই। আদর্শগত ভাবে পিউরিটান হলেও তাঁর আচরণে সর্বদা নীতিবাগীশতা প্রকাশ পেতনা। ১৮৯০ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে পোর্টসমাউথে যখন একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে গান্ধী যোগ দিতে যান তখন যে নিরামিষ হোটেলে উঠেছিলেন তার নাম ছিল "শেলটনের নিরামিষ হোটেল"; হোটেলঅলার যুবতী কন্যা মিস শেলটনের সংগে গান্ধীর বন্ধুত্ব হয়। তাঁরা দুজনে পাহাড়ে খুব হৈ চৈ করে বেড়াতে যেতেন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন। এর আগে ১৮৮৯ খৃঃ যখন তিনি ব্রাইটনে বেড়াতে যান তখন এক বিধবা মহিলার সংগে আলাপ হয়। মহিলাটি এই

অনভিজ্ঞ বিদ্রোহী যুবককে প্রতি রবিবার তাঁর লণ্ডনের বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ করেন। লণ্ডনে ফিরে গান্ধী তাঁর বাড়ীতে গেলেন এবং দেখলেন মহিলাটির সংঙ্গে একটি তন্বী মেয়েও থাকে, এবং তিনিই তার অভিভাবিকা। গান্ধী প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ঐ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেন এবং অনেক সময় যখন অভিভাবিকা থাকতেন না তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান্ধী ও ঐ মেয়েটি নিরালায় একত্র কাটাতেন। কয়েক সপ্তাহ যেতে গান্ধী বুঝতে পারলেন তুজনের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশই নিবিড় হয়ে উঠছে। তাঁর খুব অস্বস্তি হল। অবশেষে গান্ধী এক লম্বা চিঠি লিখে মহিলাটিকে জানালেন যে তিনি বিবাহিত এবং দেশে তাঁর স্ত্রী রয়েছেন। মহিলাটি অবশ্য ভেবেই পেলেন না এই সামান্য ব্যাপারে গান্ধী এত অস্থির হয়ে উঠছেন কেন। এই চিঠির পরও তিনি ওদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ কেড়ে নেননি।

১৮৯১ খৃঃ মে মাসে আরো একটি ঘটনা ঘটে। একটি নিরামিষ ভোজী কনফারেন্সের পর রাত্রে গান্ধী, তাঁর তুজন বন্ধু, ও যে-বাড়ীতে তাঁরা উঠেছিলেন সেখানকার গৃহকর্ত্রী তাশ খেলতে বসেন। তাশের আড্ডায় নানারকম হাসি মশকরা ও চটুল বাক্যালাপ চলতে থাকে এবং বেশ স্পষ্টভাবেই সংগিনী মহিলাটি গান্ধীকে যৌন লালসায় আকৃষ্ট করতে থাকেন, এবং গান্ধীও আকৃষ্ট হন। অবশ্য শেষ মুহূর্তে তিনি নিজের বিপদ বুঝতে পারেন, মার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তাঁর মনে পড়ে, এবং ছুটে গিয়ে তিনি নিজের ঘরে একলা দরজা বন্ধ করে দেন।

গণিকালয়ের অভিজ্ঞতা গান্ধীর আরো হয়েছিল। ১৮৯৩ খৃঃ যখন দ্বিতায় পুত্র মনিলালের বয়স ছয়, তখন গান্ধী আইনজীবীর চাকরি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যান। যে জাহাজে যাচ্ছিলেন তার কাপ্তেনের সংগে গান্ধীর খুব ভাব হয়। জাহাজ যখন জাঞ্জিবার পৌছাল তখন কাপ্তেন গান্ধীকে নিয়ে বন্দরে নামলেন একটু আরাম

করবার জন্য। গান্ধীকে না জানিয়ে কাপ্তেন তাঁকে নিয়ে গেলেন এক নিগ্রো গণিকার কাছে। গান্ধী উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত হবার বদলে আড়ষ্ট হয়ে রইলেন মাত্র। নিজের উপর তাঁর চরম লজ্জা হল।

নীতির প্রশ্নে তাঁর প্রথম প্রতিবাদের ঘটনাটি এই সময় ঘটে। নিরামিষ সমিতির সভাপতি মিঃ হিলস পিউরিটানপন্থী ছিলেন। এ হিসাবে গান্ধীর সংগেই তাঁর ছিল মিল। নিরামিষ সমিতির কার্যকরী সমিতির অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন হিলসের মনোনীত এবং হিলসের নীতির সমর্থক। সদস্য হিসাবে ডঃ অ্যালিনসন—নিরামিষ আহার সম্বন্ধে যাঁর বই গান্ধী আগেই পড়েছিলেন—কিন্তু হিলসের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন না। ডঃ অ্যালিনসন ছিলেন জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে, আর হিলস ছিলেন জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী। হিলস তাঁর বিরোধী মতের জন্য অ্যালিনসনকে কমিটির সদস্যপদ থেকে বিতাড়িত করতে উদ্যোগী হলেন। গান্ধীজী আজীবন কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে হিলসের গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং ডঃ অ্যালিনসনের পদ্ধতিতে তাঁর সায় ছিল না। কিন্তু নিরামিষ সমিতির সভাপতি সদস্যদের উপর সমিতির বিষয়বহির্ভূত তাঁর নিজস্ব ন্যায় নীতির ধারণাও চাপিয়ে দিতে পারেন কিনা এই প্রশ্নে গান্ধী হিলসকে সমর্থন করতে পারলেন না। শুধু তাই নয়, নীতির প্রশ্নে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়া উচিত। সংখ্যালঘু হলেও সংখ্যাগুরুর অনুশাসন এখানে চলতে পারে না। গান্ধী গুছিয়ে বলতে পারবেন না এই আশংকায় ১৮৯১ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুয়ারি কমিটির সভায় তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ও যুক্তি লিখে আনেন, এবং নিজে নার্ভাস বোধ করায় দ্বিতীয় একজন সদস্যকে দিয়ে সেই লেখাটি সভায় পাঠ করান। বলা বাহুল্য, ভোটের জোর ছিল মিঃ হিলসের পক্ষে এবং গান্ধীর এই প্রতিবাদে কোনো ফল হয়নি। গান্ধী জানতেন তিনি দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। যাঁর সপক্ষে তিনি

দাঁড়িয়েছেন ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সংগে গান্ধীর দৃষ্টিভংগির মিল নেই। তবু নীতিগত ভাবে তিনি এই প্রতিবাদ জানানো দরকার মনে করেছিলেন। ১৮৯১ খৃঃ ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখটি স্মরণীয়। নৈতিক প্রতিবাদে এইদিন গান্ধীর হাতে খড়ি বলা যায়।

থিওসফিস্ট সোসাইটির গ্রুপে যাতায়াতের সময় একদিন একটি মজার ব্যাপার ঘটে। দুজন থিওসফিস্ট বন্ধু এডুইন আরনল্ডকৃত ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ পড়ছিলেন; তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের হিন্দুধর্মের মর্মবাণী অনুধাবন করা। একজন জলজ্যান্ত হিন্দু গান্ধী সামনেই উপস্থিত রয়েছেন দেখে তাঁদের খুব আশা হল, গান্ধীর নিশ্চয়ই মুল গীতা ভালভাবেই পড়া আছে এবং তিনি নিশ্চয়ই অনায়াসে তাঁদের কাছে মুল গীতা ব্যাখ্যা করে শোনাতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা খুবই হতাশ হলেন যখন গান্ধী সবিনয়ে জানালেন, তিনি জীবনে কখনো গীতা পড়েননি, মুল সংস্কৃত তো নয়ই এমনকি ইংরেজি বা গুজরাতী ভাষায় অনুবাদও নয়। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে তিনি গীতার ইংরেজি অনুবাদটি চেয়ে নিয়ে পড়লেন, এবং পড়ে মুগ্ধ হলেন। এই ভাবে ইংরেজি অনুবাদ দিয়েই তাঁর গীতায় হাতে খড়ি হল। পরবর্তীকালে তিনি যে নিজেই গীতার এক ব্যাখ্যা রচনা করবেন তা তখন তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। গান্ধী তখনও মহাত্মা হননি, হবেন এমন কোনো সম্ভাবনাও তখন কেউ কল্পনা করেনি। তিনি আরনল্ডকৃত গীতা অনুবাদেই সর্বপ্রথম "মহাত্মা" শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখেন। এটি আশ্চর্য যে বরাবরই গান্ধী বিদেশী দৃষ্টিকোণ ও ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে স্বদেশের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সমর্থন পেয়েছেন। মিঃ সল্টের পুস্তিকা পড়ে গান্ধী যেমন নিরামিষ ভোজন বিষয়ে আত্মপক্ষের সমর্থন পেয়েছিলেন, তেমনি পেয়েছেন আরনল্ডের গীতা অনুবাদ পড়ে দেশীয় ঐতিহ্যের স্বাদ। পরবর্তীকালে এমারসনের প্রবন্ধ পড়বার সময়ও দেখা যায় তিনি পশ্চিমা গুরুর কাছে ভারতীয় জ্ঞানের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে

সর্বদাই উৎসুক। দেশী ধ্যাণধারণা বিদেশী ফিলটারে বা ছাকনির মধ্য দিয়ে এলে তার সারমর্ম বুঝতে ও অনুধাবন করতে অনেক সময় সুবিধা হয়। অভ্যাস ও সংস্কারের ধুলোয় অনেক সময় নিহিত সত্য পাতালনিহিতই থেকে যায়।

পাশ্চাত্য দেশ তাঁকে পাশ্চাত্য ধারায় দীক্ষিত করতে পারেনি, কিন্তু প্রাচ্য ধারার সংগে তাঁর সুস্থ ও সাবলীল পরিচয় ঘটিয়েছে। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী চোখ ও মন প্রাচ্যের জ্ঞান ভাণ্ডারকে পুরোহিত দর্পণের অংশ হিসাবে দেখেনি, এবং গান্ধীর অবিশ্বাসী মন এই পাশ্চাত্য চোখ ও মনের সাহায্যেই তাঁর সনাতনী বিশ্বাসে দৃঢ় হতে পেরেছিল। য়ুরোপের দূরবীন দিয়ে এশিয়া আবিষ্কার না করলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা গান্ধীতে উত্তীর্ণ হতেন কিনা সন্দেহ। শুধু ভারতীয় দর্শন কেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও গান্ধীর জ্ঞান ছিল নিতান্ত সামান্য। ১৮৯১ খৃঃ জুন মাসে গান্ধী ব্যারিস্টারি পাশ করেন। যাঁর কাছ থেকে তিনি আইন ব্যবসায়ের উপদেশগুলি গ্রহণ করেন সেই মিঃ পিনকাট গান্ধীর আইনের জ্ঞান সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, গান্ধী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না। অতএব তিনি গান্ধীকে ছয় খণ্ডে সমাপ্ত ও সদ্য প্রকাশিত কে ও ম্যানেলস-এর "হিস্ট্রি অব ইনডিয়ান মিউটিনি" বইটি পড়তে দেন।

১৮৯০ খৃঃ একজন নিরামিষাশী খৃস্টান গান্ধীকে এক খণ্ড বাইবেল পড়তে দেন। "ওল্ড টেস্টামেণ্ট" তার খুব ভালো লাগেনি, কিন্তু 'সারমন অব দি মাউণ্ট' তিনি বার বার পড়েন। যীশু খ্রীষ্টের 'রেজিস্ট নট ইভিল' শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের উপদেশের মতোই তিনি মনোগ্রাহী জ্ঞান করেন। এর পর গান্ধী মহম্মদ সম্বন্ধেও আহগ্রী হন। এবং এই আগ্রহও আসে ইংরেজ লেখকের রচনার মধ্য দিয়ে। কার্লাইলের "হিরোজ অ্যাণ্ড হিরো ওয়রশিপ" গ্রন্থে 'হিরো অ্যাজ এ প্রফেট' পড়ে তিনি মহম্মদকে শ্রদ্ধা করতে শেখেন। মহম্মদের সাহস, সরল জীবন যাপন, উপবাস, নিজের জুতো জামা নিজে সেলাই এগুলি

গান্ধীরই মনের কথা। এখানেও দেখি সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি – পাশ্চাত্যের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর প্রাচ্য পরিচয়।

বিলেতে গান্ধীর এই প্রস্তুতি পর্বে কিন্তু খুব একটা অসাধারণ কিছু আমরা দেখি না। ওখানকার নিরামিষ সভার ম্যাগাজিনে ভারতবর্ষের পূজাপার্বণ উৎসব অনুষ্ঠান খাদ্য ও পোষাক প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। মজার কথা এই যে, সত্যের পূজারী গান্ধী কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি প্রবন্ধের একেবারে প্রথম বাক্যটিতেই ছিল একটি ভুল বা অসত্য উক্তি। তিনি লিখেছিলেন ভারতবর্ষে পঁচিশ মিলিয়ান অর্থাৎ আড়াই কোটি লোকের বাস। গান্ধী পড়ে পাওয়া সত্যের কারবারী ছিলেন না, ভুল সংশোধন করতে করতে তিনি তাঁর সত্য অর্জন করেছিলেন। গান্ধীর এই প্রথম মুদ্রিত ভুল বাক্যটি যেন এই সত্য সন্ধানেরই সূচক। গান্ধী ভুল করেছেন, ভুল করতে তিনি ভয় পাননি, ভুল করতে করতেই সত্যের পথে দৃঢ় হয়েছেন। গান্ধী তাঁর জীবনে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন; শেষ জীবনে প্রায় প্রত্যহই প্রার্থনান্ত ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু বিলেত থেকে ফিরবার সময় যখন বন্ধুদের বিদায় অভিনন্দন জানানোর জন্য হবর্ণ রেস্তোরাঁয় একটি সভার আয়োজন করেন তখন বক্তৃতা দিতে উঠে মুখচোরা গান্ধী কথা হারিয়ে ফেলেন, এবং প্রকৃত পক্ষে একটি মাত্র বাক্যেই তার বক্তৃতা শেষ হয়। তিনি শুধু বলেন, "বন্ধু ও অতিথিরা এখানে সমবেত হওয়ায় আমি আনন্দিত।" এই বলেই তিনি বসে পড়েন। এই লাজুক গান্ধীর সংগে পরবর্তী কালের গান্ধীর অবশ্য কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লজ্জা ভাঙলো এর পরবর্তী পর্বে। প্রথম বিদেশ বাসের পর এবার তার দ্বিতীয় বিদেশ বাস। প্রয়োজন ছিল আঘাতের, এবং এই আঘাত ইংলণ্ডে পাননি, ভারতে ফিরে আসার পরও তাঁর জোটেনি। আঘাত পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। এখানেই শুরু পরবর্তীকালের গান্ধীর প্রকৃত প্রস্তুতিপর্ব।

১৮৯৩ খৃঃ এপ্রিলমাসে যে জাহাজের কাপ্তেনের সংগে গান্ধী জাঞ্জিবারের গণিকালয়ে গিয়েছিলেন সেই জাহাজই ডারবানে পৌঁছালো মে মাসে। এই জাহাজে গান্ধী ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় এলেন চাকরি নিয়ে, দাদা আবদুল্লা বা আবদুল্লা শেঠ নামক ব্যবসায়ীর আইন-বিশেষজ্ঞ হিসাবে। অবশ্য শেঠ আবদুল্লার কোম্পানির মামলা চলছিল ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়ায়, যদিও আবদুল্লা তখন ডারবানে। গান্ধী সপ্তাহ খানেক ডারবানেই রইলেন, পরে প্রিটোরিয়া যাবেন। এই সপ্তাহকাল মাঝে মাঝেই তিনি যেতেন ডারবানের আদালতে, ওদেশের আইনজীবীদের হালচাল বুঝবার জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন ভারতীয়দের সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী ও তাদের অধীনে যে হিন্দু ও পার্শী করণিকরা কাজ করতেন, তাদের প্রতি শ্বেতাংগরা খানিকটা সহিষ্ণু ছিল, কিন্তু ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি তাদের কোনো দরদ ছিল না। ভারতীয়দের অধিকাংশই ছিল শ্রমিক, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া করে আনা। শুধু শেতাংগ নয়, ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও তাদের ঘৃণা করতো। শ্রমজীবী ভারতীয়দের বলা হত "কুলি" বা ঝাঁকামুটে। গান্ধী ট্রাউজার এবং কোটের সংগে টুপির বদলে ভারতীয় পাগড়ি পরে ডারবানের আদালতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট

গান্ধীকে মাথার পাগড়ি খুলে ফেলতে বললেন। গান্ধী পাগড়ি খুলতে অস্বীকার করলেন। তার পরিবর্তে আদালত প্রাংগন ছেড়ে তিনি সোজা বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে গিয়ে প্রতিবাদে তিনি খবরের কাগজে একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠির বেশ কিছু প্রত্যুত্তর বেরোলো এবং কোনো কোনো পত্রলেখক গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় অবাঞ্ছিত আগন্তুক বলে সরাসরি আক্রমণ করলেন। গান্ধী কিন্তু পাগড়ি ছাড়লেন না। এই ঘটনার জের এখানেই মিটলো না। এদিকে গান্ধীর ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাবার সময় ঘনিয়ে এল। আবত্নল্লা গান্ধীকে একটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলেন। রাত নটায় ট্রেন যখন পিটারমারিৎসবুর্গ স্টেশনে থামলো তখন একজন যাত্রী তাঁর কামরায় ঢুকলো, এবং গান্ধীকে আপাদমস্তক তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে রেলের তুজন অফিসারকে ডেকে আনলো। অফিসাররা গান্ধীকে সেই কামরা ছেড়ে অন্যত্র যেতে বললো। গান্ধী কিন্তু একটুও নড়লেন না। পকেট থেকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট বের করে দেখালেন।

ফল হল না, ওরা একটু নাকসিঁটকালো মাত্র, এবং তৎক্ষণাৎ পুলিশ ডাকিয়ে গান্ধীকে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিল এবং তাঁর জিনিষপত্রও প্ল্যাটফর্মের উপর ছুঁড়ে দিল। গাড়ী স্টেশন ছেড়ে রওনা দিলে গান্ধী একা প্ল্যাটফর্মে পরিত্যক্ত লাগেজের মতো পড়ে রইলেন। তখন শীতকাল। অপেক্ষালয়ে বসে হাড়কাঁপুনি শীতে গান্ধী কাঁপছেন, কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। দৈহিক কষ্টের চেয়েও তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় তিনি কাতর; জাতিবিদ্বেষের নগ্নতম রূপটি তিনি এমন ভাবে প্রত্যক্ষ করবেন এর আগে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। পরদিন সকালে তিনি আবত্নল্লাকে তার করলেন, এবং রেলের জেনারল ম্যানেজারকেও আরেকটি তারবার্তা পাঠালেন। গান্ধী যখন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন তখন আরো অনেক ভারতীয়

ব্যবসায়ী তাদের প্রতি অনুরূপ অসংখ্য দুর্ব্যবহারের কথা তাঁকে জানালো। ইতিমধ্যে আবদুল্লার হস্তক্ষেপে আরেকটি ট্রেনে গান্ধীর চার্লসটাউন পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা হল। এখান থেকে শেয়ারের ঘোড়গাড়ীতে জোহানসবার্গ যেতে হবে। ঘোড়গাড়ীতে আবদুল্লা আগেই গান্ধীর জন্য টিকিট বুক করেছিলেন, কিন্তু ঘোড়গাড়ীর এজেন্ট এই টিকিট সংগে সংগে বাতিল করে দিল, কারণ কোচের অন্যান্য যাত্রীরা কুলির সংগে এক কোচে যেতে অস্বীকার করতে পারে! কোচোয়ান দয়া করে বাইরে একটা কোণায় বসবার জায়গা দিল এবং পরে সেখান থেকে নামিয়ে ফুটবোর্ডে এবং পরে মাঝপথে ফুটবোর্ড থেকেও ঠেলে পথে নামিয়ে দিতে চেষ্টা কোরলো। গান্ধী ধাক্কাধাক্কি সত্ত্বেও অনড় হয়ে বসে রইলেন। যাত্রীদের মধ্যে দুচারজন সহানুভূতি দেখানোয় শেষ পর্যন্ত গান্ধীকে কোচোয়ান অবশ্য গাড়ী থেকে নামিয়ে দিতে পারলো না। দুর্ব্যবহারের এখানেই ইতি নয়। জোহানসবার্গে পৌঁছে তিনি যখন একটা হোটেলে গেলেন তখন হোটেলের মালিক বললো, হোটেলে সিট নেই, সব ভর্তি হয়ে গেছে। কথাটা ডাহা মিথ্যা। শুধু তাই নয়, প্রিটোরিয়া যাবার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে দেখলেন ভারতীয়দের তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণীর টিকিট পর্যন্ত দেওয়া হয় না। গান্ধী রেলের কানুনগুলি মন দিয়ে পড়ে দেখলেন। না, এমন কথা কোথাও লেখা নেই যে ভারতীয়রা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটতে পারবে না। তিনি স্টেশন মাস্টারকে একটা চিঠিতে জানালেন যে তিনি একজন আইনব্যবসায়ী এবং প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। স্টেশনমাষ্টার তাঁকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু গাড়ী ছাড়বার আগে রেলের গার্ড এসে বললো, অন্য কামরায় নেমে যেতে হবে। তখন প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য যাত্রীরা বললো, উনি থাকুন, আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। ইতিহাসের

এমনি পরিহাস, যে-তরুণ ব্যারিষ্টার প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করবার দাবী নিয়ে এত তুমুল কাণ্ড করলেন তিনিই পরবর্তী জীবনে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণীতে চড়েননি, চড়তেন না। এটি ভাবতে বেশ মজাই লাগে।

প্রিটোরিয়া স্টেশনে নেমে গান্ধী একটি হোটেলে গেলেন। হোটেলের মালিক তাঁকে বল্লেন, গান্ধী আহার করতে পারেন, কিন্তু সেখানে থাকা তাঁর চলবেনা। কালা আদমী সম্বন্ধে তাঁর নিজের কোনো বিরূপতা নেই, কিন্তু……। এই "কিন্তু" গান্ধীকে ভাবিয়ে তুললো। নিজের জন্য নয়, তিনি ভাবিত হলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণ ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে। এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি প্রিটোরিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী তায়েব শেঠএর সংগে দেখা করলেন, তাঁকে বললেন, একটা সভা ডাকুন, যেখানে ভারতীয়রা একত্র বসে নিজেদের সমস্যাগুলি আলোচনা করতে পারে। ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। এই সভায় ভাষণ দিয়েই গান্ধী বলতে গেলে তাঁর নেতৃত্বের সূচনা করেন। প্রিটোরিয়ার এই সভায় যেন নতুন এক গান্ধীর জন্ম হচ্ছিল, সেই সলজ্জ, মুখচোরা, মিতবাক গান্ধী নয়, বহু মানুষকে পথে নিয়ে চলায় দৃঢ়সংকল্প এক আত্মপ্রত্যয়ী যুবক। তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তাতে তিনি শ্বেতকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নি, তিনি বল্লেন, ভারতীয়দের কাজেকর্মে পরিচ্ছন্নতা, নিষ্ঠা ও সততার ছাপ ফেলতে হবে, এবং সর্বোপরি নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। এসব বলার পর তিনি বললেন যে ভারতীয়দের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে শ্বেতকায়দের বৈষম্যমূলক আচরণের মোকাবিলা করতে হবে।

তেইশ বছরের এই যুবকটি দক্ষিণ আফ্রিকায় পা দিতে না দিতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন, প্রবাসী ভারতীয়দের তিনি নতুন করে গড়ে তুলতে অগ্রসর হলেন। অভ্যস্ত জীবনধারার

বাইরে নতুন কিছু করতে গেলে আগে নতুন ভাবনা মাথায় ঢোকাতে হবে। গান্ধী তাদের নতুন ভাবনা দিলেন। এই ভারতীয়দের একত্রে কাজ করবার একটা মস্ত বাধা ছিল—ভাষা। এরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ। গান্ধী সবাইকে উপদেশ দিলেন, ইংরেজি শিখতে, এমনকি তিনি নিজে তাদের ইংরেজি শেখাতে চাইলেন। এর পর তিনি রেল কোম্পানিকে একটি চিঠি লিখে জানতে চাইলেন, কোন্ আইন বলে ভারতায়দের প্রথম বা দ্বিতায় শ্রেণীর টিকিট বিক্রি করা হয় না। কারণ রেলের কানুন বইতে এরকম বৈষম্যের কথা কোথাও নেই। উত্তর এল, হ্যাঁ এবার থেকে ভারতীয়রাও প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনতে পারবে, অবশ্য তাদের পরিধানে ভদ্র পোষাক থাকা চাই। গান্ধী এক বিষয়ে জিতলেন ঠিকই, কিন্তু যেকোনো স্টেশন মাষ্টার ভদ্র পোষাকের অজুহাতে অনায়াসেই একজন ভারতীয়কে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিতে অস্বীকার করতে পারবে। গান্ধী এবার তায়েব শেঠএর সহায়তায় দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলেন।

ভারতীয় কুলিরা প্রথম ১৮৬০ খৃঃ কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে জাহাজে নাটালে আসে ; জুলু শ্রমিকরা বিদ্রোহ করায় আখের ক্ষেতে শ্রমিক সমস্যা দেখা দেয় এবং ভারত থেকে কুলি আমদানি আরম্ভ হয়। তিন-বছর-মেয়াদী চুক্তিতে এদের আনা হত, পরে এই চুক্তি পাঁচ-বছর-মেয়াদী করা হয়েছিল। এরা ক্রীতদাসের মতো থাকতো, শিক্ষা স্বাস্থ্য নীতিজ্ঞান এরা কিছুই পেতনা। কাজের মেয়াদ পূর্ণ হবার পর এদের নামকেওয়াস্তে “স্বাধীন” বলে. ঘোষণা করা হত। তখন এরা ইচ্ছেমতো ছোটখাটো দোকান পাট দিতে বা ব্যবসা করতে পারতো। অনেকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এইভাবে পাকাপাকি দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা হয়ে পড়ে এবং অচিরেই এইভাবে দক্ষিণ

আফ্রিকায় ভারতীয় জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৮৯০ খৃঃ দেখা যায় নাটালে য়ুরোপীয়দের সংখ্যা যেখানে পঞ্চাশ হাজার, ভারতীয়দের সেখানে একান্ন হাজার এবং নিগ্রোদের চার লক্ষ। ট্রান্সভালে ১৮৮৫ খৃঃ বুয়র সরকার আইন জারি করলেন যে সে-দেশে ভারতীয়রা ভোট দিতে বা নাগরিক হতে পারবে না। তাছাড়া ভারতীয়দের সবাইকে রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করতে হবে, এর বাইরে কোথাও জমিজমা করতে পারবে না। নবাগত ভারতীয়দের প্রত্যেককে একটি বিশেষ কর দিতে হবে। অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট, কেপ কলোনি প্রভৃতি রাজ্যেও অনুরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ হতে লাগল। শ্বেতকায়রা বুয়রদের এই সব অন্যায় কাজ পুরো সমর্থন করলেন। গান্ধী ট্রান্সভালে রয়েছেন। কাজেই সেখানকার অপমানগুলিই তাঁকে প্রথম ভাবিয়ে তুললো। প্রিটোরিয়াতে ভারতীয়দের ফুটপাথে হাঁটা বারণ ছিল এবং রাত নটার পর বাইরে বেরোতে হলে "অনুমতি পত্র" লাগতো। সরকারী এটর্নী ডঃ ক্রাউজ অবশ্য গান্ধীর নিজের জন্য একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সেটা দেখালেই গান্ধীর আর কোনো ঝামেলা করতে হত না। কিন্তু এই চিঠি না থাকলে গান্ধীর অবস্থা অন্যদের মতোই হত। একদিন ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের বাড়ীর সামনে ফুটপাথে গান্ধী হাঁটছিলেন, একজন কুলির এই স্পর্ধা দেখে একটি কর্তব্যনিরত পুলিশ এসে কোনো কথা না বলে তাকে সোজা বুটের লাথি মারলো। এই সময় গান্ধীর সাহেববন্ধু মাইকেল কোটস ঐখানে এসে পড়েন এবং ওলন্দাজ ভাষায় পুলিশটিকে কি যেন বললেন, পুলিশটি তখন গান্ধীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরলো। ক্ষমা প্রার্থনার জন্য গান্ধীর কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। ঘটনাটিই ছিল তাঁর কাছে নির্মম এক তাৎপর্যের নির্দেশক।

গান্ধী ভারতীয়দের সংগে মেলামেশা বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর কাছে নানা ধরণের লোক আসতো, মীটিং কোরতো, ইংরেজি শিখতো, আলোচনা করতো, পরামর্শ নিতো। ১৮৯৩ খৃঃ দক্ষিণ

আফ্রিকায় ভারতীয় বাসিন্দাদের "পরগাছা" এবং "অর্দ্ধ বর্বর" বলে গালাগালি দিয়ে "নাটাল অ্যাডভাইজার" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বেরোয়। গান্ধী সংগে সংগে উত্তর দেন; তিনি দেখান যে ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সরল ও মিতব্যয়ী, য়ুরোপীয়দেরই বরং বিলাসবহুল।

আবদুল্লা শেঠএর পক্ষে মামলা পরিচালনার ভার নিয়ে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন। এই মামলার বিরোধী পক্ষ ছিলেন তায়েব শেঠ। গান্ধী আইনজীবী হলেও মানবিক বিচার প্রয়োগ করে অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা আনার চেষ্টা করতেন। বিপক্ষকে পরাজিত করার মনোভাব গান্ধীর ভালো লাগতো না; উভয় পক্ষের গ্রহণীয় কোনো মীমাংসা হলেই তিনি বেশি খুশি হতেন। এতে ফলও ভাল হত। ১৮৯৪ খৃঃ আবদুল্লা শেঠএর মামলা শেষ হল; তাঁর কনট্রাক্ট ও ফুরোলো; কাজেই গান্ধীর তখন দেশে ফেরার পালা, যদিও ইতিমধ্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দাবী দাওয়ার সংগ্রামে অনেকখানি জড়িয়ে পড়েছেন। আবদুল্লা শেঠ ডারবানে গান্ধীকে একটি বিদায় ভোজে আপ্যায়িত করলেন। এই ভোজসভার উপসংহারে একটি অভাবিত ঘটনা ঘটলো। গান্ধীর চোখে পড়ল "নাটাল মারকারি" নামক পত্রিকার একটি বিশেষ খবরের উপর। নাটালের নতুন আইনসভায় একটি বিল আনা হচ্ছে ভারতীয়দের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য। ভোজসভায় আগত অতিথিদের মধ্যে বিশেষ কেউই এই খবরটি গুরুত্ব দিয়ে পড়েননি। গান্ধী বললেন, ভারতীয়দের আত্মমর্যাদা বাঁচাতে হলে এই ব্যাপারে সংগ্রাম করতে হবে, এটি একটি জরুরি ব্যাপার। একে উপেক্ষা করলে চলবে না। গান্ধী ঐ ভোজসভায় সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার জন্য একটি কমিটি তৈরি করে ফেললেন। সবাই তখন গান্ধীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো যাতে অন্তত আরেকটি মাস তিনি তাদের মধ্যে থেকে যান। আন্দোলনের জন্য

চাঁদা তুলবার প্রতিশ্রুতিও তারা দিল। "আল্লা হো আকবর" ধ্বনির মধ্যে গান্ধী সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ অ্যাসেমব্লি ও কাউন্সিলকে উদ্দেশ্য করে একটি আবেদন পত্র লিখলেন। প্রথম সভা বসলো আবদুল্লার বাড়ীতে, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী হাজী মহম্মদ নির্বাচিত হলেন সভাপতি। এই সভা থেকে আহ্বান জানানো হল স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের। আবদুল্লার খুব আস্থা ছিল না এই সংগ্রহের সাফল্য বিষয়ে। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, ক্যাথলিক সকল ধর্মের থেকেই কিছু কিছু লোক এগিয়ে এল। সকলের মধ্যে এক প্রবল ঐক্য বোধ ছড়িয়ে পড়ল। অ্যাসেমব্লির স্পীকার ও প্রধান মন্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠান হল, ভোটাধিকার বিল স্থগিত রাখা হোক। স্পীকার দুদিনের জন্য বিল মুলতুবি রাখতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্বেতকায় সদস্যরা বিলটি পাশ করালেন। বাকি থাকলো উপনিবেশ সচিব লর্ড রিপনের স্বাক্ষর। গান্ধী বুঝলেন এই বিলে ভেটো প্রয়োগ করাতে হলে চাই প্রবল জনমত, শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, বৃটেন ও ভারতবর্ষেও চাই জনমত সংগ্রহ। এই সময় গান্ধীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গান্ধী শূন্য হাতে কী করে থাকবেন? তখন স্থানীয় বিশজন ব্যবসায়ী তাদের প্রতিষ্ঠানের আইন-উপদেষ্টা হিসাবে গান্ধীকে নিযুক্ত করতে রাজী হলেন। নাটালের আইনজীবী সমিতি আইনের ফ্যাঁকড়া তুলতে চেষ্টা করলেন, যাতে গান্ধী নাটালে প্র্যাকটিস করতে না পারেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি গান্ধীকে কোর্টে প্র্যাকটিস করতে দিতে রাজী হলেন একটি মাত্র শর্তে—কোর্টে মাথায় পাগড়ি পরবেন না। বৃহত্তর স্বার্থের কথা মনে রেখে গান্ধী রাজী হলেন। ভারতীয়রা অনেকেই পাগড়ির ব্যাপারে গান্ধীর এই পশ্চাদপসরণে খুব ক্ষুব্ধ ও আশাহত হল। সংগ্রামের ক্ষণে পশ্চাদপসরণের অভিযোগ গান্ধীর বিরুদ্ধে বহুবার উঠেছে। বলা যায়, সেই অভিযোগেরও প্রথম ঘটনা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ঘটে।

নাটালে ভারতীয়দের ভোটাধিকার আন্দোলনের সংগে সংগে গান্ধী বুঝতে পারলেন বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন সভা ও প্রতিবাদ করার চেয়েএ প্রয়োজন একটি স্থায়ী সংগঠনের। এই সময় ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিপত্তি বাড়ছিল, বাইরেও তার নাম ডাক শোনা যাচ্ছিল। এবং গান্ধী মনে করলেন ভোটাধিকার আন্দোলনের সংগে সংগে জাতীয় কংগ্রেসের মতো নাটালে "নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। অচিরেই "নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস" স্থাপিত হল এবং গান্ধী হলেন তার সেক্রেটারি। তিনি কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ভাসাভাসা ভাবে ছাড়া বিশেষ কিছুই জানতেন না। কাজেই তার হুবহু অনুকরণ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি নিজের স্বাধীন বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর নিজের মতো একটি কংগ্রেস সৃষ্টি করলেন নাটালে। শুধু প্রতিবাদ করাই নয়, ভারতীয়দের মধ্যে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বোধ জাগ্রত করা, নিজেদের জীবনযাত্রাকে পরিচ্ছন্ন ও দুর্নীতি মুক্ত করা, ইংরেজি, গুজরাতী ও অন্যান্য ভাষায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা চক্র পরিচালনা করা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সেবামূলক কার্য চালানো এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হল। য়ুরোপীয়দের সংগে ভারতীয়দের সম্প্রীতি বৃদ্ধি করাও নাটাল কংগ্রেসের অন্যতম ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল। সম্প্রীতি বৃদ্ধির পরিবর্তে নাটাল কংগ্রেস, বিশেষ করে সেক্রেটারি গান্ধী, হলেন য়ুরোপীয় অধিবাসীদের বিদ্রূপ ও সমালোচনার লক্ষ্য। একজন সাংবাদিক উপদেশ দিলেন গান্ধী যেন দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাঁর স্বদেশে ফিরে গিয়ে আগে ভারতবর্ষের জাতি ভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করার চেষ্টা করেন। সমালোচকের এই বিদ্রূপ গান্ধী লঘু করে দেখেননি, উড়িয়েও দেননি। যদিও এই কাজ হাতে নেবার প্রকৃত সুযোগ গান্ধী পেয়েছিলেন আরো অনেক পরে। এই সময় গান্ধীর প্রচণ্ড কর্মশক্তির বহুমুখী প্রকাশ ঘটে। চাঁদা আদায় ও

টাকা পয়সার নির্ভুল হিসাব রাখা থেকে শুরু করে সংগঠনের প্রতিটি বিষয়ে নজর দেওয়া এবং প্রত্যেকটি ধাপ সম্বন্ধে সুচিন্তিত পদক্ষেপের জন্য সংগঠনকে প্রস্তুত ও মজবুত রাখার ব্যাপারে তিনি দিবারাত্র খাটতে থাকেন। বিভিন্ন অন্যায় ও পীড়নমূলক কানুন ও ঘটনার উপর গান্ধী একাধিক প্রতিবাদ পুস্তিকা রচনা করেন ও সেগুলি ভারতে, ইংলণ্ডে ও নাটালে শাসক মহলের নজরে আনেন। প্রত্যেকটিতেই তিনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে প্রচারিত কুৎসার সমুচিত জবাব দিতেন। এই সব প্রচার পুস্তিকা এতই জোরালো ছিল যে লণ্ডনের রক্ষণশীল "টাইমস" পত্রিকাও নাটালে ভারতীয়দের অভাব অভিযোগ নিয়ে একাধিক সম্পাদকীয় লিখতে বাধ্য হয়।

লণ্ডন প্রবাসে গান্ধী যেমন নিরামিষ ভোজীদের সংস্পর্শে এসে খ্রীষ্টীয় ও অন্যান্য ধর্মীয় মতের সংস্পর্শে আসেন, তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসেও গান্ধী লণ্ডনে নিরামিষাশীদের সংগে সংযোগ রক্ষা ছাড়াও নানা ধরণের বই পড়তেন নিজের মনের সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে। লিও টলস্টয়ের 'ঈশ্বরের রাজ্য তোমার ভিতরেই রয়েছে' নামক একটি প্রবন্ধ লণ্ডনে থাকতেই গান্ধী পড়েছিলেন। সদ্য প্রকাশিত টলস্টয়ের "ঈশ্বরের রাজ্য" বইটি তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েন। গান্ধী দেখেন টলস্টয় গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মের বিরোধী, কিন্তু খ্রীষ্টীয় মূল তত্ত্বের বিরোধী নন। "রেজিষ্ট নট ইভিল" পাপ বা অন্যায়ের প্রতিরোধ কোরোনা, এই দিয়েই টলস্টয়ের বক্তব্য শুরু, যীশুখৃষ্টের এই বাণী এর অনেক আগেই গান্ধীচিত্তকে অধিকার করেছিল। বলপ্রয়োগের নীতি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে, টলস্টয়ের এই হচ্ছে বক্তব্য। কিন্তু সব রাষ্ট্রই বল প্রয়োগের যন্ত্র, ভিতরে প্রজাদমন ও বাইরে শত্রুদমন বা যুদ্ধ, সব রাষ্ট্রই করে থাকে। টলস্টয়ের মতে এই কাজ অধর্মীয়, অন্যায়। যে সব চার্চ রাষ্ট্রের এই দমননীতি ও বলপ্রয়োগের কাজ সমর্থন করে তারা ভুয়ো। রচনা পড়ে মনে হয়, শান্তিবাদী

নৈরাজ্যবাদই টলস্টয়ের আদর্শ। শাসন, কর্তৃত্ব বা আইনপ্রয়োগের শক্তি কোনো শুভ সম্পাদন করতে পারে না। ক্ষমতা মানুষকে নীতিভ্রষ্ট করে। মানুষের ভাল, আইন প্রয়োগে নয়, ভিতরের নিষ্কলঙ্কতা, সত্য, প্রেম ও ঈশ্বরসান্নিধ্য থেকে আসে। রাষ্ট্র বা সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণীবিভাগ যেহেতু অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় অতএব প্রকৃত যীশু ভক্তকে বিদ্রোহী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তিনি স্বভাবতই বিবেকী ও প্রতিবাদী। অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ থেকে তিনি যতো দূরে এবং যতো বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারেন ততোই মংগল। কিন্তু প্রতিবাদী বা বিদ্রোহী হলেও তিনি হবেন অহিংস, এবং শাসকের দৃষ্টিভংগিরও পরিবর্তন ঘটাতে সচেষ্ট হবেন। মনের দৃঢ়তা অস্ত্রশস্ত্রের শক্তিকেও পরাজিত করতে পারে। সত্যদর্শন ও সত্য প্রচারই মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেয়, অন্য কিছু নয়। গান্ধীর জীবনে বারে বারে যা ঘটেছে টলস্টয়ের রচনা পড়েও ফল তাই ঘটল, পাশ্চাত্যের কাছ থেকে প্রাচ্যের মর্মবাণীই তিনি শুনতে পেলেন। অহিংসা বুদ্ধের বাণী, কিন্তু সেই বাণীই তাঁর মনে মুদ্রিত করলেন টলস্টয়, এক বিদ্রোহী খ্রীষ্টান। হিন্দু বা বৌদ্ধ "অহিংসা" তাঁকে টলস্টয়ের মতো করে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, তার কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে "অহিংসা" একটি জপের মন্ত্র হয়ে রয়েছে। কার্যক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে তার প্রয়োগ দেখা যায় না। টলস্টয়ের রচনায় গান্ধী পান কর্মের কুরুক্ষেত্রে অহিংসা প্রয়োগের ইংগিত। তিনি টলস্টয়ের রচনা আরো পড়লেন। প্রচলিত সভ্যতার বিরুদ্ধে টলস্টয়ের জেহাদ, কৃষকদের সপক্ষে এবং কায়িক শ্রমের সপক্ষে টলস্টয়ের যুক্তি তাঁকে প্রভাবিত কোরলো। গান্ধী এই সময় উপনিষদ ও ম্যাক্সমুলারের কিছু রচনাও পড়লেন। ম্যাক্সমুলার আরেকজন পাশ্চাত্য জ্ঞানী যাঁর মতে সনাতন ভারতবর্ষ বা প্রকৃত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে হবে শতাব্দী সঞ্চিত বিকৃতি ও অনাচারের স্তূপ সরিয়ে, শহর থেকে দূরে গ্রামগ্রামান্তরে।

শহর থেকে দূরে, ডারবান থেকে প্রায় পনর ষোলো মাইলের পথ মিরিয়াম হিল। গান্ধী খোঁজ পেলেন এখানে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের কিছু লোক একটি সুন্দর ধর্মপ্রাণ, স্বয়ং-নির্ভর গ্রাম্য উপনিবেশ গড়ে তুলছে। ১৮৯৫ খৃঃ তিনি চললেন এই শান্ত মনোরম মডেল পল্লীটি দেখতে, এবং দেখে মুগ্ধ হলেন। একশো ষাট জনের মতো ক্যাথলিক সাধু ও প্রায় ষাট জন সন্ন্যাসিনী, অধিকাংশই জাতিতে জার্মান, এই গ্রাম্য রিপাবলিকটি রচনা করেছেন। এখানে সকলেই মাঠে ও ওয়ার্কশপে সমান ভাবে কাজ করেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের হাতের কাজ ও অন্যান্য বিষয় শেখান। এই মডেল গ্রামটি গান্ধীর মনে গভীর রেখাপাত কোরলো, এবং এই মিরিয়াম হিলেই গান্ধী প্রথম তাঁর ভাবী শবরমতী আশ্রমের স্বপ্ন দেখলেন।

মুসলিম ব্যবসায়ীদের অনেকে গান্ধীকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের আইন-উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত করায় গান্ধী এখন অনেকখানি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করলেন। তিনি অনায়াসেই এখন ভারত থেকে পুত্র পরিবার এনে পুরো সংসার পাততে পারেন। এমন কি তাঁর হাতে এখন ব্যয়ের অতিরিক্ত কিছু সঞ্চয়ও হতে লাগলো, যা থেকে ইচ্ছে মতো জনহিতকর কাজে দানও করতে পারেন। তাছাড়া পেশার দিক থেকে আইনজীবী হিসাবেও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বহু মামলা পরিচালনা করে তাদের স্বার্থরক্ষা করতে পারেন। গান্ধী এরই মধ্যে অল্প অল্প তামিল ভাষা শিখে ফেলেছিলেন, আফ্রিকায় দক্ষিণ ভারতীয় শ্রমিকদের সংগে কাজ করার পক্ষে এটি তাঁর বিশেষ কাজে লাগলো। শুধু তামিল নয়, তিনি জুলু ভাষাও খানিকটা শিখেছিলেন। গান্ধী যখন নাটালের সর্বস্তরের মানুষের সংগে পরিচিত হতে সচেষ্ট তখন দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে—ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে—বিশ্বের লোক গান্ধীর পরিচয় নিতে আরম্ভ করেছিল। বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা দাদাভাই নওরোজীর সংগে গান্ধীর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, এবং ইতিহাসবিদ স্যার

উইলিয়ম হাণ্টার—যিনি 'টাইমস' পত্রিকায় ভারতীয় বিভাগ সম্পাদনা করতেন—গান্ধীর কাছ থেকে নাটালের ভারতীয়দের অভাব অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ পেতেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ও "টাইমস" পত্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত এই সময়ই ঘটে। ইংলণ্ডের শাসকরা দেখলেন শুধু নাটাল নয়, গান্ধীর দৃষ্টান্ত দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যের মানুষকেও অনুপ্রাণিত করছে, কারণ তখন ট্রান্সভাল ও কেপ টাউনেও অনুরূপ কংগ্রেসের পত্তন হয়েছে। অতএব শাসকগোষ্ঠীও উদাসীন থাকতে পারছিলেন না।

গান্ধীর পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে যাওয়া ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো। ভারতবর্ষ তাঁর দেশ, কিন্তু এই দ্বিতীয় স্বদেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তির শিকড় এমন ভাবে বিস্তৃত হচ্ছিল যে তিনি স্থির করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের সপক্ষে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি অল্পদিনের জন্য ভারতে ফিরে যাবেন এবং ফিরে আসবার সময় পরিবারবর্গকেও নিয়ে আসবেন। নাটাল কংগ্রেসের জন্য একজন অস্থায়ী সচিব নিযুক্ত করে ১৮৯৬ খৃঃ ৫ই জুন তিনি "এস এস পঙ্গোলা" নামক জাহাজে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। জাহাজ যখন অকূল দরিয়ায় তখন জাহাজের তামিলভাষী ডাক্তারের সহায়তায় গান্ধী তার তামিল চর্চা জোরদার করলেন। অবশ্য গান্ধী মোটামুটি পড়তে পারা ছাড়া খুব ভালো তামিল কখনোই শিখতে পারেন নি।

গান্ধী ভারতবর্ষে পৌঁছে, কয়েক সপ্তাহ রাজকোটে বাড়ীর কাজকর্ম সারলেন। ইতিমধ্যে এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার সম্পাদকের সংগে দেখা করে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু লিখতে তাঁকে রাজী করিয়েছিলেন। রাজকোটে থাকতে থাকতে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার উপর আরেকটি পুস্তিকা লিখলেন, এই পুস্তিকার মলাট ছিল সবুজ রঙের, তাই এর চলতি নাম হয়েছিল

গান্ধীর "সবুজপত্র"। রাজকোটে এই সময় প্লেগের ভয় দেখা দিল, গান্ধী শহরের ড্রেন, শৌচাগার প্রভৃতি পরিষ্কার রাখার অভিযানে নামলেন। তিনি দেখলেন ধনীরাই এ বিষয়ে বেশি অপরিষ্কার এবং অমনোযোগী ; তথাকথিত অস্পৃশ্যদের বাড়ী এই বিষয়ে অনেক বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গান্ধী ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরলেন। বোম্বাই, পুণা ও মাদ্রাজে বক্তৃতা দিলেন। পুণায় নরমপন্থী গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও চরমপন্থী বালগঙ্গাধর তিলকের সংগে সাক্ষাত করলেন, তার পর মাদ্রাজ থেকে এলেন কলকাতায়।

কিন্তু কলকাতায় প্রচার কাজে হাত দিতে না দিতে ডারবান থেকে তার এল, নাটাল পার্লামেণ্ট জানুয়ারি মাসে বসছে, তখন গান্ধীর সেখানে থাকা প্রয়োজন। আবদুল্লার নিজের একটি জাহাজ ছিল, তাতে বিনা ব্যয়ে গান্ধী ও গান্ধীপরিবারকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আনবার বন্দোবস্ত করা হল। এই সংগে আরো একটি জাহাজ কলকাতা থেকে ছাড়ছিল, এবং শুধু গান্ধী ও গান্ধী পরিবারই নয় এই দুই জাহাজে মোট আটশো জন ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় জীবিকা অর্জনের জন্য রওনা হল।

ঝড় তুফানের মধ্য দিয়ে অবশেষে জাহাজ দুটি যখন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ডারবান বন্দরে পৌঁছাল, তখন ডকের কর্তৃপক্ষ জাহাজের যাত্রীদের বন্দরে নামবার অনুমতি দিলেন না। জানালেন, কোয়ারেণ্টাইন বা রোগসংক্রমণের প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে এই নিষেধ। আসল কারণ রোগসংক্রমণ নয়, নাটালের শ্বেতকায় অধিবাসীরা আরো বেশী ভারতীয় নাটালে আসুক তা চাইছিলেন না। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তীরে বিক্ষোভ জানানো হল, আবদুল্লার উপরও তারা নানা ভাবে চাপ দিতে লাগলো যাতে আর ভারতীয় কুলি নাটালে না ঢোকে। জাহাজ ঘাটে নোঙর করাই রইল। কিন্তু কেউ নামতে পারলো না। জাহাজের উপরই খ্রীস্‌মাস পালন করা হল, এবং গান্ধী এই বড়দিনের সভায় শ্বেতসভ্যতাকে বলপ্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা বলে নিন্দা

করলেন। জাহাজের কাপ্তেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর শত্রুরা যদি গান্ধীর ওপর আক্রমণ চালায় গান্ধী কি তাহলেও অহিংস থাকবেন? গান্ধী জবাব দিলেন, "আশাকরি ঈশ্বর আমায় শক্তি দেবেন ওদের ক্ষমা করতে"। তিন সপ্তাহকাল জাহাজে বন্দী থাকবার পর বন্দরে নামার অনুমতি পাওয়া গেল। সন্তানসম্ভবা কস্তুরবাঈ ও পরিবারবর্গকে একটি গাড়ীতে করে বিশিষ্ট পার্শী শুভাকাঙ্ক্ষী রুস্তমজীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে গান্ধী পায়ে হেঁটে প্রকাশ্য দিবালোকে জাহাজ থেকে নামলেন। সংগে সংগে একদল মারমুখী বিক্ষোভকারী তাঁকে ঘিরে তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে "গান্ধী! গান্ধী!" বলে চীৎকার করতে লাগলো। এর পর চারিদিক থেকে তাঁর ওপর ইট পাথর বৃষ্টি সমানে চলল। পচা ডিমও কম ছোঁড়া হলনা। তাঁর মাথা থেকে পাগড়ি কেড়ে নেওয়া হল, এবং তারপর লাথি চড় ঘুঁষি সমানে চলল। ভাগ্যক্রমে ঐ সময় পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী শ্রীমতী আলেকজাণ্ডার ওখানে উপস্থিত হন। তিনি সাহসের সংঙ্গে গান্ধীর পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং ছাতা দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করলেন। পুলিশসুপার মিঃ আলেকজাণ্ডার ঘটনা-স্থলে এসে গান্ধীকে রুস্তমজীর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এলেন। সন্ধ্যার পর গান্ধীবিরোধীরা রুস্তমজীর বাড়ীর ওপর চড়াও হল, এবং "গান্ধীর রক্ত চাই" বলে ধ্বনি দিতে লাগলো। আলেকজাণ্ডার গান্ধীকে পরামর্শ দিলেন থানায় আশ্রয় নিতে; পুলিশের পোষাক পরে পুলিশ সেজে গান্ধী সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন। এইভাবে বাস্তব পরিস্থিতির চাপে সেদিন গান্ধী কিন্তু এক হিসাবে অসত্যেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ডারবানের এই জঘন্য ঘটনার রিপোর্ট উপনিবেশ সচিব চেম্বারলেনের কাছে পৌঁছানুমাত্র তিনি নাটাল সরকারকে তারযোগে জানালেন অবিলম্বে অপরাধকারীদের শাস্তি দেবার জন্য আদালতে অভিযুক্ত করা হোক। গান্ধী জানালেন, তিনি প্রতিহিংসা চান না বা ওদের শাস্তি দেওয়া হোক তা চান না। গান্ধীর

এই কথায় অবশ্য সাধারণ প্রতিক্রিয়া খুব ভাল হল এবং কারীদেরও গান্ধীর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ রইল না।

গান্ধী বিরোধীদের ক্ষমা করলেন, কিন্তু ভারতীয়দের জন্য আন্দোলন থেকে একটুও সরে দাঁড়ালেন না। এই সময় আইন সভায় দুটি নতুন বিল আনা হল। একটিতে বলা হল, নাটালে ব্যবসা করতে হলে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকেই লাইসেন্স বা বিশেষ অনুমতি নিতে হবে, দ্বিতীয়টিতে বলা হল, বাইরে থেকে যারাই নাটালে আসবে তারা কতোটা শিক্ষিত এ বিষয়ে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। বলা বাহুল্য, শ্বেতকায়দের এই আইনে কোনই অসুবিধা হবেনা, কিন্তু ওই আইনের দোহাই দিয়ে ভারতীয়দের অযথা হয়রানি করা সম্ভব হবে। নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস সর্বশক্তি দিয়ে বিল দুটির বিরোধিতা কোরলো, কিন্তু কোনো ফল হলনা। বিল দুটি আইনে পরিণত হল। ফল যে একেবারে হল না তা নয়। নাটাল কংগ্রেস অনেক বেশি সংঘবদ্ধ হল, কংগ্রেসের সভ্যরা দ্বিগুণ উদ্যমে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার কাজে নামলেন। গান্ধী নাটাল কংগ্রেসের জন্য শুধু চাঁদা সংগ্রহই নয় চাইলেন স্থায়ী রিজার্ভ তহবিল, এমন কি চাইলেন কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানাও গড়ে তুলতে। অর্থই অনর্থের মূল একথা তখনো তিনি ভাবেন নি। জনসাধারণের সেবার জন্য যে-জনপ্রতিষ্ঠান তার অর্থ ও রসদ জনসাধারণের কাছ থেকেই আসে এবং আসবে, জনসাধারণের উপর নির্ভর না করে, সঞ্চিত মূলধনের উপর নির্ভরশীল জনপ্রতিষ্ঠানের ধারণাটাই যে ভুল, এ উপলব্ধি গান্ধীর জন্মেছিল আরো অনেক পরে, আরো অনেক অভিজ্ঞতার ফলে।

১৮৯৯ খৃঃ বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হল। বুয়র শাসকদের বিরুদ্ধে গান্ধীর ধারণা যাই থাকুক না কেন এই যুদ্ধের সময় তার সহানুভূতি বুয়রদের দিকেই ছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের তিনি অনুগত প্রজা। এ ক্ষেত্রে টলস্টয়ের মতো বা থোরোর মতো তিনি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রশক্তির

বশ্যতা পরিহারের নীতি গ্রহণ করতে পারেননি। বৃটিশ শাসন শাসিতদের মংগলকর এই বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন। বৃটিশদের জাতিবিদ্বেষী অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অবশ্যই সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু এই জাতিবিদ্বেষ, তাঁর মতে, বৃটিশ শাসনের স্থানীয় বিচ্যুতি মাত্র সামগ্রিক নীতি বা মৌল স্বরূপ নয়। গান্ধীর যা কিছু সমালোচনা বা আন্দোলন তার চেহারা ছিল নিয়মতান্ত্রিক, শাসনতান্ত্রিক। এমন কি রাজভক্ত প্রজার মতোই তিনি "গড সেভ আওয়ার গ্রেশাস কুইন," ঈশ্বর আমাদের দয়ালু মহারাণীকে রক্ষা করুন, এই বৃটিশ 'জাতীয় সংগীত' কণ্ঠস্থ করেছিলেন। এই সংগীতের একটি লাইন "স্ক্যাটারিং হার এনিমিজ" "শত্রুদের চূর্ণ করে" তাঁর মূল নীতির বিরোধী ছিল, কিন্তু গান্ধীর অকাট্য যুক্তি, আমরা বৃটিশ নাগরিকদের সমান অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দাবী করছি, বৃটিশনাগরিকদের কর্তব্যই বা আমরা পালন কোরবো না কেন? এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হলেও গান্ধী এই সময় একটি ভারতীয় 'অ্যাম্বুল্যান্স কোর' গঠনে উদ্যোগী হলেন। অধিকাংশ ইংরেজ এই প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখলেন এবং এই নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেন। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ গান্ধীর প্রস্তাবে রাজী হলেন, কারণ বুয়ররা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করছিল এবং বৃটিশদের পক্ষে নাক-উঁচু ভাব নিয়ে বসে থাকা অসম্ভব ছিল। প্রায় এক হাজার ভারতীয়ের এই 'কোর'টি অসাধারণ নৈপুণ্যের সংগে ফ্রন্টে গিয়ে সেবাকার্য চালাল। এটি সকলের কাছে প্রমাণিত হয়ে গেল যে ভারতীয়রা ইংরেজদের চেয়ে কোন অংশেই ন্যূন নয়, এবং দায়িত্ব ও সাহসিকতাপূর্ণ যে কোনো কাজের ভার তাদের উপর দেওয়া যায়। এই সময় এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হল যে এবার থেকে ইংরেজরা ভারতীয়দের প্রতি আর বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। যুদ্ধে বৃটিশদের জয়লাভ ঘটলে ভারতীয়রাও সসম্মানে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে বলে গান্ধী নিজে বিশ্বাসী হলেন। ফলে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়

হল তখন ডারবানে ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্তির উপর গান্ধী স্বয়ং ভারতীয়দের পক্ষ থেকে মাল্য অর্পণ করলেন। গান্ধী মনে করলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অধিকারের সংগ্রাম এখন সহজেই জয়যুক্ত হবে। অতএব মনসুখলাল নজর নামক এক সহকারীর ওপর সমস্ত দায়িত্ব রেখে গান্ধী ভারতে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

গান্ধীর ইচ্ছা গোখলের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তিনি ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করবেন। নাটাল কংগ্রেসের সদস্যরা এই শর্তে তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন যে আগামী এক বছরের মধ্যে যদি তাদের প্রয়োজন হয় গান্ধী নিশ্চয়ই ডারবানে ফিরে আসবেন। আন্তরিক বিদায় সম্বর্দ্ধনা একের পর এক পালিত হল। সম্বর্দ্ধনায় গান্ধীকে ব্যক্তিগত উপহার হিসাবে অনেক কিছু দেওয়া হল; এই উপহারের মধ্যে কস্তুরবাঈয়ের জন্য গহনাগাটি ও পঞ্চাশ গিনি দামের হীরের হারও ছিল। গান্ধী স্থির করলেন ঐ সব দামী উপহার তিনি নিজে তো নেবেনই না, পরন্তু কস্তুরবাঈকেও নিতে দেবেন না। কস্তুরবাঈ বেঁকে বসলেন; তিনি বল্লেন, তাঁর নিজের জন্য না হয় প্রয়োজন নাই হল, কিন্তু ভাবী পুত্রবধুর জন্য গহনাগুলি রেখে দিলে ক্ষতি কী? গান্ধী উত্তর দিলেন, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে ভাবা যাবে। যদি বউমাদের জন্য গহনাগাঠি দেবার প্রয়োজন হয় কস্তুরবাঈ যেন গান্ধীকে তখন বলেন, তিনি গহনা তৈরী করিয়ে দেবেন। "তুমি তৈরী করিয়ে দেবে?" কস্তুরবাঈ জবাব দিলেন, "আমাকেই তুমি দিচ্ছনা, বউমাদের তুমি দেবে? তুমি আর বউমাদের কি দেবে, তুমি তো ছেলেদেরই এক একটি সাধু বানাবার তালে আছো। না, তুমি আর যা ইচ্ছে ফিরিয়ে দাও, গহনা আমি ফিরিয়ে দেবো না। তাছাড়া আমাকে দেওয়া হার ফিরিয়ে দেবার তোমার কি অধিকার আছে?" গান্ধী জবাব দিলেন, "কিন্তু ওরা এই উপহারগুলি কেন দিয়েছে? আমার সেবা না তোমার সেবায় মুগ্ধ হয়ে?" কিন্তু কস্তুরবাঈ বল্লেন, "মানছি তোমার সেবায়

মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু তোমার সেবা আর আমার সেবা তো একই কথা। তুমি তাদের সেবা করেছ, করতে পেরেছ, কারণ আমি তোমার জন্য দিবারাত্র খেটেছি, সেটা কি সেবা নয়? তুমি আমার ওপর যত-রকমের খাটুনির বোঝা চাপিয়েছ, তোমার জনসেবায় নানারকমের অদ্ভুত খেয়াল চরিতার্থ করেছ, আমি সব সহ্য করেছি। আমার বাড়ীটিকে তুমি একটি আশ্রম বানিয়েছ, আমি তোমার কথায় ধাঙ্গড়দের মলমূত্র সাফ করেছি আর চোখের জল ফেলেছি, দাসী বাঁদীর মতো মুখ বুজে খেটেছি।" গান্ধী তবু গহনা ও অন্যান্য উপহার নাটাল কংগ্রেসের হাতেই গচ্ছিত রাখলেন, বল্লেন, প্রয়োজন হলে ফেরত নেবেন। বলা বাহুল্য, এটি কস্তুরবাঈকে প্রবোধ দেবার জন্যই তিনি বল্লেন। ওগুলি সত্যিই ফিরিয়ে নেবার কথা তিনি মুহূর্তের জন্যও ভাবেন নি।

১৯০১ খৃঃ অক্টোবর মাসে তাঁরা রওনা হলেন। ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসবে। গান্ধী কখনো ভারতীয় কংগ্রেসের সভায় যোগদান করেননি, এবার করবেন। তিনি এই সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের পক্ষে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করবেন বলে আগেই কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের লিখে জানালেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়ে কিন্তু গান্ধী হতাশ হলেন। নাটালে তাঁর নিজের সৃষ্ট ছোট কংগ্রেস এর চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত, সজীব ও সংগ্রামী। কংগ্রেসের সমস্ত কাজ দেখলেন ইংরেজিতে হচ্ছে, কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করা ছাড়া আগামী এক বছর সভ্যরা কী করবেন সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য নেই; সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসকে গড়ে তোলা, আন্দোলনের মধ্যে ভারতবর্ষের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করা ইত্যাদি কোনো ধারণাই নেতাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছেনা। বর্ণ-বৈষম্য দূর করার চেষ্টা তো নেইই এমনকি ডেলিগেটদের খাবার ব্যবস্থা হচ্ছে বিভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাকশালায়।

অধিবেশনের জায়গায় শৌচাগার অল্পসংখ্যক, এবং প্রত্যেকটি অপরিষ্কার। যখন গান্ধী নিজে হাতে একটি শৌচাগার পরিষ্কার করলেন তখন সারা অধিবেশনে একটা সাড়া পড়ে গেল। ২৭শে ডিসেম্বর প্লেনারি সেশানে কী কী প্রস্তাব পাশ হবে আগের দিন রাতে সেগুলি যখন স্থির করা হচ্ছিল তখন গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের উপর প্রস্তাবের কথা কারোই মনে আসেনি। শেষকালে গোখলে ব্যাপারটি উত্থাপন করায় ঐটি বিষয়সুচির মধ্যে রাখা হল। গান্ধী প্রস্তাবটি একবার পড়ে শুনালেন, যখন ব্যাখ্যা করতে গেলেন, সদস্যরা তখন ক্লান্ত, বল্লেন, ঠিক আছে পরদিন উত্থাপন করলেই হবে। প্লেনারি সেশনে প্রস্তাবটির জন্য গান্ধীকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, যথারীতি প্রস্তাবটি পাশও হল। পক্ষে বা বিপক্ষে কেউ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না।

কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত হলে গান্ধী কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংগে পরিচিত হতে চেষ্টা করলেন যারা নতুন ভারত গড়ার কাজে ব্রতী। ব্রাহ্মসমাজের কথা তিনি আগেই পড়েছিলেন, বিশেষত কেশবচন্দ্র সেনের কথা। তিনি কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের অফিসে গেলেন আলোচনার উদ্দেশ্যে। আলোচনা করবার মতো উপযুক্ত কাউকে পেলেন না, তবে সমাজ-আয়োজিত একটি গানের আসরের টিকিট পেলেন! ধর্মের সন্ধান না পেলেও গান শুনতে শুনতে গান সম্বন্ধে তাঁর ভালবাসা জন্মে গেল চিরদিনের জন্য। এই ভালবাসার সূত্র ধরেই পরে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাব পড়েছে তাঁর জীবনে, তাঁর প্রিয় গান হয়ে উঠেছে "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে"। ধর্ম ও রাজনীতি, দেশপ্রেম ও সমাজসেবার সংগমে দাঁড়িয়েছিলেন আরেকজন তেজস্বী পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর সংগেও গান্ধী দেখা করতে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বামীজী তখন অসুস্থ, দেখা হলনা। গান্ধীজী ও স্বামীজীর এই সাক্ষাৎকার ঘটলে তা হত বিংশ শতকের

আরম্ভে ভারতীয় ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনা ঘটলো না। তিনি কলকাতা থেকে বারাণসী গেলেন তাঁর লণ্ডন প্রবাসে পরিচিত শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের সংগে দেখা করতে; তিনিও তখন অসুস্থ, খুব বেশি আলোচনা হতে পারলোনা। গান্ধী কলকাতায় গোখলের অতিথি হিসাবে একমাস কাটিয়েছিলেন এবং গোখলে তাঁকে ভারতের রাজনীতি বিষয়ে অনেক উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি গান্ধীকে বোম্বাই গিয়ে আইন ব্যবসা আরম্ভ করতে বল্লেন, এর জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ পত্রও তিনি দিলেন। গান্ধী রাজকোটে আইনব্যবসায়ে সামান্য হাতে খড়ি দিয়েই বোম্বাই রওনা হলেন এবং সপরিবারে সান্তাক্রুজে একটি বাংলোতে গিয়ে উঠলেন।

কিন্তু জাঁকিয়ে বসতে না বসতেই নাটাল থেকে টেলিগ্রাম এল, চেম্বারলেন নাটাল আসছেন, গান্ধীকে অবশ্যই নাটালে উপস্থিত থাকতে হবে। গান্ধী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ডাক এলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যাবেন। স্ত্রীপুত্র রেখে তাই পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি রওনা হলেন। নাটাল থেকে ভারতে আসবার সময় গান্ধী এই ধারণা নিয়ে ফিরেছিলেন যে বুয়রযুদ্ধের পর বৃটিশ শাসকরা ভারতীয়দের প্রতি সুবিচার করবেন। কিন্তু চেম্বারলেন নাটালে আসছিলেন ভারতীয়দের কোনো নতুন সনদ শোনাতে নয়, ইংরেজ ও বুয়র প্রজাদের চিত্তরঞ্জন করতে। গান্ধী যথাসময়ে পৌঁছালেন এবং চেম্বারলেনের কাছে ভারতীয়দের মুখপাত্র হিসাবে তাদের ন্যায্য অভিযোগগুলি বিবৃতও করলেন। কিন্তু চেম্বারলেন মামুলি আশ্বাস দিয়ে তাঁকে বিদায় করলেন। ট্রান্সভালে তখন ভারতীয়দের সম্বন্ধে কড়াকড়ি একটুও শিথিল হয় নি, এবং পদে পদে ভারতীয়রা অপমানিত, বাধাগ্রস্ত। গান্ধী স্থির করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় আরো কিছুদিন তিনি থাকবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি জোহানসবার্গে ঘরভাড়া নিলেন এবং ট্রান্সভাল সুপ্রীমকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু

করলেন। অল্পদিনের মধ্যে গান্ধীর প্র্যাকটিসে প্রভূত উন্নতি হল। মামলা পরিচালনা করতে করতে তিনি ট্রান্সভালের সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর খুঁটিনাটি বিবরণ ও অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। ট্রান্সভাল বৃটিশ অধীনে আসবার পর সেখানকার ভারতীয়দের অবমাননা আগের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। জোহানসবার্গে ভারতীয়রা পৃথক এলাকায় নোংরা বস্তিতে থাকতো এবং তাদের কোন পৌর অধিকার ছিল না। তদুপরি শ্বেতকায়-পরিচালিত পৌর প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত তাদের উপর উচ্ছেদের নোটিশ জারি করত। এরকম অনেক উচ্ছেদের-নোটিশ-পাওয়া অনেক গরীব ভারতীয়ের পক্ষে গান্ধী মামলা পরিচালনা করলেন এবং বহু ক্ষেত্রে জয়ীও হলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দ। এবার গান্ধী এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন; সাংবাদিকের ভূমিকা। শিক্ষাদান ও প্রচার থেকে তিনি কখনোই বিরত থাকেননি। পুস্তিকা ও প্রচারপত্র আগেও প্রকাশ করেছেন, তাঁর "সবুজপত্র" তো ইতিমধ্যেই খ্যাত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিয়মিত কোনো পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব এর আগে কখনও নেননি। এবার তিনি "ইনডিয়ান ওপিনিয়ন" বা 'ভারতীয় মত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার "মূঢ়ম্লান মূক মুখে" ভাষা দেবার জন্যই এই সাপ্তাহিকের পরিকল্পনা। প্রথমে স্থির করেছিলেন ইংরেজি, গুজরাতী, হিন্দী ও তামিল এই চারটি ভাষাতেই যুগপৎ পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে। কিন্তু চারটি কাগজের ভার ঠিকমতো বহন করা সাধ্যে কুলাবেনা ভেবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজি ও গুজরাতী এই দুটো ভাষাতেই কাগজ বের করতে আরম্ভ করলেন। গান্ধী যখন ভারতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর জায়গায় যিনি নাটাল কংগ্রেসের সচিবের পদ গ্রহণ করেছিলেন সেই মনসুখলাল নজর হলেন এই সাপ্তাহিকের সম্পাদক। কাগজ চালানো প্রথমে খুব সহজসাধ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে গান্ধী নিজেই পকেট থেকে প্রতিমাসে প্রায় হাজার

টাকা এই কাগজের জন্য ব্যয় করতেন। কাগজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য প্রথম প্রথম কাগজে বিজ্ঞাপন এবং কাগজের প্রেসে বাইরের কাজ নেওয়া হত। গান্ধী পরে এ দুটো জিনিষই বন্ধ করে দিলেন। "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" ব্যবসাদারি কাগজ নয়। কাজেই জনস্বার্থে পরিচালিত ভারতীয়দের গণপত্রিকাকে জনসাধারণই চাঁদা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুক এইটিই গান্ধী চাইলেন। আগে বিজ্ঞাপন ও বাইরের অর্ডার সংগ্রহে প্রেস ও পত্রিকার কর্মীরা যে সময় ব্যয় করতেন এখন পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের জন্য তা করতে লাগলেন। চাঁদা আসতে লাগলো, গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, পত্রিকার পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের রাজনৈতিক চেতনা যতো বাড়তে লাগলো পত্রিকাও ততো দৃঢ়ভিত্তিক হয়ে উঠলো। এই পত্রিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে বিস্তারিত খবর দেওয়া হত, তাছাড়া গান্ধী নিজে প্রতি সংখ্যাতে নানা শিক্ষামুলক প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর রচনার মূল কথা ছিল, ভারতীয়দের আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, গঠনমূলক কাজে উৎসাহী হতে হবে, বিভেদ দূর করতে হবে, আত্মোন্নতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। খুব সহজ সাধাসিধে উদাহরণ ও গুজরাতী উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি এই প্রবন্ধগুলি লিখতেন। এই পত্রিকার ইংরেজি সংস্করণ বহু য়ুরোপীয়দের চিত্ত জয় কোরলো। অনেক শ্বেতকায় ভদ্রলোক গান্ধীর সান্নিধ্যে এলেন এবং তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লেন। মিঃ রিচ নামে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের এক ম্যানেজার চাকরি ছেড়ে দিয়ে গান্ধীর অধীনে চাকরি নিলেন এবং জনসেবার কাজে নিজেকে যুক্ত করলেন। জোহানসবার্গে একটি নিরামিষ ভোজনশালা ছিল। অন্যান্য নিরামিষাশীদের মধ্যে গান্ধী এখানে একজন জার্মানকে আবিষ্কার করলেন, নাম মিঃ ওয়েস্ট, ইনি ছিলেন একটি ছোট ছাপাখানার সংগে সংশ্লিষ্ট এবং নিজে অকৃতদার। ১৯০৪ খৃঃ প্লেগের সময় যখন ভারতীয়দের বস্তি এলাকায় গান্ধী সেবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন তখন মিঃ ওয়েস্ট তাঁর কাজে মুগ্ধ হন, এবং নিজে গান্ধীর সেবাকার্যে সাহায্য

করতে চান। গান্ধী বল্লেন, সেবাকাজে নয়, "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকার ছাপাখানার কাজে যদি তিনি সাহায্য করেন তবে সেটাই হবে সবচেয়ে কাম্য। ওয়েস্ট সংগে সংগে রাজি হয়ে গেলেন। প্লেগের সময় আরো একজন গান্ধীর কাজ দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন, তাঁর নাম মিঃ হেনরি পোলাক; বয়স বাইশ, ইহুদি, আইনজীবী, "ট্রান্সভাল ক্রিটিক" নামক পত্রিকায় কিছুদিন সাবএডিটর রূপে কাজ করেছেন। গান্ধী পোলাকের সংগে তাঁর নিজের "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" সাপ্তাহিক সম্বন্ধে আলোচনা করলেন এবং তাঁর পরামর্শ চাইলেন। পোলাক স্টেশন পর্যন্ত তাঁর সংগে এলেন এবং ট্রেনে পড়বার জন্য গান্ধীকে একখানি বই দিলেন; বইটি রাস্কিনের "আন টু দিস লাস্ট" বা 'এই শেষ সীমা পর্যন্ত'।

গান্ধী রাস্কিনের নাম আগেই জানতেন, মিঃ সল্টের প্রচার পুস্তিকায় রাস্কিনের প্রসংগ ছিল, তিনি তা পড়েছিলেন। কিন্তু এই প্রথম রাস্কিনের মূল গ্রন্থ গান্ধীর হাতে এল। ডারবানের পথে ট্রেনে তিনি "আনটু দিস লাস্ট" পড়তে আরম্ভ করলেন। গীতা ও টলস্টয়ের "কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ", "তোমার ভিতরেই ঈশ্বরের রাজ্য"-এর সংগে তৃতীয় সংযোজন হল রাস্কিনের এই বইটি। রাস্কিন, টলস্টয় ও গীতা হল গান্ধীর ত্রয়ী। রাস্কিনের বইতে ধনের প্রকৃত সংজ্ঞা কি সে সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। রাস্কিনের মতে প্রকৃত ধন প্রাণপ্রাচুর্য, কিন্তু লোকে মনে করে যে ধনিকের স্বার্থে অন্য লোককে খাটাতে বাধ্য করার শক্তিই ধনের প্রকৃত কাজ। তাঁর মতে, যে-রাজ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ মহৎ ও সুখী সেই রাজ্যই সবচেয়ে ধনাঢ্য। মানুষকে যে সমাজব্যবস্থা মেশিনে পরিণত করে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। জনসাধারণের মংগল সাধিত হয় সেই সমাজেই যেখানকার অর্থনীতিতে সামঞ্জস্য আছে, যা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমবায়-ভিত্তিক। রাস্কিনের বইটি গান্ধী পরে "সর্বোদয়" এই নামে গুজরাতী ভাষায় অনুবাদ করেন। স্বামী

বিবেকানন্দের প্রিয় উক্তি "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" গান্ধীজীর "সর্বোদয়" শব্দটির মধ্যেই যেন পুনরুচ্চারিত হল। মডেল গ্রাম 'মারিয়ান হিল' এর স্মৃতি এবং এডোয়ার্ড কার্পেনটারের সরল জীবনের আদর্শ রাস্কিনের বই পড়তে পড়তে গান্ধীর মনে নূতন করে দেখা দিল। সমষ্টির উন্নয়নের মধ্যেই আত্মোন্নয়ন, এইটিই এখন গান্ধীর জপমন্ত্র হল। বইপড়ার প্রভাব পাঠকের উপর কতোখানি পড়ে বা আদৌ পড়ে কিনা এ বিষয়ে নানা তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে। সকলের উপর বা সর্বদা না পড়লেও কারো কারো ওপর কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে যে বই পড়ার প্রভাব চূড়ান্ত হতে পারে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক আছে। রাস্কিনের "আনটু দিস লাস্ট" গ্রন্থটি যে গান্ধীকে চরম আলোড়িত করেছিল এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কারণ পরদিন সকালেই তিনি এই সংকল্প নিয়ে শয্যাত্যাগ করলেন যে "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকাটি রাস্কিনের ভাবাদর্শ অনুযায়ী সমবায় মালিকানায় পরিবর্তিত করবেন এবং সমবায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত করবেন। সেই দিনই তিনি মিঃ ওয়েস্টের সংগে বিশদ আলোচনা করে স্থির করলেন, পত্রিকাটি হবে একটি কৃষি অঞ্চলে, যেখানে সকল কর্মীই সমান অংশীদার হিসাবে কাজ করবে, সমান বেতন নেবে, প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকা মতো পাবে, বর্ণ বা অন্য কোনো বৈষম্য মানা হবেনা। যেমি কথা তেমি কাজ। ডারবান থেকে চোদ্দ মাইল দূরে "ফিনিক্স" নামক গ্রামে কুড়ি একর জমির উপর "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" কাগজের প্রেস ও অফিস স্থানান্তরিত হল। অচিরেই ফিনিক্স একটি নূতন ধরণের উপনিবেশ হয়ে উঠলো। গান্ধী সব সময় এখানে থাকতে না পারলেও কস্তুরবাঈ ও ছেলেদের এখানে রাখলেন। মিঃ ওয়েস্টও এই উপনিবেশের একজন স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। মিঃ ওয়েস্টের বিয়ের পর শ্রীমতী ওয়েস্ট, ওয়েস্টের শাশুড়ী, এবং বোন অ্যাডা তাঁরাও এসে এই পল্লীর বাসিন্দা হলেন। তাঁর দেওয়া বই পড়ে গান্ধীর এই পরিবর্তন হয়েছে

দেখে হেনরি পোলাক এমনি চমৎকৃত হলেন যে নিজে "ট্রান্সভাল ক্রিটিক" পত্রিকার কাজে ইস্তফা দিয়ে ফিনিক্স পল্লীতে এলেন এবং "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকার কাজে যোগ দিলেন। গান্ধী-চক্রে বা গান্ধী-রিপাবলিকে আরো অনেকেই এসে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হলেন একজন জার্মান ইহুদি স্থপতি, নাম হের্মান কালেনবাক।

ফিনিক্স উপনিবেশের জীবনযাত্রার পিছনে যে মানুষটির নিজের জীবনযাত্রার অবদান ছিল প্রায় শতকরা একশো ভাগ, তিনি হচ্ছেন গান্ধী। ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে একটি বিশেষ ধরণের জীবনের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। ধনিক ও বণিক সভ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি থোরো, রাস্কিন ও টলস্টয়ের ধ্যানধারণা-গুলিকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের জন্য বদ্ধ পরিকর হচ্ছিলেন। সরল, অনাড়ম্বর, আত্মনির্ভরশীল জীবন যাপন ছিল তার অন্বিষ্ট। কার্লাইলের "হিরোজ অ্যাণ্ড হিরো ওয়রশিপ" বা 'বীর ও বীর পূজা' গ্রন্থে বর্ণিত মহম্মদের চরিত্রটি এই জন্য তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। কারণ মহম্মদ নিজের জুতো, টুপি, জামা নিজেই সেলাই করতেন। এতে আর কিছু না হোক খরচ কমতো। জমাখরচের বাস্তব হিসাবে গান্ধী ছিলেন পাকা বেনিয়া, এবং একথা বহুক্ষেত্রে চাঁদা তুলবার সময় তিনি সগর্বে বলতেনও। বেশ কয়েকবছর ধরেই তিনি নিজের কাপড় নিজেই কাচতেন, এবং নিজের চুলও নিজেই ছাঁটতেন। মাঝে মাঝে কোর্টের অন্য সহকর্মী ব্যারিস্টাররা তাঁর কাকে ঠুকরানো চুল ছাঁটা দেখে হেসে মজা পেতেন, কখনো বা অতিরিক্ত মাড় দেওয়া শার্টের কলার দেখে মুচকি মুচকি হাসতেন। গান্ধী অবশ্য এসবে দমবার পাত্র ছিলেন না। তাঁর আরেকটা বাতিক ছিল—ভারতবর্ষের সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে বাতিকই বলা উচিত—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই গান্ধী প্রথম মূল গীতা পড়তে আরম্ভ করেন। এই সময় জোহানসবার্গে থিওসফিস্টরা তাঁর কাছ থেকে হিন্দুধর্মশাস্ত্র

সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাইলেন। তখন তিনি স্থির করলেন কিছু বলবার আগে নিজে মূল সংস্কৃত গীতা পড়বেন। সকালে পনর মিনিট ধরে তিনি দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতেন। দাঁত মাজতে মাজতেই তাঁর প্রথম মূল গীতাপাঠ আরম্ভ হত। গীতার কয়েকটি শ্লোক রোজ কাগজে লিখে দেয়ালে লাগিয়ে রাখতেন এবং দাঁত মাজতে মাজতে সেগুলি আয়ত্ত করতেন। এই ভাবে কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় গোটা গীতা গ্রন্থটি তার কণ্ঠস্থ হয়ে গেল, এবং গীতার শ্লোক সম্বল করে তিনি নিজের বুদ্ধি ও বিচার মতো হিন্দুধর্মের সার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। গীতার নিষ্কাম কর্মের উপদেশ তাঁর কাছে বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠলো।

গান্ধী ও কস্তুরবাঈ যখন ভারতবর্ষ থেকে ডারবানে আসেন তখন সংগে ছিল তাঁদের দুই ছেলে হরিলাল ও মণিলাল; হরিলালের বয়স নয় এবং মণিলালের পাঁচ। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের আরো দুটি সন্তানের জন্ম হল রামদাস ও দেবদাস। দেবদাসের জন্মের সময় সূতিকাগারে ধাত্রীর কাজ করেন গান্ধী নিজেই। এর জন্য তিনি আগে থেকেই ধাত্রীবিদ্যার বই পড়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। ডাক্তার নন এমন পিতাকর্তৃক পেশাদার ধাত্রীর মতো সন্তান ভূমিষ্ঠ করানোর দৃষ্টান্ত আর আদৌ আছে কিনা আমার জানা নেই। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই ভাবী সন্তানের জননী কস্তুরবাঈয়েরও সম্মতি ছিল, অন্তত পূর্বেই এই সম্মতি তাঁর কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিল। কস্তুরবাঈ আধুনিকা ছিলেন না, গান্ধীর মতো নানা ধরণের বিপ্লব ও অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণাও তাঁর মাথায় ঘুরতো না; বরং আচার আচরণে তিনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সেকেলে ধরণধারণই পছন্দ করতেন। কস্তুরবাঈয়ের পক্ষে স্বামীর জন্য নীরবে কতোখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা আমরা বুঝতে পারি। গান্ধীজী যখন যা বিশ্বাস করেছেন তখন ঠিক সেইমতো জীবন যাপন করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর আশপাশে যে সংগীসাথীরা থাকতো তাদেরও এ থেকে রেহাই দিতেন না। তিনি

মাদাম ব্লাভাতস্কির মতোই বিশ্বাস করতেন যে, স্কুলের প্রচলিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে প্রকৃত শিক্ষালাভ করা যায় না। কাজেই যখন ছেলেদের শিক্ষার কথা উঠলো তিনি তাদের কোনো মিশনারি স্কুলে দিলেন না। তিনি স্থির করলেন তাদের শিক্ষা মাতৃভাষা গুজরাতীতে দিতে হবে, ইংরেজিতে নয়, এবং সে শিক্ষা তিনি নিজেই দেবেন, অর্থাৎ তিনি নিজেই আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন। দুঃখের বিষয়, গান্ধীর পক্ষে পুরোপুরি এই ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিলনা এবং কখনই তা সম্ভবপর হয়নি, কারণ তিনি রাজনৈতিক ও জনহিতকর কাজে এমন জড়িয়ে ছিলেন যে তাঁর হাতে একটুও বাড়তি সময় ছিলনা।

দৃষ্টান্ত আরো আছে। গান্ধী আদর্শবাদী, কিন্তু তিনিও রক্তমাংসের মানুষ, দেবতা নন। তিনি অসাধারণ হলেও বহুবিষয়েই আর দশ-জনের মতোই সাধারণ মানুষ। গান্ধী নিজ হাতে পায়খানা সাফ করতেন এবং কস্তুরবাঈকেও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলতেন। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে কস্তুরবাঈয়ের নিজস্ব সংস্কার সত্ত্বেও একদিন তাঁকে বাধ্য করলেন এক অস্পৃশ্যের পায়খানা পরিষ্কার করতে। ক্রুদ্ধ কস্তুরবাঈ কাঁদতে কাঁদতে স্বামাকে বল্লেন, “তোমার ঘর বাড়ী তুমি তোমার খুশিমতো চালাও। আমি পারবো না। আমাকে রেহাই দাও।” গান্ধীও রেগে গিয়ে কস্তুরবাঈকে টানতে টানতে দরজা পর্যন্ত নিয়ে আসেন। তারপর যখন কস্তুরবাঈ ভর্ৎসনা করে বলেন, “কী কোরছো? একটুও আক্কেল নেই তোমার?” তখন তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দেন।

গান্ধী জোহানসবার্গে এমন একটি সংসার পেতেছিলেন যেখানে গৃহকর্ত্রী হওয়ায় কোনো সুখ ছিলনা। পরিবারের লোক নিজেরাই গম ভাঙতেন, আটা তৈরি করতেন এবং নিজেদের রুটি নিজেরাই বানিয়ে নিতেন। মিস্টার ও মিসেস পোলককেও এই কাজে হাত লাগাতে হত। গান্ধীর আত্মনির্ভরশীলতার এই “বাতিক”

কস্তুরবাঈ সব সময় পছন্দ করতেন না। পারলেই নানা অজুহাতে তিনি এড়িয়ে চলতেন। গান্ধী কিন্তু সামান্য কর্তব্যকে লঘু করে দেখতেন না। গীতার মর্ম অনুযায়ী তিনি ভেবে দেখলেন ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় চিন্তা পাপ। অতএব তিনি স্থির করে ফেল্লেন জীবনবীমা আর চালু রাখবেন না। শুধু তাই নয়, এই সময় তিনি "ব্রহ্মচর্য" পালন সম্বন্ধেও গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন। চারটি সন্তানের পর পঞ্চম সন্তানের জনক হবার তাঁর আর ইচ্ছা ছিলনা। অথচ কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে সংযমী হওয়াই জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রকৃষ্ট উপায়। ১৯০১ খৃঃ থেকে তিনি নানাভাবে আত্মসংযম পালন করতে চেষ্টা করেছেন, এবং অবশেষে ১৯০৬ সাল থেকে এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সফল হন। গান্ধী ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে যে শপথগুলি করেন কস্তুরবাঈ তাতে সায় দেন। বলা বাহুল্য, কস্তুরবাঈয়ের সহযোগিতা ছাড়া গৃহী গান্ধীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালন সম্ভবই হতনা। গান্ধী বিশ্বাস করতেন ব্রহ্মচর্য পালন করলে মানুষের মানসিক ও আত্মিক শক্তি বাড়ে। ১৯০৬ খৃঃ তিনি ব্রহ্মচর্যের শপথ গ্রহণ করেন। আর প্রায় ঐ সময়েই তিনি মনোবলের এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

এই সময় ট্রান্সভাল সরকার সেখানে এশিয়াবাসীদের বিশেষ করে ভারতীয়দের জন্য একটি বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্সের ফলে প্রত্যেক ভারতীয়কে একটি করে সার্টিফিকেট সংগে রাখতে হবে এবং এই সার্টিফিকেটের জন্য প্রত্যেককে আঙুলের ছাপ দিতে বাধ্য করা হবে। কেউ সার্টিফিকেট সংগে না রাখলে তার জরিমানা, জেল বা দেশান্তর হতে পারবে। এই সার্টিফিকেট দেখবার জন্য পুলিশ যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায়, যে কোনো অবস্থায় একজন ভারতীয়কে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। আঙুলের ছাপ দেওয়া ব্যাপারটা সব চেয়ে অপমানকর, কারণ ট্রান্সভালের আইনে ফৌজদারী মামলায় দণ্ডিত আসামী ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আঙুলের ছাপ

নেবার রীতি ছিলনা। গান্ধী দেখলেন এই অর্ডিন্যান্সের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে ট্রান্সভালে এবং ক্রমে সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা, যেন তাদের সেখানে থাকবার কোন অধিকার নেই, দয়া করে থাকতে দেওয়া হয়েছে মাত্র, এবং যখন খুশি সেখান থেকে বিতাড়িত করা যাবে। গান্ধী বুঝলেন, এবার ভারতীয়দের সত্যিই বাঁচার লড়াইতে নামতে হবে। গান্ধী সবাইকে বুঝালেন, প্রতিবাদ করতে হবে, মুখ বুজে মেনে নিলে চলবেনা। ১৯০৬ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ভারতীয়রা হরতাল পালন কোরলো এবং প্রায় তিন হাজার মানুষ এক প্রতিবাদ সভায় জমায়েত হল। গুজরাতী, হিন্দী, তামিল ও তেলেগুভাষীদের কাছে গান্ধী দোভাষীর সাহায্যে অর্ডিন্যান্সটি ব্যাখ্যা করলেন, এবং বল্লেন, আমরা ভারতীয়রা এই আইন মানবো না, এবং এই আইন অমান্যের জন্য যে কোনো ক্লেশ বা শাস্তি বরণ কোরবো। হয়তো আমাদের অনাহারে থাকতে হবে, হয়তো জেলখানায় আমাদের কায়িকশ্রমে বাধ্য করা হবে, হয়তো বা আমাদের ধরে বেতমারা হবে; অথবা এমনও হতে পারে যে আমাদের জেলে না দিয়ে খুব মোটা টাকা জরিমানা করা হবে। গান্ধী বল্লেন, আমি সাহসের সংগে ঘোষণা করছি যে যতোদিন সামান্য কিছু মানুষও নিজেদের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, ততোদিন এই সংগ্রামের একটিমাত্র পরিসমাপ্তিই সম্ভব, সেটি হচ্ছে জয়। তিনি বক্তৃতার শেষে বল্লেন, তিনি এই সংগ্রামের নেতৃত্ব নিতে প্রস্তুত, এবং তিনি কখনোই তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না, এমন কি যদি শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে তিনি ছাড়া আর কেউ না থাকে তবুও না। গান্ধীর এই বক্তৃতা পেশাদারী জ্বালাময়ী বক্তৃতা ছিলনা। তিনি শ্রোতাদের মধ্যে কোনো সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাননি। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর বক্তৃতা সব সময়ই শান্ত, সংযত; কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তিনি কখনোই চড়াতেন না, বাক্-বিভূতি দিয়ে শ্রোতাদের মনে কোনো আবেগ বা সম্মোহন সৃষ্টি করা তাঁর

অভিপ্রেত ছিলনা। খুব পরিষ্কার, যুক্তিপূর্ণ অথচ দৃঢ় বক্তব্য রাখা গান্ধী চিরকাল পছন্দ করতেন। শ্রোতারা গান্ধীর বক্তব্যকে কখনো গুরুত্বহীন মনে করতে পারতেন না। এ বিষয়ে কোনো সংশয় থাকতো না যে গান্ধী যা বলতে চান ঠিক তাই এবং ততোটুকুই বলছেন, তিনি যা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না তা কখনোই বলতেন না। প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করতেও তিনি কিছুমাত্র ব্যগ্র ছিলেন না, আত্মপক্ষ সমর্থনেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হত। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বোঝা এবং বোঝানোর অংশই থাকতো সবচেয়ে বড়ো। তিনি যখন নিজের ভুল বুঝতে পারতেন তখন তা অকপটেই স্বীকার করতেন, কিন্তু ভুলকে ভুল না বোঝা পর্যন্ত তিনি নিজের ভুল থেকেও বিচ্যুত হতেন না। ইংরেজিতে একটি কথা আছে, মানুষ ভাষা ব্যবহার করে মনের আসল ভাবটি লুকোবার জন্য। কিন্তু গান্ধীজীর বেলায় এই কথাটি একেবারেই খাটে না।

অনেক সময় আমাদের ভাব ও ভাষার মধ্যে লুকোচুরি থাকে, লুকোচুরি থাকে কথা ও কাজের মধ্যে। একেই বলা হয় ভাবের ঘরে চুরি। গান্ধীর কাছে এই জিনিষটির কোনো অস্তিত্বই ছিলনা। যে-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই সংগ্রামেও যাতে ভাবের ঘরে চুরি না ঘটে গান্ধী সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হতে চাইলেন। সকলকে তিনি এই শপথ নেওয়ালেন যে অর্ডিন্যান্সটি যদি আইনে পরিণত করা হয়, তারা সকলেই সে আইন অমান্য করবে। অমান্য করবে, কিন্তু উত্তেজিত হবে না, হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে না, প্রতিপক্ষের ক্ষতি করতে উদ্যত হবেনা। এই অহিংস আইন অমান্যকে অনেকে "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" বা 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' এই নামে অভিহিত করেছিলেন। গান্ধী নিজেও প্রথম্ প্রথম বহু জায়গায় "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু "নিষ্ক্রিয়" কথাটি তাঁর মনঃপূত হয়নি ; কারণ তাঁর নতুন ধরনের প্রতিরোধ রীতিমতো সক্রিয় প্রতিরোধ। "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" বল্লে মনে হয়

অশক্তের নীরবে মুখ বুজে সহ্য করার বা অত্যাচারীকে বাধা না দেবার ভীরু সিদ্ধান্ত। গান্ধীর আন্দোলন কোনো নেতিবাচক আন্দোলন নয়। এর উদ্দেশ্য ন্যায় বা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। যে অধিকার ন্যায্য, যে সম্পর্ক মানবিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সাহসের সংগে তাকে গ্রহণ করাই গান্ধী-আন্দোলনের লক্ষ্য। তাই তিনি এর নাম-করণ করলেন "সত্যাগ্রহ" বা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, এবং সংগ্রামীদের নাম দিলেন "সত্যাগ্রহী"। দুর্বলতা বা নিষ্ক্রিয়তা নয়, সংঘাত এড়ানো বা সংঘর্ষের ক্ষেত্র থেকে পলায়ন নয়। সত্যাগ্রহ কখনো ভীরু, কাপুরুষ বা অশক্তের আত্মপ্রবঞ্চনা নয়। এটি শক্তিমানের শক্তিরই প্রকাশ, তবে নতুন ধরণের শক্তি এবং নতুন ধরণের প্রকাশ। সত্যাগ্রহী অস্ত্রের শক্তিতে শক্তিমান নন। তিনি নিরস্ত্র বলেই সহিংস, তাও নয়। তিনি অস্ত্র থাকলেও অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিরস্ত্র হবেন, অহিংস থাকবেন। হিংসা একটি মনের ভাব। মনে এই ভাবটির উদয় হলে তার প্রকাশ ঘটে হিংসাত্মক কাজে; যার মনে হিংসা নেই তার কাজেও হিংসা থাকতে পারেনা। যে-শক্তিতে একজন অস্ত্র বা বলপ্রয়োগ করে তা হচ্ছে কায়িক শক্তি; যে-শক্তিতে একজন নিরস্ত্র হয়েও এবং পীড়নের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়ায় এবং অন্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে তা হচ্ছে মানসিক বা আত্মিক শক্তি। গান্ধীর মতে এ দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয় শক্তিই শ্রেষ্ঠ। যেখানে অস্ত্র বা বলপ্রয়োগ সম্ভব নয় শুধু সেখানেই অহিংস প্রতিরোধ করতে হবে তা নয়, যেখানে অস্ত্র বা বলপ্রয়োগ সম্ভব সেখানেও সত্যাগ্রহ হচ্ছে নিরস্ত্র যুদ্ধ। কিন্তু শুধু নিরস্ত্রের যুদ্ধ নয়, নিরস্ত্র বা সশস্ত্র উভয়ক্ষেত্রেই এই নিরস্ত্র বা অহিংস সংগ্রাম শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম। অহিংসাকে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে জ্ঞান করা এবং বিভিন্ন সংঘর্ষের ক্ষেত্রে অন্যায়ের মোকাবিলায় এই অস্ত্র ব্যবহার করার পদ্ধতি, বলা যায়, গান্ধীজীর আবিষ্কার। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয়কে সমানভাবে জ্ঞান করা বা দুঃখে উদ্বিগ্ন না হওয়া এবং সুখে নিস্পৃহ থাকার কথা গীতাতে

আছে। রোমান দার্শনিকদের মধ্যে স্টোয়িকরাও সর্বংসহিষ্ণুতার দর্শন প্রচার করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু, জৈন, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মে বা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে অহিংসার বা অহিংস আচরণের যে স্থান তা হচ্ছে নিতান্তই নেতিবাচক ও ব্যক্তিগত, এবং তার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বা মুক্তি। কর্মক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ, বিশেষত ব্যাপক রাজনৈতিক সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে অহিংসার প্রয়োগ, একটি সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার, এবং বলা যায় গান্ধীই এর আবিষ্কারক ও প্রবর্তক। সত্যাগ্রহ শক্তিশালী অস্ত্র, কিন্তু সুপ্রযুক্ত না হলে এই অস্ত্রের কোন কার্যকারিতাই থাকে না। যত্র তত্র প্রয়োগে এর ফল বরং উল্টো হতে পারে। চরম মোকাবিলার ক্ষেত্রেই এই চরম অস্ত্রটি প্রযোজ্য; এবং এই মোকাবিলা ন্যায়-অন্যায় সত্য-অসত্য সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্নের সংগে জড়িত হওয়া চাই। এই অস্ত্র কোন্ চরমক্ষণে ব্যবহার করতে হবে তা সত্যাগ্রহী ছাড়া অন্য কেউ নির্দ্ধারণ করতে পারে না। সত্যাশ্রয়ী ছাড়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্ভব নয়। মনোবলই যেখানে অস্ত্র সেখানে আত্মানুসন্ধানের পর মানসিক প্রস্তুতিই সবচেয়ে বড়ো কথা। ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা বা ক্রোধের মনোভাব থেকে নয়, সত্য এবং ন্যায়ের জন্য অন্যায়কারী প্রতিপক্ষের প্রতিও প্রীতির মনোভাব নিয়ে, নির্যাতনের ঝুঁকি নিয়ে অথচ অহিংস থেকে অন্যায়ের সংগে অসহযোগিতা করা এবং অন্যায়কে চ্যালেঞ্জ করার নামই সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহী যখন মন থেকে বুঝতে পারছেন যে অন্যায় প্রতিরোধের চরম মুহূর্ত এসে গেছে, তখন আর তিনি কোনো দ্বিধা করেন না, কর্তব্য বা সত্যের অনুরোধে অকুতোভয় তিনি শক্ত হয়ে দাঁড়ান এবং মরণপণ করেন। এটি তাঁর নৈতিক বাঁচার লড়াই। ঈশ্বর-ভক্ত গান্ধী এই মন-থেকে-বোঝাকে বলতেন ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ। প্রকৃতপক্ষে এটি শুদ্ধ সত্যাশ্রয়ী মনের আত্মনির্দেশ। সাধারণত দমনমূলক প্রতিষ্ঠান বা আইনের সংগে অহিংস অসহযোগিতাই এই অস্ত্র প্রয়োগের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। সত্যাশ্রয়ীরা বয়কট

এবং ধর্মঘট পালন করতে পারে। কিন্তু ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ যখন এজন্য আঘাত হানবে তখন সেই আঘাতে তারা বিচলিত হবেনা, প্রতিহিংসা বা বদলার কথা মনে আনবে না, প্রয়োজন হলে হাসিমুখে জেলে যাবে, ফাঁসিতে যাবে। কিন্তু মনে কোনো ঘৃণার ভাব আনবে না; এক কথায়, পূর্ণ আত্মসংযমের অধিকারী হবে এবং ক্রোধের পরিবর্তে কর্তব্যবোধে চালিত হবে। অন্যায়কারীর হাতে সত্যাগ্রহী নিপীড়িত হন, কিন্তু এই নিপীড়ন বা দুঃখবরণের মধ্য দিয়েই অবশেষে তিনি জয়ীও হন। প্রতিপক্ষের চূড়ান্ত পরাজয়েই তাঁর জয় নয়, প্রতিপক্ষকে ন্যায়ের পথে নিয়ে আসা এবং সত্যের প্রতি অনুরক্ত করাই প্রকৃত কাজ। মহাভারতে, মনুসংহিতায় এবং কৌটিল্যে রাজধর্ম বা রাজনীতিকে সর্বদাই বাস্তব প্রয়োগশাস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সেখানে বরং পাশ্চাত্য মাকিয়াভেল্লির মতোই রাজনীতিকে দেখা হয়েছে নীতি-বিচার বহির্ভূত। রাজনীতি সর্বদাই একচ্ছত্র রাজার রাজ্য পরিচালনার কৌশল; রাজাজ্ঞানুবর্তী হওয়াই প্রজাদের একমাত্র ভূমিকা। গান্ধী রাজনীতির ঊর্ধে স্থান দিলেন নীতিকে। তিনিও আইনের শাসনে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি বল্লেন, কোনো কোনো আইন ভাঙতেও হয় যখন দেখা যায় তা উচ্চতর নীতির পরিপন্থী। এই উচ্চতর নীতিকে ঈশ্বর ভক্ত গান্ধী নিজের পরিভাষায় বলতেন ঈশ্বরের নির্দেশ। অতীতে ধর্মের জন্য বহু সন্ত ও প্রফেট শহীদ হয়েছেন, রাজার নির্দেশ যখন ধর্মের নির্দেশকে লঙ্ঘন করেছে, তাঁরা রাজনির্দেশকে সাহসের সংগে অস্বীকার করেছেন এবং এজন্য হাসিমুখে চরম দণ্ডও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রশ্নেই তাঁরা এই নির্যাতন সহ্য করেছেন। যেমন বাইবেলের দানিয়েলের আখ্যানে দেখা যায় দানিয়েল নিজের ধর্মমতে দৃঢ় থাকার জন্য রাজা নেবুকাদনেজারের কাছে একের পর এক নির্যাতন সহ্য করেছেন। নেবুকাদনেজার আইন করলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবতার স্বর্ণ বিগ্রহের কাছে আরতির

সময় সবাইকে প্রণাম করতে হবে, যে করবেনা তাকে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। দানিয়েল ও তাঁর আর তুজন সংগী তবু স্বর্ণ বিগ্রহের কাছে প্রণাম করবার আইন সরাসরি অমান্য করলেন এবং অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলেন। রাজা দরায়ুস আইন করলেন যে যাকিছু আবেদন ও প্রার্থনা তা জানাতে হবে শুধুমাত্র রাজার কাছে, রাজার বদলে অন্য কোনো অদৃশ্য ভগবানের কাছে যে প্রার্থনা জানাবে তাকে সিংহের গুহায় নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু দানিয়েল এসব মানলেন না। যথারীতি তাঁর নিজের ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন তিনবার করে প্রার্থনা করতে লাগলেন। রাজা রেগে তাঁকে সিংহের গহ্বরে ছুঁড়ে দেবার আদেশ দিলেন। অহিংস দানিয়েল আশ্চর্যভাবে সিংহের সংগে একই গুহায় সারারাত কাটিয়েও বেঁচে রইলেন; রাজার প্রতি তাঁর মনে কোনো বিদ্বেষ বা ক্রোধ জন্মাল না। এই কাহিনীর মধ্যেই রয়ে গেছে আইন অমান্যের সত্যাগ্রহের প্রাচীন ইংগিত।

জনহিতকর কোনো গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলনের সংগে নীতির প্রশ্ন এর আগে কখনো জড়িত করা হয়নি। এবং প্রতিরোধ না করেও আইন অমান্য করার যে দৃষ্টান্ত ধর্মপ্রচারকরা ব্যক্তিগত ভাবে শহীদ হ'য়ে স্থাপন করেছেন তা গোষ্ঠী বা সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়নি। গান্ধী যে আইন অমান্যের কথা বল্লেন তার মধ্যে বিশৃংখলা বা সাধারণ অর্থে অরাজকতা সৃষ্টির কথা তো নেইই বরং শৃংখলাবোধের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা আছে। গান্ধী একটি সুনির্দিষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে ট্রান্সভালের ভারতীয়দের সত্যাগ্রহী হিসাবে গড়ে তুলছিলেন, চিরাচরিত আন্দোলনের পরিবর্তে একটি নতুন ধরণের আন্দোলনে তারা সৈনিক হবে। ট্রান্সভালে ভারতীয়রা শান্তিতেই বসবাস করতে চায়, অন্য কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করবার অভিসন্ধি তাদের নেই এবং তাদের সংগ্রাম কোনো প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেও নয়। একটি বিশেষ আইনকে বেছে নিয়ে গান্ধী নাটকীয় ভাবে সেই আইনটি অমান্য করবার কথা

চিন্তা করলেন। ঐ একটিমাত্র ক্ষেত্র বাদ দিলে অন্যান্য সব ক্ষেত্রে, অন্য সব আইনের বিষয়ে, ভারতীয়রা আইনের অনুবর্তী থাকবে। অন্যায়ের গুরুত্ব সবাইকে বোঝানোর জন্যই তাঁর এই পদ্ধতি। চুপি-সাড়ে, অতর্কিতে, ছলেবলে কৌশলে শত্রুকে পর্যুদস্ত করার পদ্ধতি এটি নয়, প্রতিপক্ষকে বলপ্রয়োগে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে বা তার কাছ থেকে কিছু জোর করে আদায় করবার জন্য এই সংগ্রাম নয়। কাজেই এই সংগ্রামের কোন গুপ্ত কলাকৌশল বা আনুষঙ্গিক দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। প্রস্তুতি শুধু মানসিক দৃঢ়তার। প্রকৃতপক্ষে এই সংগ্রামে জয় বা পরাজয় নেই। অন্যায়কে খুলে ধরা এবং ন্যায়কে তুলে ধরাই এই আন্দোলনের শক্তি। প্রতিপক্ষ যখন নিজের পক্ষভুক্ত হবে, যখন দুটি পৃথক পক্ষই আর থাকবেনা, যখন বিরোধী বিজিত না হয়ে ন্যায়ের পক্ষে পরিবর্তিত হবে তখনই এই সংগ্রামের প্রকৃত সাফল্য। ন্যায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে এই আন্দোলনে কখনই নামা যায় না। কাজেই সত্যাগ্রহীর প্রথম কাজ হচ্ছে নিজের কাছে নিজের বিশ্বাসকে পুরোপুরি যাচাই করে বুঝে নেওয়া; কোনো হুজুগের টানে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবকাশ নেই। এই জন্যই বহু দফা সম্বলিত দাবী আদায়ের টেকনিক গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রয়োগ করেননি। আন্দোলনের মধ্যে বিশেষ একটি কেন্দ্রবিন্দুতে দৃষ্টি এবং মনোযোগ যাতে একাগ্র থাকে সেবিষয়ে তিনি সর্বদাই যত্নবান থাকতেন। আন্দোলনের সূচিমুখ একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে এমন গৌণ প্রবণতাগুলিকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। এজন্য অনেক বিরূপ সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে; তিনি আন্দোলনকে ব্যাপক ও বিস্তৃত না করে সংকুচিত করে রাখছেন, এই অভিযোগ তাকে বহুবার শুনতে হয়েছে। শত্রুকে পরাস্ত করা ও অধিকার আদায় করার দৃষ্টিতে দেখলে এই অভিযোগগুলি সত্য; কিন্তু গান্ধী কখনো বিরোধী বা বিপক্ষকে শত্রু জ্ঞান করতেন না।

তাঁর মতে এরা সাময়িক ভাবে ভ্রান্ত মাত্র। মানুষের সুবুদ্ধি উদয়ের সম্ভাবনা কখনোই সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয় না। "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য গান্ধীজীর ক্ষেত্রে। অনেকে এই বলে গান্ধীজীকে সমালোচনা করেছেন যে সত্যাগ্রহও একপ্রকার বলপ্রয়োগ, কারণ বিরোধী তার ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হবে এবং আত্মসমর্পণ করবে, এও হিংসারই সামিল, শুধু সত্য এবং অহিংসার আবরণটি আছে বলেই মনে হয় এটি আক্রমণাত্মক নয়, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ফল একই, বিরোধীর পরাজয়। যদি সত্যাগ্রহীও কিছুটা নিজের দাবী বা বক্তব্য থেকে সরে আসেন এবং প্রতিপক্ষের সংগে সমঝোতায় আসেন, প্রতিপক্ষের বক্তব্যকেও অংশত স্বীকার করেন তবেই তাকে অহিংস বলা যেতে পারে। হয় চূড়ান্ত জয় নয় চূড়ান্ত পরাজয়, এর মধ্যে প্রথমে সত্যের জয় হলেও একটি স্পর্দ্ধার মনোভাব পাওয়া যায়, মনস্তত্ত্বের বিচারে হয়তো এটিও আক্রমণাত্মক বা হিংসাত্মক। মানুষ মাত্রেই ভুল করে। বোঝাবুঝির ভুল ছাড়াও ন্যায় অন্যায়ের বিচারেও ভুল হয় এবং হতে পারে। কাজেই আমিই অভ্রান্ত এবং অপরে ভ্রান্ত, এই দাবীর মধ্যে যে অহমিকা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ প্রসংগে যাঁরা এই সমালোচনা করেন তাঁরা সত্যাগ্রহের অ্যাবস্ট্রাক্ট লজিকই শুধু বিচার করেন। বাস্তব প্রয়োগ-ক্ষেত্রে গান্ধীজী নিজে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই আপোষ বা মধ্য পন্থায় রাজী হয়েছেন ; বিরোধী পক্ষ স্বেচ্ছায় নিজের ভুল বা অন্যায় বুঝতে পেরে যতোটুকু দাবী মেনে নিয়েছে সেটিই গান্ধীজীর কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান, সেটিই একমাত্র জয়। রাজনীতিতে দরকষাকষি আছেই, এবং গান্ধীজী একজন বেনিয়া ; কিন্তু সত্যাগ্রহকে তিনি দরাদরির একটি সুবিধাজনক অস্ত্র হিসাবে কখনোই দেখেননি।

গান্ধী ১৯০৬ খৃঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় "সত্যাগ্রহ" আন্দোলনের সূচনা

করেন। এর অনেক আগেই তিনি ইংরেজ কবি শেলীর নাম ও কিছু কিছু রচনার সংগে পরিচিত ছিলেন। মিঃ সল্ট ও মিসেস কিংসফোর্ডের লেখাতে শেলীর উল্লেখ ছিল। এবং সেই লেখাগুলি গান্ধী খুব যত্ন করে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে গান্ধীকে শেলীর বিখ্যাত কাব্যনাট্য "দ মাস্ক অব অ্যানারকি" বা 'নৈরাজ্যের মুখচ্ছদ' থেকে উদ্ধৃতি দিতেও দেখা যায়। অনুমান করতে পারি, শেলীর "দ মাস্ক অব অ্যানার্কি" এবং "প্রমিথিউস আনবাউণ্ড" 'বা শৃংখলমুক্ত প্রমিথিউস' পড়ে তাঁর কল্পনা উদ্দীপিত হয়েছিল এবং মানুষও মনুষ্য সমাজের মুক্তির একটি স্থায়ী চিত্র তাঁর মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। শেলীর "প্রমিথিউস আনবাউণ্ড" নাটকের সর্বশেষ পংক্তিগুলিতে মুক্ত বিশ্বে স্বর্ণযুগের আবির্ভাব কী উপায়ে আসবে সেসম্বন্ধে ডেমোগরগনের অবিস্মরণীয় উক্তি শেলীর সর্বোদয়ের ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয় :—

To suffer woes which Hope thinks infinite ;
To forgive wrongs darker than death or night ;
To defy Power, which seems omnipotent ;
To love, and bear ; to hope till Hope creates
From its own wreck the thing it contemplates ;
Neither to change, nor falter, nor repent ;
This, like thy glory, Titan, is to be
Good. great and joyous, beautiful and free ;
This is alone Life, Joy, Empire, and Victory.

অর্থাৎ :—

অন্তহীন নির্যাতন সহ্য করো, হয়োনা নিরাশ ;
ক্ষমা করো অবিচার, মৃত্যু, কিংবা রাত্রিসম ত্রাস ;
শক্তিকে অমান্য করো, হয় হোক শক্তি সীমাহীন ;

ভালোবাসো, ধৈর্য ধরো ; আশা রাখো, ভগ্ন আশা ফুঁড়ে
জন্ম নেবে একদিন পূর্ণ ফল আশাবৃক্ষ চূড়ে।
থাকো দৃঢ়, অবিচল, অকম্পিত, অনুতাপহীন,
একমাত্র এই পন্থা শুভংকর গৌরবের পথ
মহত্ত্বের, আনন্দের, সুন্দরের, মুক্তির, শপথ,
এতেই জীবন, সুখ, আত্মার সাম্রাজ্য, জয়রথ।

শেলীর এই কাব্য নাটকটি গ্রীক নাট্যকার ইস্কিলাস রচিত "বন্দী প্রমিথিউস" অবলম্বনে রচিত হলেও শেলী এতে নূতন এক প্রমিথিউসের কল্পনা করেছেন। ইস্কিলাসের প্রমিথিউস বিদ্রোহী, উদ্ধত, ক্রোধী, বেপরোয়া, প্রতিহিংসাপরায়ণ ; কিন্তু শেলীর প্রমিথিউস বীর ও শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কোনো তিক্ততা নেই, আছে সংযম, স্থৈর্য, আত্মিক শক্তি ও দূরদৃষ্টি ; তার চরিত্রে ঘৃণার বদলে ভালবাসারই প্রাবল্য। শেলীর নায়ক যেন গান্ধীজন্মের বহু আগেই গান্ধীর আদর্শের ছাঁচে তৈরি।

"দ মাস্ক অব অ্যানার্কি" বা 'নৈরাজ্যের মুখচ্ছদ' এর সেই সব পংক্তি থেকেও গান্ধী প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারেন, যেখানে শেলী ইংলণ্ডের শ্রমিকদের আহ্বান করেছেন বহুযুগের দাসত্ব শৃংখল ছিন্ন করতে :—

Stand ye calm and resolute,
Like a forest close and mute,
With folded arms and looks which are
Weapons of unvanquished war....

And if then the tyrants dare
Let them ride among you there,
Slash, and stab, and maim, and hew,—
What they like, that let them do.

With folded arms and steady eyes,
And little fear, and less surprise,
Look upon them as they slay
Till their rage has died away.

Then they will return with shame
To the place from which they came,
And the blood thus shed will speak
In hot blushes on their cheek···

And that slaughter to the nation
Shall steam up like inspiration,
Eloquent, oracular ;
A volcano heard afar
Rise like Lions after slumber
In unvanquishable number.

Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you
Ye are many—they are few.

অর্থাৎ :—

দাঁড়াও বীর শান্ত ধীর
বনস্পতি মনস্থির
বদ্ধবাহু দীপ্ত চোখ
অপরাজিত অস্ত্র হোক ।

সাহস থাকে অত্যাচারী
আসুক খুনী ঘোড়সওয়ারী
হত্যা করুক ছিন্ন করুক
দাঁড়িয়ে থাকো রক্ত ঝরুক।

বদ্ধ বাহু শান্ত আঁখ
অকুতোভয় দীপ্ত থাক,
তোমরা নিষ্কম্প চোখ—
জল্লাদের ফুরাক ক্রোধ।

তখন খুনী আপন ঘরে
ফিরবে দীন লজ্জাভরে
জল্লাদের রক্তভাল
খুনের লালে লজ্জালাল।…

জাতির খুন খুনখরাব
তুলবে বিপ্লবী আরাব
প্রেরণা দেবে কালোত্তীর্ণ
অগ্নিগিরি-মুখোদ্গীর্ণ।…

বীর কেশরী নিদ্রা টুটে
অপরাহত দাঁড়াও উঠে;
স্বপ্নে ছিলে বন্দী হেয়;
অগণ্য ও অপরাজেয়
তোমরা, ওরা মুষ্টিমেয়।

শেলীর এই কাল্পনিক বর্ণনা হুবহু বাস্তবে পরিণত হয়েছিল গান্ধীর জীবদ্দশাতেই, যখন তিনি লবণ আইন অমান্যের নায়ক, এবং তাঁর বয়স ষাট।

ভারতীয়রা ট্রান্সভাল অর্ডিন্যান্সটির নাম দিয়েছিল "কালা অর্ডিন্যান্স"। এই কালা অর্ডিন্যান্স যাতে আইনে পরিণত না হয় তার জন্য ভারতীয়রা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলছিল। সেনাপতি স্মাটস ঘোষণা করেছিলেন, "এশিয়ার ক্যান্সার" আফ্রিকা থেকে তিনি নির্মূল করবেন, এবং বুয়রদের নেতা বোথা বলেছিলেন, চার বছরের মধ্যে ভারতীয় কুলিদের সেদেশ থেকে বিতাড়িত করবেন। ভাবী সত্যাগ্রহীদের পক্ষ থেকে হাজী-হাবিব ট্রান্সভালের উপনিবেশ সচিব প্যাট্রিক ডানকান-এর সংগে দেখা করে ভারতীয়দের মনোভাব ব্যাখ্যা করলেন, এবং মেয়েদের কাছ থেকে আঙুলের ছাপ আদায় করার ধারাটিকে অসভ্য বলে অভিহিত করলো। অল্পদিনের মধ্যেই অর্ডিন্যান্সটি পাশ হল, শুধু মেয়েদের বেলায় আঙুলের ছাপের ধারাটি তুলে নেওয়া হল। কিন্তু তাতে আইনটির মূল গলদ কিছুই দূর হলনা, এবং ভারতীয়রা সংগ্রামের পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল রইলো। গান্ধী বৃটিশ সরকারকে বুঝাবার জন্য ছুটে ইংলণ্ডে গেলেন। গিয়ে তিনি বৃটিশ উপনিবেশ সচিবের সংগে দেখা করলেন এবং রাজার অনুমোদন যাতে এই বিলে না দেওয়া হয় সেজন্য তদ্বির করলেন। ১৯০৬ খৃঃ সত্যিই ইংলণ্ডেশ্বর অনুমোদন দিলেন না। কিন্তু এক বৎসর পর ১৯০৭ খৃঃ ট্রান্সভালে যখন সরাসরি বৃটিশ শাসনের অবসান হল, তখন আর এই অনুমোদনের প্রয়োজন থাকলো না। একদিনেই ট্রান্সভালে অর্ডিন্যান্সটি আইনে পরিণত হয়ে গেল। আইনের ধারা অনুসারে জুলাই মাসের মধ্যেই ভারতীয়দের নাম রেজিস্ট্রি করতে বলা হল। গান্ধী বুঝলেন এবার সংগ্রামের ক্ষণ আগত। তিনি "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ" বা 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' সমিতি নামে এক সমিতি গঠন করলেন : এই সমিতির নাম পরে পরিবর্তন করে রাখা হয় "সত্যাগ্রহ সমিতি"। ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের সদস্যরা চাঁদা তুলতে লাগলেন, সভ্য সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। যে অফিসে ভারতীয়দের নাম রেজিস্ট্রি করার কথা, পয়লা জুলাই সেই অফিস যখন খুললো

ব্যাজধারী স্বেচ্ছাসেবকরা আশপাশের পথগুলিতে পিকেট বসালেন এবং ভারতীয়দের বুঝিয়ে সুজিয়ে ঐ অফিসে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে লাগলেন। ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে তাঁরা পথের মোড়ে বক্তৃতা করলেন এবং লিফলেট বিলি করলেন। একটি সামান্য জোরজবরদস্তির ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু গান্ধী শোনা মাত্র নিজে এসে তা থামিয়ে দিলেন। পুলিশ কিছু কিছু পিকেটের উপর মারপিট করেছিল, আরও অনেককে পথ অবরোধ করার দায়ে অভিযুক্ত করেছিল। পুলিশ যাদের মেরেছিল তারা একজনও পুলিশের গায়ে হাত তোলেনি, কারণ সত্যাগ্রহীদের উপর কড়া নির্দেশ ছিল—আঘাত খাবে, প্রত্যাঘাত করবে না। এই ভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় সিভিল রাইটস বা নাগরিক অধিকারের আন্দোলন শুরু হল।

পরবর্তী ছ-সাত বৎসর এই আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালা হয়েছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল গান্ধীর "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকাটি। প্রকৃত পক্ষে এটিই ছিল আন্দোলনের মস্তিষ্ক। সত্যাগ্রহ জিনিষটি কি, তার ব্যাখ্যা আমরা পাই এই পত্রিকা থেকেই। গান্ধীজীর সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি এই "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" কাগজ দিয়েই। ভারতে ফিরে গিয়ে তিনি আরো বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন, "ইয়ং ইণ্ডিয়া" বা তরুণ ভারত, "নবজীবন", "হরিজন"। একাধারে রাজনৈতিক নেতা ও সম্পাদক বল্লে আমাদের অনেক নামই মনে আসে, গান্ধীজীর আগে ফিরোজ শা মেহতা, দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগংগাধর তিলক, গোখলে, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মতিলাল নেহরু সকলেই এই দ্বৈত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই সাংবাদিকতা ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিহার। গান্ধীজীও "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" কে ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু অন্য সব রাজনীতি ও রাজনৈতিক

নেতাদের সংগে গান্ধী-রাজনীতি ও গান্ধী-নেতৃত্বের যে-তফাৎ ছিল, গান্ধীর সাংবাদিকতার মধ্যেও সেই পার্থক্য প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর কাছে এই আন্দোলন ছিল শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আত্মিক বা নৈতিক উৎকর্ষেরও আন্দোলন। সত্য ও অহিংসা চর্চা হিসাবেই গান্ধীর সাংবাদিকতার চর্চা। গান্ধী নিজেই বলেছেন, পরবর্তী কালের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও "নবজীবন"-এর মতো, এ তাঁর প্রথম পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন"ও ছিল তাঁর অন্তর্জীবনেরই দর্পণ। তিনি প্রতি সপ্তাহে এই কাগজের মুদ্রিত পাতায় তাঁর নিজের আত্মাটি খুলে ধরতেন, তিনি সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝেন তা পাঠকদের বোঝাতেন। জেলে বন্দী থাকার সময় বাদ দিলে ১৯০৬ থেকে ১৯১৪, প্রায় দশ বৎসর, "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন"এর প্রত্যেক সংখ্যায় গান্ধী প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর নিজের উক্তি অনুযায়ী, বিচার বা ওজন না করে কখনো তিনি একটি শব্দও লেখেননি, সত্যের জন্য ছাড়া কাউকে খুশি করবার জন্য বা অতিরঞ্জন করে কখনো কিছু লেখেন নি। প্রত্যেকটি রচনা ছিল গান্ধীর নিজের আত্মসংযমের শিক্ষানবিশি। সংবাদ এবং সত্যবাদ তাঁর কাছে এক ছিল। সাংবাদিক মানে তিনি বুঝতেন লোকশিক্ষক। প্রথম প্রথম বিজ্ঞাপন নিলেও পরে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কারণ বিজ্ঞাপনের কাজ করলে সত্যের অনুশীলন ব্যাহত হয়। সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিকতা বা ধনলাভের জন্য সাংবাদিকতা তাঁর অভিপ্রেত ছিলনা। সাংবাদিকতার মুল লক্ষ্য সেবা ও সত্যনিষ্ঠা। গান্ধী পরবর্তীকালে "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে লিখেছিলেন (২রা জুলাই, ১৯২৫): "প্রতি সপ্তাহে বিষয় নির্বাচন ও ভাষা ব্যবহারে আমাকে কী পরিমাণ সংযম পালন করতে হয় তা পাঠকেরা ধারণা করতে পারবেন না। এতে আমার নিজের অনেক শিক্ষা হয়েছে ; আমি নিজের ভিতরের অনেক দুর্বলতা দেখতে পেরেছি। অহমিকা বশে কখনো চতুর শব্দ বা ক্রোধবশে কখনো বা তীব্র বিশেষণ প্রয়োগের লোভ হয়েছে। এইভাবে

কঠোর আত্মপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে, মালিন্য দূর করবার এ এক সুন্দর অনুশীলন"। বিষয় নির্বাচনের সতর্কতা ও শব্দ প্রয়োগে সংযম এ দুটি গান্ধী-সাংবাদিকতার মূল নীতি। আপাত-মনোরঞ্জক, নীতিবিগর্হিত বা অকল্যাণকর বিষয় বা ভাষা গান্ধী সর্বদা বর্জনীয় মনে করতেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, এই বিষয়ে আমরা নানা আলোচনা শুনে থাকি, কিন্তু সাংবাদিকের সততা বা সত্যাশ্রয়িতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শুনিনা। বরং মনে করি, উত্তেজনা না থাকলে বুঝি সংবাদই হয়না। যে-কাগজ যতো রং চড়িয়ে, তিলকে তাল করে, কখনো কখনো বা হাঁ কে না এবং না কে হাঁ করে মনোলোভী সংবাদ দিতে পারে সে কাগজ ততো জনপ্রিয়, তার বিক্রিও তত বেশি। যে-সম্পাদক কলমে আগুন ঝরাতে পারেন, দায়িত্বহীন অথচ জ্বালাময়ী ভাষায় আসর মাৎ করতে পারেন তিনি ততো বেশি নামকরা। তাছাড়া গোষ্ঠী, দল, মত বা বিজ্ঞাপন দাতার মুখচেয়ে সত্য গোপন ও মিথ্যা পরিবেশন তো আছেই। আজকাল মুনাফা, সস্তা জনপ্রিয়তা ও ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের বলি না হয়ে সাংবাদিকতা করা যে দুরূহ তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। জীবনের সব ক্ষেত্রেই গান্ধীর কাছে সত্য ও অহিংসার পরীক্ষা ক্ষেত্র। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাই। এখন "প্রোপ্রাইটর এডিটর" বা মালিক সম্পাদক-এর যুগ; তাই সম্পাদকীয় বা এডিটোরিয়াল প্রকৃতপক্ষে প্রপ্রাইটোরিয়াল বা মালিকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য বিকৃত ও প্রকৃত সত্যের মধ্যে এখন পার্থক্য বোঝা দুরূহ।

রেজিস্ট্রেশন-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন গান্ধী। নাগরিক অধিকার উদ্ধারের জন্য ভারতীয়দের অধিকাংশই নির্দিষ্ট তারিখের পরও রেজিস্ট্রেশন বয়কট কোরলো। সরকার প্রথমেই চূড়ান্ত আঘাত হানার পরিবর্তে, বেছে বেছে দু একজনকে জেলে পুরতে লাগলো। পরে গান্ধীও তাঁর শত শত অনুবর্তীকে আদালতে ডেকে নিয়ে কৈফিয়ৎ দাবী করা হল কেন তাদের নির্বাসিত করা

হবেনা। এরা কেউই কোনো কৈফিয়ৎ দিলেন না। তখন এদের উপর আদেশ হল ১৯০৮ খৃঃ ১০ই জানুয়ারির মধ্যেই তারা যেন আফ্রিকা ছেড়ে চলে যান। কিন্তু এরা গেলেন না। তাই ১০ই জানুয়ারি তারিখে এদের সবাইকে আবার আদালত প্রাংগনে জমায়েত হতে বলা হল। সকলেই স্বীকার কোরলেন যে তাঁরা আইন অমান্য করেছেন, এবং তাঁদের দু'থেকে তিন মাসের কারাদণ্ড হল। এই দণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদে অন্যান্য ভারতীয়রা কালো পতাকা সহ শোভাযাত্রা বের করলেন এবং পুলিশ শোভাযাত্রা তো ছত্রভংগ কোরলোই শোভাযাত্রীদের উপর বেতও চালালো।

এখানেই গান্ধীর জেলজীবনের হাতে খড়ি। এই সময় থাকা ও খাওয়ার যতোই অসুবিধা হোক নিরিবিলি বই পড়ার অখণ্ড অবসর পাওয়া গেল। বাইবেল, গীতা ও কোরাণ ছাড়াও, কার্লাইল, রাসৃকিন, টলস্টয়, বেকন ও হাক্সলির অনেকগুলি রচনা তিনি খুব মন দিয়ে পড়লেন। প্রথম প্রথম জেল জীবন নিরিবিলিই ছিল। কিন্তু অচিরেই আরো শত শত ভারতীয় বন্দীতে জেলখানা ভরে গেল। ট্রান্সভালের সর্বত্র তখন পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে ঘুরছে এবং চীনা নেতা লেউং কুইন, ভারতীয় ব্যবসায়ী থাম্বি নাইডু থেকে গরীব হকার পর্যন্ত কেউই রেহাই পাচ্ছে না। এই সময় ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন সংবাদপত্র "লীডার"-এর সম্পাদক আলবার্ট কার্টরাইট জেনারেল স্মাটস ও গান্ধীর মধ্যে একটা মিটমাট করতে এগিয়ে এলেন। ৩০শে জানুয়ারি পুলিশ হেফাজতে গান্ধী গেলেন স্মাটসের সংগে দেখা করতে। ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রেশনে রাজী হলে স্মাটস কালা কানুন তুলে নেবেন, বল্লেন। ফিরে এসে গান্ধী সহযোগীদের সংগে আলোচনা করলেন। সত্যাগ্রহের জয় হয়েছে এই সহজ বিশ্বাসে তিনি স্মাটসের প্রস্তাবে রাজী হতে চাইলেন। তিনি বুঝালেন, কালা কানুন প্রত্যাহৃত হবে এইটেই সবচেয়ে বড়ো কথা। কিন্তু সহযোগীদের অনেকেই এত সহজে

সরকারকে বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তাঁরা বল্লেন, আগে কালা কানুন প্রত্যাহার করা হোক, তারপর রেজিষ্ট্রেশন হবে। স্মাটস যে তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখবেন এমন নিশ্চয়তা কোথায় ? উত্তর দিতে গিয়ে গান্ধী সত্যাগ্রহের একটি নূতন সূত্র উপস্থিত করলেন—প্রতিপক্ষকে সর্বদাই বিশ্বাস করবে। এইবার একজন পাঠান উঠে দাঁড়িয়ে গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতীয়দের আঙ্গুলের ছাপ দিতে হবে, না সেটা রদ করা হবে ? গান্ধী বল্লেন, আঙ্গুলের ছাপ অপমানকর একথা তিনি আগে স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায়, এটাকে আর অসম্মানকর বলা চলেনা। এই কথা শুনে প্রশ্নকর্তা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। গান্ধীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লেন, আমরা শুনেছি আপনি পনর হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে জেনারেল স্মাটসের কাছে ভারতীয়দের স্বার্থ বিক্রি করে এসেছেন।" গান্ধী এই অভিযোগে বিচলিত হলেন না। সকলেই গান্ধীকে জানতো।

প্রশ্নকর্তার এই অভিযোগ কারো মনেই রেখাপাত কোরলো না। গান্ধী বল্লেন, তিনি নিজে আঙুলের ছাপ দিয়ে সর্বাগ্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি রেজিষ্ট্রেশন দপ্তরে যাবার আগে তাঁর নিজের অফিসে এলেন। তাঁরই একজন পুরোনো পাঠান মক্কেল মীর আলম অফিসের কাছেই অপেক্ষা করছিল। তাকে সেদিন কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। গান্ধী স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তারপর থাম্বি নাইডু, সত্যাগ্রহ সমিতির সভাপতি ঈসপ মিঞা প্রভৃতি অন্যান্য সহকর্মীদের সংগে মিলিত হয়ে রেজিষ্ট্রেশন দপ্তর অভিমুখে রওনা হলেন। দপ্তরের কাছাকাছি আসতেই আরো সাতজনকে সংগে নিয়ে মীর আলম তাঁদের কাছে এল এবং সক্রোধে জিজ্ঞাসা কোরলো—কোথায় যাচ্ছ ?" গান্ধী উত্তর দিলেন, "রেজিষ্ট্রেশন অফিসে, আঙুলের ছাপ দিতে।" এই কথা বলামাত্র মীর আলমের একজন সাথী একটি লাঠি দিয়ে গান্ধীর মাথায় মারাত্মক আঘাত কোরলো। "হা রাম!" এই বলে

তিনি রাস্তার ওপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অন্যান্য পাঠানরা এগিয়ে এসে গান্ধীর দেহে উপর্যুপরি আঘাত করতে লাগলো। থাম্বি নাইডু ও ঈসপ মিঞা বাধা দিতে গিয়ে নিজেরাও আহত হলেন। পুলিশ ছুটে এসে দুষ্কৃতকারীদের ছাড়িয়ে নিল এবং গান্ধীকে অচৈতন্য অবস্থায় সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হল। গান্ধীর বন্ধু জোসেফ ডোক এবং মিঃ পোলাকের কাছে খবর গেল, গান্ধীর ওপর আততায়ীরা আক্রমণ করেছে। ওঁরা সেখানে ছুটে গেলেন, এবং তখথুনি ডাক্তার ডাকা হল। গান্ধী জ্ঞান ফিরে পাবার পরই বল্লেন তাঁকে যেন সই করার ফরম দেওয়া হয়, ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম স্বাক্ষরদাতা হতে চান। কোনো সত্যাগ্রহীর উপর যদি কেউ হামলা করে তখন তিনি কী করবেন, এই প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। গান্ধীজী বাস্তবেই এর জবাব দিয়েছেন। তিনি বাধাও দেননি, নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টাও করেন নি। এমন কি পুলিশ যখন মীর আলমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের কোরলো তিনি তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে অস্বীকার করলেন। মীর আলমের সাজা হোক এ তিনি চাননি। পুত্র হরিলাল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কিন্তু বাবা, তোমাকে যখন মার দিল আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম আমার পক্ষে তখন কী করা উচিত হত?" গান্ধী উত্তর দিয়েছিলেন, "লড়াই করা," অর্থাৎ সত্যাগ্রহ মানে বিনা প্রতিবাদে অন্যায় মেনে নেওয়া নয়, নিষ্ক্রিয়তা তো নয়ই। "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় গান্ধী পরিষ্কার লিখেছিলেন, "যদি কাপুরুষতা ও হিংসা এই দুটি মাত্র বিকল্প থাকে, আমি বোলবো এ দু'য়ের মধ্যে হিংসাই ভালো।" (১১ই আগষ্ট ১৯২০) কিন্তু সত্যাগ্রহীর কাছে তৃতীয় আরো একটি বিকল্প থাকে, কারণ তাঁর মনে যেমন কাপুরুষতা নেই, তেম্নি হিংসাও নেই। তিনি প্রতিহিংসা দিয়ে হিংসার মোকাবিলা করেন না, করেন প্রীতি ও ভালবাসা দিয়ে। যার মন প্রস্তুত হয়নি, যিনি সত্যাগ্রহী নন, তারপক্ষে কাপুরুষতার চেয়ে সবল, সহিংস প্রতিরোধই ভালো।

অবিশ্বাস নয়, সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষকেও বিশ্বাস করবেন। গান্ধী স্মাটসের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন; তাঁর ধারণা ছিল অধিকাংশ ভারতীয় যখন নাম রেজিস্ট্রি করেছে তখন স্মাটস তাঁর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মতো কালা কানুনটি প্রত্যাহার করবেন। কিন্তু স্মাটস সে পথেই গেলেন না। আইন প্রত্যাহার করা হবে এমন প্রতিশ্রুতির কথা তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। বরং কিছু সুবিধাদানের বদলে আরো নানা রকম শর্ত আদায় করে নিতে চেষ্টা করলেন। গান্ধী ও স্মাটসের মধ্যে অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি চলল, কিন্তু কোনো ফল হলনা। গান্ধী কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে জোর প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলেন। বল্লেন, সত্যের শক্তি আরেকবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সভাসমিতি করা, "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" প্রত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা সমানেই চলতে লাগল। এই কাজে তিনি কয়েকজন য়ুরোপীয় অনুরক্তের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছিলেন। এঁরা হচ্ছেন, ডোক, ওয়েস্ট, পোলাক, কালেনবাক, কিচিন এবং মহিলা টাইপিস্ট সোনিয়া। পরবর্তী স্তরের আন্দোলনকে আরো বেশি সাহসী ও সক্রিয় করতে হবে, গান্ধী স্থির করলেন। যে ভারতীয়রা স্মাটসের কথার উপর আস্থা রেখে নাম রেজিস্ট্রি করেছিল তারা সবাই তাদের সার্টিফিকেট তাদের নেতাদের কাছে জমা রাখবে। ট্রান্সভাল সরকারের কাছে কালাকানুন প্রত্যাহারের জন্য চরমপত্র পাঠানো হবে, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কানুন প্রত্যাহৃত না হলে সব সার্টিফিকেটগুলি একসংগে পুড়িয়ে ফেলা হবে। যথাসময়ে চরম পত্র পাঠানো হল, এই পত্রের ভদ্র অথচ দৃঢ় ভাষা দেখে সাহেবরা ভয়ও পেল এবং ক্রুদ্ধও হল। ক্রুদ্ধ হল কারণ ভারতীয়রা সাহেবদের সমকক্ষ এমন ভাবে এই প্রথম কথা বল্ল। কুলিদের এই স্পর্ধায় শ্বেতাংগরা শংকিত হল, শ্বেত সভ্যতা বুঝি যায় যায়।

ওদিকে ১৯০৮ খৃঃ ১৬ই অগস্ট চরমপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে শত শত ভারতীয় জোহানসবার্গে একটি মুক্ত প্রান্তরে জমায়েত হলেন

পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্য। আয়োজনের মধ্যে একটু নাটকীয়তাও ছিল। সামনে বিরাট একটা কড়াই, হাজার দুই সার্টিফিকেট এবং একটিন প্যারাফিন। নাটকীয়তা ছিল সরকারী পক্ষেও। যখন সত্যাগ্রহীদের সভা শুরু হয়েছে তখন সভার মধ্যে সাইকেলে করে টেলিগ্রাম পিয়ন এল এক তারবার্তা নিয়ে, তাতে লেখা ছিল স্মাটস সরকার ভারতীয়দের চরমপত্র নাকচ করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এই টেলিগ্রাম ছিল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। গান্ধী খুব ধীর ভাবে বল্লেন, যাঁরা সার্টিফিকেট জমা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ যদি ইচ্ছা করেন এখনও তা ফিরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু একজনও এগিয়ে এল না। তারপর আরো নাটকীয় ও চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটলো যখন মীর আলম (গান্ধীর আততায়ী যে সবে কারাদণ্ড ভোগ করে ছাড়া পেয়েছে) সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে এল এবং গান্ধীর দুহাত জড়িয়ে ধরে তার নিজের পুরোনো পারমিটটি ওই দুহাজার নতুন সার্টিফিকেটের সংগে পুড়িয়ে ফেলতে অনুরোধ করল। যখন আগুন ধরানো হল নতুন ও পুরোনো সার্টিফিকেট একসংগে জ্বলতে থাকলো; এবং মীর আলম ও গান্ধী আলিংগনবদ্ধ হয়ে এক সংগে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। মীর আলমের হৃদয় পরিবর্তনে সত্যাগ্রহের প্রথম জয় সূচিত হল।

সরকারের হৃদয়হীনতার সংগে সংগে আন্দোলন ও বেড়েই চলল। ট্রান্সভালে স্থায়ী বসবাসকারী ভারতীয়দের উপর নির্যাতন চলছিল, এবার আরো একটা আইন পাশ হল। যে কোনো ভারতীয়দের ট্রান্সভালে প্রবেশের নিয়ন্ত্রণ জারী করা হল। ভারতীয়রা স্থির করলেন এই আইনও অমান্য করতে হবে। প্রথমে একজন—সোরাবজী—পরে আরো অনেকে, দলে দলে ট্রান্সভালের বাইরে গিয়ে আবার ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে লাগলেন। সরকার প্রথমে একটু হতবুদ্ধি হল, পরে হাজার হাজার আইন অমান্যকারীকে জেল দিল। তখন জেলে যাবার জন্য সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।

অনেকে চারবার পাঁচবার পর্যন্ত পরপর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করলেন। গান্ধীরও সশ্রম কারাদণ্ড হল। এই-সময় কয়েদী হিসাবে গান্ধীকে রোদের মধ্যে মাটি কাটতে হত, কাটতে কাটতে হাতে ফোস্কা পড়ে যেত এবং গান্ধী ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, কিন্তু মনের প্রফুল্লতা কখনো হারাতেন না। ছাড়া পাবার পর গান্ধীকে যখন আবার গ্রেপ্তার করা হয় তখন তাঁকে একটি নির্জন সেলে থাকতে হত এবং প্রথম প্রথম বই, বা পড়বার জন্য বাতি, কিছুই তাঁকে দেওয়া হয়নি। একদিন রাতে তাকে কয়েকজন দাগী নিগ্রো ও চীনা মারপিঠ-করা অপরাধীর সংগে থাকতে দেওয়া হল। পরে অবশ্য তিনি বই পড়ার অনুমতি পান, এমনকি স্মাটস্ নিজেও তাঁকে জেলখানায় বই পাঠিয়ে দিয়েছেন। টলস্টয়, এমার্সন, থোরো ও কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ এই সময় তিনি খুব বিশদভাবে পড়বার সুযোগ পান। থোরোর "আইন অমান্য" বা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স প্রবন্ধটির সারাংশ ১৯০৭ সালেই তিনি "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। এখন তিনি থোরোর অন্যান্য রচনাও পড়লেন। থোরো ও গান্ধীর দৃষ্টিভংগি ও অভিজ্ঞতার মধ্যে বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু অসাদৃশ্যও কম নেই। কারণ থোরো দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ব্যক্তিগত ভাবে সরকারকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে আইন অমান্য করেছিলেন, এবং থোরোর যদিও জেল হয়েছিল এবং তিনি জেলে গিয়েছিলেনও, কিন্তু থোরোর এক বন্ধু পকেট থেকে ট্যাক্স দিয়ে দিলে তিনি অচিরে ছাড়াও পেয়েছিলেন।

থোরোর কথাগুলি গান্ধীর মনের কথা। গান্ধী অবাক হলেন যে, অন্তত আরেকজন তাঁরই মতো চিন্তা করছে, এবং সেই ভাবনা কিছুটা জীবনে প্রতিফলিত করতেও চেয়েছে। গান্ধীর ভাবনা একটু স্বতন্ত্র এই কারণে যে তিনি চাইছিলেন এই চিন্তাভাবনাগুলি কী করে 'ম্যাস অ্যাকশন' বা গণ-আন্দোলনের কার্যক্রমের মধ্যে নিয়ে আসা যায়, বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্ক থেকে জনসাধারণের হাতে

তুলে দেওয়া যায়, তাদের আন্দোলন ও কাজের সংগে যুক্ত করা যায়। বিবেক শুধু ধ্যান বা জ্ঞানের বিষয় না থেকে যেন সর্বপ্রকার কর্মের বিষয় হয়, এটি থোরোর নয়, গান্ধীর নিজস্ব বৈপ্লবিক চিন্তা। থোরোর "সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স" প্রবন্ধ থেকে এখানে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি :—

"একজন নাগরিক কি কখনো, মুহূর্তের জন্যও, খুবই সামান্য আকারেও, আইনকারীর হাতে তার বিবেক বিসর্জন দেবে? তাহলে আর প্রত্যেক মানুষের বিবেক বলে একটা জিনিষ রয়েছে কেন? আমি মনে করি আমরা সর্বাগ্রে মানুষ এবং তারপর প্রজা। ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাই বাঞ্ছনীয়, আইনের প্রতি নয়। আমি যা ন্যায্য বলে মনে করি সর্বদা তাই করাই আমার একমাত্র কর্তব্য।"

"নীতিপরায়ণ মানুষের সংখ্যা যেখানে এক, নীতির সমর্থক ও প্রবক্তার সংখ্যা সেখানে ন-শো-নিরানব্বই।"

"আমি এই পৃথিবীতে এসেছি এই পৃথিবীকে সুন্দর কোরবো বলেই নয়, এসেছি সুন্দর হোক বা না হোক এখানে বসবাস কোরবো বলে। একজন মানুষ জীবনে সব কিছু করতে পারে না, সামান্য কিছু পারে; এবং যেহেতু তার পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব নয়, অতএব বেছে বেছে কিছু অন্যায়ই যে তাকে করতে হবে এমন কি কথা আছে?"

"আমি বেশ ভালো করে জানি যে যদি একহাজার একশো, বা মাত্র দশজনের নামও করতে পারতাম—মাত্র দশজন সৎলোকও—এমন কি মাত্র একজন সৎলোকও যদি এই ম্যাসাচুসেটস রাজ্যে ক্রীতদাসের মুক্তি দিয়ে ক্রীতদাস ব্যাপারে রাষ্ট্রের সংগে ভাগীদার হতে অস্বীকার কোরতো এবং এর ফলে সুদূর গ্রামাঞ্চলে জেলখানায় বন্দী থাকতো, তাহলে তাতেই আমেরিকা থেকে ক্রীতদাস প্রথা লোপ পেয়ে যেতো। কারণ আরম্ভটা আপাত দৃষ্টিতে সামান্য হয়

হোক তাতে ক্ষতি নেই। একবার যা ভালো করে করা হল তা চিরকালের জন্যই করা হয়ে গেল।"

"যে সরকার কাউকে অন্যায়ভাবে জেলখানায় আটক রাখে সে সরকারের অধীনে ন্যায়পরায়ণ লোকের উপযুক্ত স্থান জেলখানাই।"

"যদি হাজার লোক এবছর ট্যাক্স না দেয় তবে তা সহিংস রক্তক্ষয়ী কাজ হবে না, কিন্তু যদি দেয় তবে তাই হবে সহিংস রক্তক্ষয়ী কাজ; কারণ সেই ট্যাক্সের টাকায় রাষ্ট্র হিংসায় মত্ত হবে এবং নিরীহের রক্তপাত ঘটাবে।"

"যখন প্রজা আনুগত্য অস্বীকার করে এবং রাজকর্মচারী চাকরিতে ইস্তফা দেয় তখনই বিপ্লব ঘটে।"

"প্রকৃত জীবনযাপনের সুযোগ সেই অনুপাতেই হ্রাস পায় যে অনুপাতে তথাকথিত জীবনযাপনের উপায় বা উপকরণ বাড়ে। যখন মানুষ গরীব থেকে ধনী হয় তখন তার আত্মোৎকর্ষলাভের জন্য প্রকৃষ্টতম কাজ কী? সেই সব পরিকল্পনার রূপায়ণ গরীব অবস্থায় যেগুলিতে তার বিশেষ আগ্রহ ছিল।"

"আমি ছ-বছর কোনো ট্যাক্স দিইনি! এজন্য একবার আমার জেল হয়েছিল, একরাত্রির জন্য। কঠিন দু-তিন-ফুট পুরু পাথরের দেয়াল, একফুট কাঠ ও লোহার তৈরি দরজা এবং আলো-আটকানো লোহার জাল, এগুলি দেখে দেখে অবাক হচ্ছিলাম। অবাক হচ্ছিলাম রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের বোকামির কথা ভেবে। এই প্রতিষ্ঠান আমার প্রতি এমন ব্যবহার করছে যেন আমি শুধু রক্তমাংস-অস্থির একটি পিণ্ড যাকে গরাদে আটকে রাখা যায়। আমার অবাক লাগছিলো এই কথা ভেবে যে এই রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আমাকে শুধু আটকে রাখা ছাড়া আর কোনো রকম ভালো কাজে নিযুক্ত করা যায় না, এবং কখনো ভেবে দেখেনি কোনোভাবে আমার কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করা যায় কি না। আমি দেখলাম, আমার ও আমার শহরবাসীদের মধ্যে পাথরের

দেওয়াল রয়েছে বটে, কিন্তু তার চেয়ে আরো কঠিন একটি দেয়াল রয়েছে যা ভেঙে বা ডিঙিয়ে তবেই শহরবাসীরা আমার মতো স্বাধীন হতে পারে। আমি এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে বন্দী বলে অনুভব করিনি ; আমার মনে হচ্ছিল দেয়ালগুলি তুলে অকারণে কতকগুলি পাথর ও চূণশুরকি নষ্ট করা হয়েছে। (আমার জন্য এই সব এলাহি ব্যবস্থা দেখেই বরং) আমার বোধ হচ্ছিল যেন শহরবাসীদের মধ্যে একা আমিই ট্যাক্স দিয়েছি।"

"রাষ্ট্র সচেতনভাবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা নীতিবোধের মুখোমুখি হয় না, শুধু তার দেহ ও তার ইন্দ্রিয়ের সংগে রাষ্ট্রের মোকাবিলা। বুদ্ধি বা সততায় রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ নয়, তার শ্রেষ্ঠত্ব কায়িক বলে। (অবশ্য) বলের দ্বারা পরাভূত হবার লোক আমি নই। আমি আমার ইচ্ছামতো জীবন যাপন কোরবো। দেখা যাক (রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে) কে বেশি শক্তিমান, কোন্ শক্তির ভার বেশি। আমার উপর জোর খাটাতে পারে একমাত্র তারাই যারা আমার চেয়ে উচ্চতর নীতি অনুসরণ করে।"

"মানুষের অধিকারকে স্বীকার ও সংগঠিত করার দিকে কি আরো এক ধাপ এগোনো সম্ভব নয় ? প্রকৃত স্বাধীন ও সুসংস্কৃত রাষ্ট্র কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না যতোদিন না রাষ্ট্র ব্যক্তিকে স্বাধীন ও উচ্চতর শক্তি হিসাবে স্বীকার করে, স্বীকার করে যে ব্যক্তিই রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস, এবং তদনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যক্তির সংগে আচরণ করতে রাজী হয়।"

উপরের দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে থোরোর মানসিকতা আমরা বেশ উপলব্ধি করতে পারি, বুঝতে পারি কেন গান্ধী থোরোর প্রতি এতটা শ্রদ্ধাবান ছিলেন।. কিন্তু গান্ধীর ব্যক্তিত্ব থোরোর মতো অতটা ব্যক্তি-মুক্তিতেই আবদ্ধ ছিলনা, গণমুক্তির মধ্যেই গান্ধী ব্যক্তি-মুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এমার্সন থোরোর মানসিক ও চারিত্রিক সীমিতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, থোরো কোনো

জীবিকার্জনের কাজ শেখেন নি, কখনো কারো সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নি, একা জীবন কাটিয়েছেন; কখনো গীর্জায় যাননি; কখনো ভোট দেন নি; রাষ্ট্রকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করেছেন; তিনি মাংস খেতেন না, মদ খেতেন না, কখনো ধূমপান করতে শেখেন নি; এবং যদিও প্রকৃতির মধ্যেই বসবাস করেছেন, কখনো ফাঁদ পাতেন নি, বন্দুক ব্যবহার করেন নি। নৈশভোজের সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন্ খাবার তাঁর প্রিয়, থোরো জবাব দিয়েছিলেন, যেটি সবচেয়ে হাতের কাছে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অধিকাংশই নেতিবাচক দিক। তাঁর শেষদিকের রচনাবলী থেকে সরস অনুচ্ছেদগুলি তিনি ছাঁটাই করতে চাইতেন; তাঁর ধারণা হয়েছিল তাঁর রচনার নৈতিক গাম্ভীর্যের সংগে এগুলি বেমানান। থোরোর পক্ষে 'হাঁ' বলার চেয়ে 'না' বলাই ছিল সহজ, এই বৈশিষ্ট্য দিয়েই মানুষটিকে চেনা যায়। যে মানুষ 'না' বলতে গিয়ে একবারও নিজের উপর রাগ করে না তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি রয়েছে। একেবারে জন্ম থেকেই প্রতিবাদী, এমন এক সাংঘাতিক মানুষ তিনি, যার মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই। থোরো কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসী নন, বরং এক মহৎ ধরণের ভোগবিলাসী। তিনি নিজের ধারণা ও রুচি অনুযায়ী যতোটা পেরেছেন জীবন উপভোগ করেছেন, এবং কোনো বিষয়েই তাঁর খেদ ছিল না। সরলতা এবং স্বার্থপরতার এক আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। গান্ধী থোরোর এই স্বার্থপরতাকে নিজের জীবনে পরার্থপরতায় রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সরলতার দর্শনে উভয়েই ছিলেন একাত্ম। বলা যায়, থোরোর মতো গান্ধীরও তিনটি মূলনীতি হচ্ছে, 'সরলতা, সরলতা, সরলতা।' এজন্যই গান্ধী বলেছিলেন, "এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে থোরোর আইডিয়াগুলি ভারতবর্ষে আমার আন্দোলনের উপর যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করেছে।"

একই সময়ে রাসকিনের "আনটু দিস লাস্ট"-এর প্রভাবও গান্ধীর উপর কম পড়ে নি। অর্থনৈতিক সাম্য-অসাম্য এবং সমাজে

ধনবণ্টনের নীতি-দুর্নীতি নিয়ে গান্ধীও ভাবছিলেন। রাসকিনের রচনায় তিনি নিজের মতের সমর্থন দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলেন। রাসকিন লিখেছেন :—

"ধরেই নেওয়া হয় যে ব্যবসায়ীমাত্রেই নিছক স্বার্থান্বেষী। সমাজে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন খুবই আছে। কিন্তু ব্যবসায়ী যে ব্যবসা করে তার একমাত্র কারণ, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। তার একমাত্র তাগিদ ব্যক্তিগত মুনাফা। ব্যবসায়ীর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য নিজে কতোটা লাভ করতে পারে এবং অন্যের ভাগে কতোটা কম ফেলা যায়।"

"অর্থনীতিবিদরা স্পষ্টই বলেন, এটাই নাকি অর্থনীতির সর্বজনীন নিয়ম যে ক্রেতার কাজ জিনিষের দর কমানো এবং বিক্রেতার কাজ বেশি দর হেঁকে ক্রেতাকে ঠকানো। এমন নির্লজ্জ বক্তব্য মেনে নিলে যিনি ব্যবসায়ী তিনি সমাজে কী করে সম্মান দাবী করতে পারেন? ডাক্তার ডাক্তারিতে পয়সা পান, কিন্তু তার সংগে একটা কর্তব্যবোধও কাজ করে; বিচারক বিচারের জন্য বেতন পান, কিন্তু তার সংগে একটা কর্তব্যবোধও কাজ করে; শিক্ষকও বেতনভুক, কিন্তু বেতনের বাইরে অতিরিক্ত একটা কর্তব্যবোধও থাকে; এবং এরা প্রত্যেকেই প্রয়োজন হলে এই কর্তব্যবোধের জন্য আর্থিক লাভক্ষতি বিসর্জন দিয়ে ত্যাগস্বীকারও করতে পারেন। শুধু ব্যবসায়ীকেই এই কর্তব্যবোধ বা বিবেকের দায় থেকে রেহাই দেওয়া হয়। ব্যবসায়ীর বেলায় ধরেই নেওয়া হয় যে ব্যক্তিগত লাভক্ষতির হিসাব ছাড়া তার কোনো নীতি বা কর্তব্যবোধ নেই। তার এমন কোনো কর্তব্য নেই যার জন্য তিনি ক্ষতিস্বীকার করতে পারেন। অন্যান্য বৃত্তিধারীরা চরম ক্ষেত্রে কর্তব্যবোধে শহীদ হতে পারেন, চরম ত্যাগ এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করতে পারেন, কিন্তু ব্যবসায়ীর পক্ষে বীরত্ব দেখানো, ত্যাগস্বীকার করা বা শহীদ হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর যে মানুষ জানেনা কখন মৃত্যুবরণ করতে হবে সে বাঁচতেও জানে না।"

"শিল্পপতি যদি তাঁর নিজের ছেলেকে তাঁরই শিল্পে নিযুক্ত একজন সাধারণ শ্রমিক হিসাবে ভাবেন তাহলে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন শ্রমিকের প্রতি তাঁর আচরণ কি হওয়া উচিত। শিল্পকে একটি পরিবার এবং শিল্পপতিকে পরিবারের পিতা ও অভিভাবক মনে করে নিলে তাই হবে উচিত সম্পর্ক।"

"সম্পত্তির মালিক হলে কোনো লাভ হবে না যদি না শ্রমিকের উপর কর্তৃত্ব করার বা শ্রমিক খাটাবার শক্তি সেই মালিকের থাকে। ধরা যাক একজন লোকের বিপুল জমিজমা, প্রচুর সোনাদানা, অসংখ্য গরুবাছুর, বিরাট প্রাসাদ ও উদ্যান এবং অপর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী। কিন্তু মনে করো একজনও ভৃত্য বা শ্রমিক তার হাতে নেই। প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ যদি অপেক্ষাকৃত গরীব থাকে বা কারো যদি সোনাদানা বা খাদ্যশস্যের অভাব থাকে তবেই সে ভৃত্য পেতে পারে। ধরা যাক তেমন অভাবী কেউ নেই এবং কোনো ভৃত্য বা শ্রমিকই মিলছে না। তাহলে ঐ মালিককে নিজেই নিজের রুটি সেঁকতে হবে, নিজের কাপড় নিজেকেই বুনতে হবে, নিজের জমি নিজেকেই চাষ করতে হবে, এবং নিজের গরুবাছুরও নিজেকেই চরাতে হবে। তার বাগানের হলুদ পাথরগুলির চেয়ে তার জমানো সোনার তালের উপযোগিতা একরত্তিও বেশি হবে না। তার খাদ্যসামগ্রী পচে নষ্ট হবে, কারণ অত খাবার সে একা খেয়ে ফুরোতে পারবে না। অন্য যে কোনো মানুষ একা যতোটা খেতে বা পরতে পারে সে একা তার চেয়ে বেশি খেতে বা পরতে পারবে না। এমন কি ন্যূনতম আরাম বিরামের জন্যও তাকে রীতিমতো খাটতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে ; এবং শেষ পর্যন্ত প্রাসাদোপম বাড়ী সংস্কার করা বা জমি আবাদী রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। 'আমার' বাড়ী, 'আমার' বাগান, 'আমার' গরুবাছুর ধনসম্পত্তি, এই কথাগুলি তখন তার কাছে পরিহাসের মতো মনে হবে। এই ধরণের ধনসম্পত্তি উপরে-বর্ণিত শর্তে লাভ করতে কেউই উৎসাহী হবে না। বিত্তবানের বিত্ত আসলে অন্যকে

খাটাবার বা অন্যের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা। সহজ কথায়, আমাদের সুবিধার জন্য বা স্বার্থে ভৃত্য, কারিগর, শিল্পী প্রভৃতি নিয়োগ করার ক্ষমতা; বৃহত্তর অর্থে, জাতির বৃহৎ সংখ্যক লোককে বিভিন্ন দিকে চালিত করার ক্ষমতা। অবশ্য অর্থের এই শ্রমক্রয়ের ক্ষমতা বেশি বা কম হবে প্রতিবেশীদের মধ্যে দারিদ্র্যের এবং অনুরূপ বিত্তবানের সংখ্যার স্বল্পতা বা বহুতা অনুযায়ী।"

"নিজের ভোগের জন্য বেশি অর্থসঞ্চয়ই ধনী হবার পদ্ধতি নয়, সংগে সংগে এটিও দেখা যাতে প্রতিবেশীদের অর্থসঞ্চয় অনুপাতে কম হয়। সংক্ষেপে, আমাদের অনুকূলে এবং প্রতিবেশীদের প্রতিকূলে সবচেয়ে বেশি ধনসঞ্চয়ের অসাম্যই ধনী হবার কৌশল বা পদ্ধতি।

অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে গান্ধী নিজে শুধু খাঁটি হয়ে উঠছিলেন না, তাঁর উপলব্ধিও গভীর হচ্ছিল। টলস্টয়ের জীবনের সাধনা ও দ্বন্দ্ব তখন তিনি অনেক বেশি গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলেন। ১৯০৯ ও ১৯১০ খৃঃ টলস্টয়ের সংগে গান্ধীর কিছু পত্র বিনিময় হয়। টলস্টয় ট্রান্সভালের এই "হিন্দু"টিকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যে পৃথিবীতে যতো কাজ হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন গান্ধী। টলস্টয়ের অহিংসা ও প্রেমের বাণী গান্ধীকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল; যদিও টলস্টয়ের বিশ্ব-বিশ্রুত উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে গান্ধীর কোনোই উৎসাহ ছিল না।

১৯০৯ খৃঃ জুন মাসে গান্ধী আর একবার ইংলণ্ডে গেলেন, ভাবলেন শাসকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে কালাকানুন প্রত্যাহারে রাজী করাবেন। এই সময় জোসেফ ডোক গান্ধীর প্রথম জীবনী লেখেন। ডোক গান্ধীকে "দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় দেশপ্রেমিক" বলে অভিহিত করেন, দেখান যে গান্ধীর দৃষ্টিভংগি মূলত ধর্মীয়, যদিও তিনি একজন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাও বটে। এই সময় শুধু শাসকদের সংগেই নয়, গান্ধীর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল ভারতীয় বিপ্লবী অ্যানার্কিস্ট বা নৈরাজ্যবাদীদের সংগেও। এই বিপ্লবীরা ভারতের ভবিষ্যত রূপ

কী হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। এই সব আলোচনার মধ্য দিয়ে গান্ধীর নিজের রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা আরো স্পষ্ট হল এবং ইংলণ্ড থেকে ফিরবার সময় তিনি জাহাজে বসেই গুজরাতীতে একটি পুস্তিকা লিখলেন "হিন্দ স্বরাজ" বা "ভারতীয় হোম রুল"। বইটি লিখতে তাঁর লেগেছিল মাত্র দশ দিন। বইটি ছাপা হলে এক কপি তিনি টলস্টয়ের কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা তখনো গান্ধীর কাছে দূরের বস্তু, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যাই প্রধান।

সত্যাগ্রহ আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও আন্দোলনের গতিবেগ কখনো কখনো মন্থর হচ্ছিল। অবশ্য স্মাটস সরকারের আক্রমণের গতিও আগের তুলনায় শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার গ্রেপ্তারের বদলে সরকার বাছাই করে করে গ্রেপ্তার করছিল এবং সত্যাগ্রহীর সংখ্যা একশোর বেশি ছিল না। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক সত্যাগ্রহী ছিল সবচেয়ে পোড়-খাওয়া এবং দৃঢ়, ফলে ছাড়া পাবার পর ওরা বারবার আইন অমান্য করে জেলে যাচ্ছিলো। এবং এই সময় জেলের মধ্যে তারা একবার অনশনও করেছিলো। অনশন ধর্মঘট সেসময় খুবই নতুন জিনিষ। গান্ধী এই সব সত্যাগ্রহীর পরিবার-বর্গের সমস্যাটি গভীর ভাবে ভাবছিলেন। যারা বার বার জেল খাটে তাদের পক্ষে চাকরি করা বা তাদের জন্য চাকরি জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। মাঝে মাঝে ভাতা বা আর্থিক সাহায্য দিলেও এদের চলেনা, কারণ প্রায় সারা বৎসরই এরা বেকার। তাছাড়া গান্ধীর নির্দেশ মতো সত্যাগ্রহী সমিতি কখনো বিরাট ফাণ্ড মজুদ করেনি ; যত্র আয় তত্র ব্যয় এই হচ্ছে গান্ধী-নীতি। অতএব সত্যাগ্রহীদের অনুপস্থিতির সময় তাদের পরিবারবর্গ মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে এমন একটা আস্তানা দরকার হয়ে পড়লো। ফিনিক্স ফার্ম-এর অভিজ্ঞতা গান্ধীর কাজে লাগলো। জোহানসবার্গ থেকে একুশ মাইল দূরে ললি নামক জায়গায় কালেনবাকের এগার শ একর জমির উপর একটি

কৃষি ফার্ম ছিল। ১৯১০ সালের মে মাসে কালেনবাক সেটি সত্যাগ্রহীদের ব্যবহারের জন্য দান করলেন। পাহাড়ের নিচে বিরাট ফলের বাগান, তাছাড়া সুন্দর দুটি জলকূপ এবং একটি ফোয়ারা। এই দ্বিতীয় ফিনিক্সের নাম দিলেন গান্ধী "টলস্টয় ফার্ম"। টলস্টয় ফার্মে গান্ধী নিজের পরিবারকেও নিয়ে এলেন। ফিনিক্স ফার্মের মতো এখানেও আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতার উপর জোর দেওয়া হল। কাঠ ও টিন দিয়ে প্রায় সত্তর জন নরনারীর মাথা গুঁজবার জায়গা করা হল। কালেনবাক-এর নির্দেশনায় ছুতোর মিস্ত্রির কাজ শেখানোর বন্দোবস্ত হল। জামা শেলাইয়ের কাজ তো গান্ধী নিজেই করেছেন। ফিনিক্স ফার্ম-এর সংগে তফাত এই যে এখানে বালক বালিকার সংখ্যা অনেক বেশি, এবং এদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের প্রশ্নটিও জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানেই গান্ধীর প্রথম শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ভাবনার শুরু। পরবর্তীকালের বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির সূত্রপাত এখানেই ঘটেছিল। ইস্কুলের গতানুগতিক লেখাপড়ার বদলে চরিত্র-গঠনই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে তিনি মনে করতেন। ফলে টলস্টয় ফার্মে ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট বই খুব সামান্যই ছিল। বিদ্যার্থীরা খোলা মাঠে, ফলের বাগিচায় কাজ কোরতো। পড়া, লেখা ও অংককষার সংগে শেখানো হত ইতিহাস ও ভূগোল। গান্ধী নিজে ধর্মশিক্ষা দিতেন। কোনো বিশেষ একটি ধর্ম নয়। ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত পোষণ করতেন, সেকথা মনে রেখেই গান্ধী হিন্দু, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের সর্বজনগ্রাহ্য সার মর্মটি তুলে ধরতেন। মহাভারতের গল্প, সুইফটের "গালিভার্স ট্রাভেলস"-এর গল্প তাঁর প্রিয় ছিল। গান্ধীর স্কুলে ছেলে ও মেয়েরা এক সংগে পড়ত। তিনি স্ত্রী-পুরুষের কৃত্রিম বিভেদকে ক্ষতিকর মনে করতেন। কাজেই তারা যাতে প্রথম থেকেই মিলেমিশে পরস্পরের প্রতি সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে শেখে সেদিকে তিনি যত্নবান ছিলেন। ছেলে ও মেয়ে একসংগে পড়াশুনা কোরতো, কাজ কোরতো, স্নান কোরতো এবং

একই হলঘরে ঘুমোতো। টলস্টয় ফার্মের জীবনধারা ছিল সব দিক দিয়েই চমৎকার পরিচ্ছন্ন। শুধু ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নয়, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস নিয়েও সেসময় তিনি নানা নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। নিজে উপবাসের উপকারিতা পরীক্ষা করে দেখছিলেন। এই সময় তিনি দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং প্রায় পাঁচ বছর বলতে গেলে তিনি শুধু ফল খেয়েই ছিলেন।

১৯১২ খৃঃ গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় এলেন। তাঁর বেলায় অবশ্য রেলকর্তৃপক্ষ বর্ণবৈষম্য আইন প্রয়োগ করলেন না। এমন কি ভারতীয়রা যখন তাঁর সম্মানে রেলস্টেশন সজ্জিত কোরলো, কোনো বাধা দিলেন না। জোহানসবার্গে এই মাননীয় ভারতীয়ের সম্মানে কালেনবাক অভ্যর্থনা তোরণ তৈরি করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সাহেবরা এই কুলিরাজের বক্তৃতাও শুনলো। অবশেষে গোখলে প্রিটোরিয়ার শাসক বোথা ও স্মাটস-এর সংগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসলেন। আশ্বাস পেলেন যে, কালা কানুন প্রত্যাহৃত হবে এবং চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের যে তিন-পাউণ্ড করে ট্যাক্স দিতে হত তাও আর দিতে হবে না। গোখলে ভারতে ফিরে যাবার আগে গান্ধীকে বোঝালেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জয় সূচিত হয়েছে, এখন গান্ধীর প্রধান কর্মভূমি হবে স্বদেশ, ভারতবর্ষ। ভারতের রাজনীতি নিয়েও তাঁদের দুজনের মধ্যে অনেক আলোচনা হল। গোখলে ফিরে যাবার পর কালাকানুন অবশ্য বাতিল হল, কিন্তু তিন-পাউণ্ড ট্যাক্স বহালই রইলো। ১৯১৩ খৃঃ মার্চ মাসে শ্বেতাংগরা ভারতীয়দের উপর নূতন করে আক্রমণ শুরু কোরলো। একটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায় দিলেন যে হিন্দু, মুসলমান ও পার্শী বিবাহ প্রথা দক্ষিণ আফ্রিকা আইন অনুযায়ী অসিদ্ধ, অতএব ভারতীয় স্ত্রীদের দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনত বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা নেই; আইনের চোখে তারা পুরুষদের রক্ষিতা মাত্র এবং তাদের সন্তানরাও জারজ সন্তান।

কালাকানুন প্রত্যাহৃত হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলন স্বভাবতই স্তিমিত হয়ে আসছিল। কিন্তু নারীদের এই অকল্পনীয় অপমানে নিভু নিভু আগুন আবার দাবানলের মতো প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। এর আগে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় ভূমিকা খুব বড়ো ছিল না। কিন্তু এবার নারীদের ভূমিকা হল অগ্রণী। সহিংস আন্দোলনে নারী ও পুরুষ সমান অংশ গ্রহণ করতে পারে না। সেখানে দৈহিক শক্তিসামর্থ্যের প্রশ্ন থাকায় পুরুষের ভূমিকা প্রবল হয়। গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে এতে নারী ও পুরুষ সমান অংশীদার হতে পারে। শত শত ভারতীয় নারীকে কলমের এক খোঁচায় রক্ষিতা বলে ঘোষণা করার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার গোটা ভারতীয় সমাজে এক অভাবিতপূর্ব ভূমিকম্প ঘটে গেল। দলে দলে মহিলারা বেরিয়ে এলেন রাস্তায়, বধূরা পুত্রবধূরা; এতদিন ধনীগৃহে যাঁরা ছিলেন প্রায় অসূর্যম্পশ্যা তাঁরাও দৃঢ়পায়ে প্রতিবাদে নামলেন; পুলিশ গ্রেপ্তার করুক তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। গান্ধীর এক স্বপ্ন সফল হল, কস্তুরবাঈও সকলের সংগে পথে নামলেন, সত্যাগ্রহী আন্দোলনের সামিল হলেন। এবার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য গান্ধী স্মাটসকে পরিষ্কার জানালেন, অবিলম্বে তিন পাউণ্ড ট্যাক্স রদ করা হোক, নইলে শ্রমিকদেরও তিনি ধর্মঘটে নামতে আহ্বান করবেন। স্মাটস কোনো জবাব দিলেন না। তখন ট্রান্সভাল থেকে একদল সত্যাগ্রহী মহিলা সীমান্ত পার হয়ে নাটালের কয়লাখনি অঞ্চলে প্রবেশ কোরলো। সেখানে বহু ভারতীয় খনিশ্রমিক কাজ করতেন। মহিলাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রমিকরা কাজে বিরতি দিয়ে বেরিয়ে এলেন। এবার কর্তাদের টনক নড়ল। খনি মালিকরা শ্বেত শ্রমিকদের সমস্যা নিয়েই বিব্রত ছিলেন, এবার ভারতীয় শ্রমিকদের ধর্মঘটে একেবারে প্রমাদ গণলেন। কৃষ্ণাংগরা ধর্মঘট করতে পারে এ ধারণাই তাদের ছিল না। পুলিশ মহিলা সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ কোরলো। এর

ফলে ধর্মঘট বিভিন্ন খনি অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। শ্বেতাংগ মালিকরা স্থির কোরলো ধর্মঘটীদের বেত মারা হবে এবং কুলি লাইনের জল আলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। গান্ধী দমলেন না, শ্রমিকদের উপদেশ দিলেন, কুলি লাইনের বস্তি ছেড়ে বেরিয়ে এসো, এসো নতুন তীর্থযাত্রীরা আন্দোলনের নতুন তীর্থে। একজন ভারতীয় খৃষ্টানের তত্ত্বাবধানে প্রায় চার হাজার শ্রমিকের জন্য একটি ক্যাম্প খোলা হল। মুষ্টি ভিক্ষা করে চাল রুটি সংগ্রহ করা হল; তাই খেয়ে, খোলা আকাশের নিচে মাটিতে শুয়ে, তারা রাত কাটাতে লাগলেন। নারী ও কারখানার শ্রমিককে সংগঠিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামাতে পারার কৃতিত্ব গান্ধীর। এরপর নাটাল থেকে ফের ট্রান্সভালে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই গান্ধী-লংমার্চ বা দীর্ঘ-পদযাত্রার গন্তব্য হল টলস্টয় ফার্ম। হয় সীমান্তে পুলিশ সবাইকে গ্রেপ্তার করবে নইলে সত্যাগ্রহীরা টলস্টয় ফার্মে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করবেন। পুলিশের হামলা সত্ত্বেও দীর্ঘ পদযাত্রা অব্যাহত রইলো। পথে গান্ধীকে দু' দুবার গ্রেপ্তার করা হল এবং জামিনে ছেড়ে দেওয়া হল। এই পদযাত্রায় মিঃ পোলাকও সাথী ছিলেন। গান্ধীকে গ্রেপ্তার করলে সাময়িক ভাবে পোলাকই হবেন দলপতি, এই স্থির ছিল। গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন, তারপর পোলাক এবং তাঁর অনুবর্তীদেরও পুলিশ ছাড়লো না। শেষ পর্যন্ত তাঁরাও নাটালের জেলে এসে পৌঁছালেন। পোলাক, কালেনবাক ও গান্ধীর একসংগে বিচার হল। প্রত্যেকের জুটলো তিন মাসের কারাদণ্ড। জেল এবং জেলের সেলগুলি কয়েদীতে ভরে উঠলো। সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে পঞ্চাশ হাজার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ধর্মঘট কোরলো। চাবুক ও রাইফেলের ভয় দেখিয়েও তাদের কাজে যোগদান করানো গেল না।

ইংলণ্ডে ও ভারতে স্মাটসের এই দমননীতি কঠোরভাবে সমালোচিত হতে লাগলো এবং কোনো একটা মীমাংসায় পৌঁছাবার

জন্য বৃটিশ সরকার স্মাটসের ওপর চাপ দিতে লাগলেন। এর ফলে ১৮ই ডিসেম্বর গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হল। গান্ধী ডারবানের এক সভায় ভারতীয় পোষাকে খালি পায়ে এসে হাজির হলেন, বল্লেন সত্যাগ্রহীদের মধ্যে যাঁরা পুলিশের দমননীতির ফলে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার জন্য তিনি এইভাবে খালি পায়ে এসেছেন।

১৯১৪ খৃঃ জানুয়ারি মাসে গান্ধী চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হলেন। ঘোষণা করলেন, অবিলম্বে গণ অভিযান ও পদযাত্রা শুরু হবে। ঠিক এই সময় শ্বেতাংগ রেলশ্রমিকরা নিজেদের কয়েকটি অভিযোগ নিয়ে হঠাৎ ধর্মঘট করে বসলেন। সাধারণ রাজনীতি বা রণনীতির কৌশল বলে, শত্রু বা বিপক্ষের দুর্বলতম মুহূর্তেই তাকে আঘাত করবে। শ্বেতাংগ শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে। এই সংগে ভারতীয় শ্রমিক ও অধিবাসীরাও যদি ধর্মঘট করে বসে তবে সমস্ত প্রশাসনকে একদিনেই স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। কিন্তু গান্ধী মোটেই তা করলেন না। বরং তিনি তাঁর পূর্বঘোষিত গণআন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। বল্লেন, সত্যাগ্রহী বিপক্ষের সাময়িক অসুবিধার সুযোগ নেয়না, সে তার নিজের অহিংস শক্তিতেই বিপক্ষের মোকাবিলা করে। এই ঘোষণার ফলে গান্ধী-নেতৃত্বের নৈতিক দিকটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হল এবং ইংলণ্ডে, ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর অনুকূলে জনমত প্রবল হয়ে উঠলো। স্মাটস এবার সত্যিই আলোচনায় বসতে রাজী হলেন। ভারতীয়দের অভিযোগ সম্পর্কে সরকার একটি কমিশন গঠন করলেন। তিন পাউণ্ড ট্যাক্স বিলোপ, ভারতীয় বিবাহের আইনী স্বীকৃতি, ভারতীয়দের আসা যাওয়া থাকার উপর বিধিনিষেধের শিথিলীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থার সংশোধন, এইগুলিই ছিল ভারতীয়দের প্রধান দাবী।

স্মাটস এই দাবীগুলি সমস্তই মেনে নিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা য়ুনিয়ন সরকার ভারতীয়দের ক্লেশ লাঘব করবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে

একটি বিল আনলেন, এবং গান্ধী ও স্মাটস উভয়ে বিলের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে একমত হলেন। এই সফল চুক্তির স্মারক হিসাবে গান্ধী স্মাটসকে একজোড়া চটি উপহার দিলেন। এই চটিজোড়া তিনি জেলে বন্দী অবস্থায় নিজহাতে তৈরি করেছিলেন। স্মাটস প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে এই চটি পরতেন, এবং দীর্ঘকাল তা ব্যবহার করেছিলেন। গান্ধীর সত্তর বর্ষ পূর্তির সময় তিনি স্মৃতিবিজড়িত উপঢৌকন হিসাবে এটি আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়ে দেন। প্রশ্ন জাগে, স্মাটসের কি সত্যিই হৃদয়পরিবর্তন ঘটেছিল? দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা যে সুবিধাগুলি শেষ পর্যন্ত আদায় করলেন তা কি ট্রুথ ফোর্স বা সত্যের শক্তিতেই অর্জিত হল, না কি অন্য কিছুতে? অনেকের—বিশেষত ভারতীয়দের—মতে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সম্মানজনক মীমাংসা অহিংস সত্যাগ্রহেরই জয় সূচিত করে, যেন এটি "সত্যমেব জয়তে"রই নিদর্শন। অনেকে এই ব্যাখ্যা মানেন না। রাজনীতির দাবা-বোড়ের চালের হিসাবে তারা এই সব রাজনৈতিক শক্তিপরীক্ষার মূল্যায়ন করেন, অন্য কিছুতে নয়। হৃদয় পরিবর্তন, জয়পরাজয়, অথবা দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে আপোষ-মীমাংসা,: দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলীকে এর যে কোনো একটি হিসাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শ্বেতাংগ সমাজের কোনো মৌলিক হৃদয় বা দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটেছিল, এমন প্রমাণ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার সামাজিক বিন্যাসেও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তার কারণ শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল; দক্ষিণ আফ্রিকায় অভারতীয়দের সংগে নিয়ে গান্ধী কোনো আন্দোলন করেননি। দুয়েকজন চীনা বা ইংরেজ গান্ধীর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধায় এগিয়ে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি অন্যায় বা অবিচার যে ভারতীয়-অভারতীয় শ্বেত কৃষ্ণ নির্বিশেষে সব মানুষেরই অবমানকর, এই আদর্শের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। ভারতীয়দের চারপাশে ছিল নিগ্রোরা। নিপীড়িত নিগ্রোদের প্রতি তাঁর প্রীতি ও সহানুভূতি ছিল, কিন্তু তিনি কখনও তাঁর সত্যাশ্রয়ী

সংগ্রামে এই নিগ্রোদের সহযোদ্ধা বা সহগামী করেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যালঘু ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার এই সংগ্রামকে সংকীর্ণ এবং দ্বৈপায়ন আন্দোলন না বলে উপায় নেই। পরবর্তীকালে গান্ধীর মতো শ্রেষ্ঠ নেতা ও নেতৃত্বের অভাব যখনই ঘটেছে, তখনই ভারতীয়রা তাদের অর্জিত সুযোগগুলি হারিয়েছে। কিন্তু একথাও প্রমাণিত নয় যে এর বিপরীত সহিংস আন্দোলনের আহ্বান দিলে তাতে এর চেয়ে বেশি সুফল পাওয়া যেত। সেরকম আহ্বান আদৌ দেওয়া সম্ভব ছিল কিনা তাই সন্দেহ। উপায় এবং অন্বিষ্টের মধ্যে যাঁরা অন্বিষ্টকেই প্রধান মনে করেন এবং তার জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করতে রাজী তাঁরাও অর্জন বা অন্বিষ্টের বিচারেই গান্ধী অবলম্বিত উপায়কে স্বাগত জানাতে অন্তত এক্ষেত্রে বাধ্য হবেন। যা করা সম্ভব হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ঘটনা, তার পরিবর্তে অন্য কী হতে পারতো বা করা সম্ভব ছিল, তা নেহাতই কল্পনার বিষয়।

কিন্তু ১৮ই জুলাই (১৯১৪) যখন গান্ধী কালেনবাককে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিদায় নিলেন তখন তাঁর মনে এই বিশ্বাস ছিল যে স্মাটসের সত্যিই হৃদয় পরিবর্তন হয়েছে এবং স্থূল দৈহিক শক্তির উপর নৈতিক শক্তির বিজয় ঘটেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সরাসরি ভারতে না ফিরে ১৯১৪ খৃঃ ৪ঠা অগস্ট কস্তুরবাঈ ও কালেনবাককে সংগে নিয়ে গান্ধী ইংলণ্ডে পৌঁছালেন। গান্ধীর ইচ্ছা ছিল গোখলের সংগে সাক্ষাৎ করবেন, কিন্তু গোখলে তখন পারীতে। অবশ্য লণ্ডনের ভারতীয়রা হোটেল সিসিল-এ গান্ধীকে একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করেন; এই সম্বর্ধনায় মহম্মদ আলি জিন্নাও উপস্থিত ছিলেন।

ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের ব্যাপারে, এবং যুদ্ধে জয়পরাজয়ের প্রশ্নে, ভারতীয়দের মধ্যে দুটি দল ছিল, একদল পুরো বৃটিশের পক্ষে, আরেক দল সরাসরি বৃটিশের বিপক্ষে। যেমন বুঅর যুদ্ধে, তেমনি মহাযুদ্ধের সময়, গান্ধী বিরোধীপক্ষের সাময়িক অসুবিধাকে কাজে লাগাবার বিরোধী ছিলেন। তিনি "হোমরুল" বা ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ চান, কিন্তু ইংলণ্ডের বিপদের সময় সেই বিপদের সুযোগ নিতে রাজী নন। গান্ধী বুঅর যুদ্ধের মতো এই যুদ্ধেও ইংলণ্ডকে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। গান্ধীর সহযোগী মিঃ পোলাক দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রতিবাদ জানালেন যে যুদ্ধে সহায়তা করার অর্থ হিংসা সমর্থন করা, অহিংসা জলাঞ্জলি দেওয়া। গান্ধী অহিংস, কিন্তু প্যাসিফিস্টদের মতো শান্তিবাদী ছিলেন না। তিনি এবার যুদ্ধক্ষেত্রে একটি অ্যামবুলেন্স কোর পাঠাতে সচেষ্ট হলেন, এবং প্রায় আশি জন ভারতীয় তরুণ স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে এই দলটি গঠিত হল। এই সময় ইংলণ্ডে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সংগে গান্ধীর প্রথম পরিচয় ঘটে। শ্রীমতী নাইডু অ্যামবুলেন্স কোরটির জন্য জামাকাপড় সংগ্রহের ভার নিতে চাইলেন। কিন্তু গান্ধীকে সাময়িক ভাবে মাঝপথে সব কাজ থেকে অবসর নিতে হল, কারণ এই সময় তিনি প্লুরিসিতে আক্রান্ত হলেন। ডাক্তারের

নির্দেশে গান্ধী শীতের দেশ ইংলণ্ড ছেড়ে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন (১৯১৫, ৯ই জানুয়ারি)। যখন দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স ফার্ম থেকে গান্ধীর পুত্রেরা ভারতে ফিরে এল, তখন গান্ধীর চিন্তা হল কোথায় ছেলেদের রাখবেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তিনি মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজের কাছে এদের পাঠিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এণ্ড্রুজ ছিলেন ইংরেজ পাদ্রী, গোখলের পরামর্শে তিনি ভারতে এসেছিলেন ভারতীয়দের জাতীয় আন্দোলনে সহায়তা করতে। এই সময় এণ্ড্রুজ ছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সহচর। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীর ছেলেরা সরাসরি শান্তিনিকেতনে গিয়ে উঠলেন, এবং গান্ধীও কস্তুরবাঈকে সংগে নিয়ে মাসখানেক বাদে শান্তিনিকেতনে হাজির হলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন না। অল্পদিন পরেই তিনি ফিরে এলেন এবং গান্ধীর সংগে তাঁর দেখা হল। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়ে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন এবং গান্ধীও দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের নেতা হিসাবে কম খ্যাত হন নি। ভারতের এই দুই বিখ্যাত ব্যক্তি একসংগে মিলিত হলেন বাংলাদেশের নিভৃত রাঢ়পল্লী শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ তখন "বলাকা" কাব্য রচনা করছেন, কল্পনার হংসবলাকা ইতিমধ্যেই মুক্তির দিগন্তে তাঁকে আহ্বান করেছে। হয়তো ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির দৃশ্যপটটিও বলাকা কাব্যের মুক্ত আকাশপটের সংগে এক হয়ে গেছে। গান্ধীজীর সংগে আলোচনা কবির মনে কী রেখাপাত করেছিল আমরা জানিনা, আমরা জানি গান্ধীকে "মহাত্মা" বলে সম্বোধন করেছিলেন কবি এবং জানি "বলাকা" কাব্যের ৩৭ সংখ্যক কবিতায় তিনি সত্যাসত্যের সংগ্রামের অন্তিম ফল সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উচ্চারণ করেছিলেন :

> মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
> সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,

পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন।
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অমর মহিমা?

রবীন্দ্রনাথ "মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত সীমা" বলতে মনুষ্যত্বের আত্মিক উত্তরণের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। এই কবিতায় "রাত্রির তপস্যা"র মধ্যে কি গান্ধীর সত্যাগ্রহ সংগ্রামের উল্লেখই প্রচ্ছন্ন নেই?

গান্ধী শান্তিনিকেতনে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রমের সব কিছু পছন্দ করেন নি। আশ্রমিকদের রান্নার জন্য মাইনে-করা পাচক এবং থালা বাসন ধোয়ার জন্য মাইনে-করা লোক রয়েছে দেখে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হন। তিনি উপদেশ দিলেন, শিক্ষক ও বিদ্যার্থীদের উচিত নিজেদের মধ্যে ভাল করে তাদের রান্নাবান্না ও ধোয়া মোছার কাজের ভার নেওয়া। ছাত্রদের মনে এ প্রস্তাব সাড়া তুললো, কিন্তু শিক্ষকদের কেউ কেউ এই

আগন্তুক প্রস্তাবে সায় দিতে পারছিলেন না। কবি বল্লেন, গান্ধীজী যখন বলছেন আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যেই রয়েছে স্বরাজের চাবি কাঠি, তখন চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? যতদিন গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে ছিলেন ততদিন সত্যিই প্রস্তাব কার্যকরী ছিল, কিন্তু তিনি আশ্রম ত্যাগ করার সংগে সংগেই আবার পূর্বাবস্থা বহাল করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নূতন এক্সপেরিমেণ্টের জন্য আর পীড়াপীড়ি করেন নি। আশ্রম সম্বন্ধে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ধারণা এক ছিল না। মহাত্মা ও কবির মধ্যে দৃষ্টিভংগির যে পার্থক্য ছিল তা বুঝবার পক্ষে এই ঘটনাটি আমাদের সহায়ক।

গান্ধী শান্তিনিকেতন দর্শনের সময়ই তাঁর গুরুপ্রতিম গোখলের মৃত্যু হয়। গোখলেই গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে গিয়ে ভারতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, গান্ধী যেন এক বছর সারা ভারত ভ্রমণ করেন এবং দেশের মানুষকে নিবিড় ভাবে জানা ও বোঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই এক বছর তিনি থাকবেন শুধু দর্শক ও শ্রোতা, নিজে মুখ খুলবেন না, বক্তৃতা বা বিবৃতি দেবেন না। কিন্তু গান্ধী এই নির্দেশ পুরোপুরি পালন করতে পারেন নি। ১৯১৫ খৃঃ এপ্রিল মাসে কুম্ভমেলার সময় গান্ধী হরিদ্বারে ছিলেন। এই সময় প্রায় দশ লক্ষ স্নানার্থী সেখানে জমায়েত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা-সেবকরা এখানে সেবা কার্যে নিযুক্ত হন। ফিনিক্স ফার্মের প্রাক্তন সহকর্মীদের নিয়ে গান্ধীও সেবাকার্যে আসেন। কিন্তু মহাত্মার নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় লোকে সেবা গ্রহণ করার চেয়ে মহাত্মার দর্শনের জন্যই বেশি ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

গান্ধী গোখলের কথামতো ভারতবর্ষের নানা জায়গায় পরিভ্রমণ করেন। গান্ধী যেখানেই যেতেন দক্ষিণ আফ্রিকার বীরকে দেখতে সেখানেই ভীড় হত এবং অধিকাংশ লোকই তাঁকে দেখে হতাশ হত। তারা আশা কোরতো গান্ধী হবেন মহাকাব্যের মহানায়ক সদৃশ

"শালপ্রাংশু মহাভুজ" বিরাট এক পুরুষ। কিন্তু দেখতে সাধারণ ছোটখাট মানুষটি, মাথায় পাগড়ি, কণ্ঠে পৌরুষের বালাই নেই ; তাঁকে দেখে অধিকাংশ লোকই হতাশ হত। গান্ধী যখন আমেদাবাদে এলেন, তখন একটি ক্লাবে ব্যারিস্টার বল্লভভাই প্যাটেল প্রথম গান্ধীকে দেখেন। বল্লভভাই প্যাটেল তখন ব্রীজ খেলছিলেন, এক পলক দক্ষিণ আফ্রিকার "নায়ক"কে দেখে নিয়েই আবার তিনি খেলায় মনোনিবেশ করেন ; বলা বাহুল্য, প্রথম দর্শনে গান্ধীকে দেখে তাঁর মনে একটুও শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রমের উদয় হয়নি।

শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত "ইণ্ডিয়ান হোমরুল লীগ" গঠন করলেন। এই নিছক রাজনৈতিক "হোমরুল" কিন্তু গান্ধীর মনকে স্পর্শ কোরলো না। গান্ধী এর আগেই হোমরুল বিষয়ে গুজরাতীতে একটি বই লিখেছিলেন। ১৯০৮ খৃঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গান্ধী লণ্ডনে ভারতীয় অ্যানার্কিস্ট বা নৈরাজ্যবাদীদের সংস্পর্শে আসেন, এই সময় তাঁর নিজের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে ভারতের মুক্তির জন্য সহিংস বিপ্লবের পথ একেবারেই অনুপযুক্ত। ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ বিবেচনা করে তাঁর মনে হয় যে আত্মরক্ষার জন্য ভারতবর্ষকে নিজস্ব উন্নততর "হোমরুল" উদ্ভাবন করতে হবে। গান্ধীর এই বইটির পুরো নাম "হিন্দ স্বরাজ" অথবা ভারতীয় হোমরুল। এই বইটি তখন ভারতে ও ইংলণ্ডে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বোম্বাই সরকার বোম্বাইতে বইটির প্রচার নিষিদ্ধ করেন। গান্ধী তখন গুজরাতী সংস্করণের পরিবর্তে এর একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন। হিংসার পরিবর্তে আত্মোৎসর্গ, ঘৃণার পরিবর্তে প্রেম, পশুশক্তির পরিবর্তে আত্মশক্তি, এই হচ্ছে গান্ধীর মূল বক্তব্য। এই বইটি তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ও তীব্র আক্রমণ। এটি একটি দূর লক্ষ্য। আশু লক্ষ্য হিসাবে গান্ধী অবশ্য পার্লামেণ্টরাজনীতিও করেছেন, কিন্তু তখনও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণায় এই লক্ষ্যের কথা ভোলেন নি।

এই বইতে গান্ধী বলেন, রেলওয়ে হাসপাতাল, আইন আদালত, মেশিন, এগুলিকে সভ্যতার বিরাট পদক্ষেপ মনে করা ভুল; এগুলি প্রয়োজনীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে অশুভ। ব্যক্তির বা জাতির নৈতিক চরিত্র বা মহত্বের নিরূপণ এগুলি দিয়ে হয় না। "হিন্দ স্বরাজ" বইতে গান্ধী তাঁর মনোমত সিদ্ধান্তে পৌঁছানর জন্য অনেক ক্ষেত্রে অতি-সরলীকৃত যুক্তি উপস্থিত করেছেন। বিংশ শতকের শেষার্ধে তাঁর এই দৃষ্টিভংগি গ্রাহ্য হওয়া খুবই শক্ত। পাশ-করা চিকিৎসকের চেয়ে হাতুড়ে বৈদ্য ভালো, তিনি যখন একথা বলেন তখন তা আশ্চর্য লাগে। অবশ্য গান্ধী পেশাদারী চিকিৎসাকেই অনিষ্টকর বলেছেন। কিন্তু বলার ঝোঁকে নিজেই অন্ধ সংস্কারে চালিত হয়ে অতিশয়োক্তি করেছেন। নইলে তিনি যেভাবে চিকিৎসকদের বাতিল করে দিয়েছেন তা শুধু অবিশ্বাস্য নয়, মনে হবে চূড়ান্ত গোঁড়ামি বা ছেলেমানুষি। তাঁর মতামত সকলের গ্রাহ্য হবে এটি তিনিও আশা করতেন না। কারণ "হিন্দ স্বরাজ" বইতে তিনি বলেছেন, কেবলমাত্র আমি যা ভাবছি তাই সঠিক এবং ভালো, আর অপর কেউ যা ভাবছে তাই ভুল এবং খারাপ, এরকম চিন্তা করা একটি বদভ্যাস। আমার সংগে কারো মতের মিল না হলেই যে সে দেশের শত্রু, এরকম চিন্তাও তাই। গান্ধীর যুগে এবং গান্ধী-পরবর্তী যুগে রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীর এই কথাটি যদি সব রাজনৈতিক কর্মীরা ভেবে দেখতেন তাহলে বোধ হয় অন্ধ কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে সকলে এত শক্তিক্ষয় করতেন না। গান্ধী লিখেছিলেন, সব ইংরেজই খারাপ এরকম মত আমি কখনই পোষণ করতে পারিনা। তবে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক কাঠামো ভারতবর্ষে আমদানি করার নাম "স্বরাজ" নয়। কার্লাইলের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি পার্লামেন্টকে "talking shop of the world" বা "সারা দুনিয়ার বকবকানির বিপণি" আখ্যা দেন। পার্লামেন্টকে শাসক পার্টির স্বার্থ বা সুবিধা মতো পরিচালনা করা হয়, জণগনের স্বার্থে নয়। ইংলণ্ডে সংবাদপত্র পাঠকদের অর্থাৎ ভোট-

দাতাদের কাছে বেদতুল্য। সংবাদপত্র পার্টিবিশেষের স্বার্থে ভোট-দাতাদের বিপথেও চালিত করে। এর জন্য যে ইংরেজ জাতি বিশেষ-ভাবে দায়ী তা নয়, এর জন্য দায়ী আধুনিক সভ্যতা। আধুনিক সভ্যতা নীতি বা ধর্মের ধার ধারে না। পূর্বে লোকে প্রাকৃতিক পরিবেশে খেটে খেত, এখন জীবন বিপন্ন করেও বিপজ্জনক অবস্থায় শ্রমিকরা কাজ করছে শুধু লক্ষপতিদের লাভ বাড়াবার জন্য। আগে লোককে জোর করে ধরেবেঁধে ক্রীতদাস করা হত; এখন টাকার প্রলোভন দেখিয়ে এবং টাকার বিনিময়ে যে সব বিলাসব্যসন কিনতে পাওয়া যায় তার লোভ দেখিয়ে মানুষকে ক্রীতদাস করা হচ্ছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করেছে এই উক্তির জবাবে গান্ধী বলেন, ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করে নি; আমরাই ভারতবর্ষকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। ইংরেজরা শক্তিমান বলেই ভারতে আছে তা নয়, আমরা তাদের থাকতে দিচ্ছি বলেই তারা আছে। অস্ত্রের জোরে ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করেছিল, বা অস্ত্রের জোরেই দখল করে আছে, একথা ঠিক নয়; ভারতবর্ষ দখল করবার জন্য বা ভারতবর্ষকে বশে রাখবার জন্য অস্ত্র কিছুই করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এক জন্মদিনে ভাষণ দিতে গিয়ে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন; "এতকাল আমাদের নিঃসাহসের উপরে দুর্গ বেঁধে বিদেশী বণিকরাজ সাম্রাজ্যিকতার ব্যবসা চালিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত ভালো করে দাঁড়াবার জায়গা পেতনা যদি আমাদের দুর্বলতা তাকে আশ্রয় না দিত। পরাভবের সবচেয়ে বড়ো উপাদান আমরা নিজের ভিতর জুগিয়েছি। এই আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি।" ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে গান্ধী বলেছেন, ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আছে তাই বলে ভারতবর্ষ একাধিক জাতিতে পরিণত হয়নি। এক হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ধর্ম থাকতে পারে বা আছে। কিন্তু যারা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ তাদের কাছে ধর্মের পার্থক্যে জাতীয়তাবোধের কোনো ক্ষতি হয় না। হিন্দুরা

যদি মনে করে, ভারতে শুধু হিন্দুরাই থাকবে তবে তারা আজগুবি স্বপ্ন দেখছে। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, যারাই ভারতবর্ষকে আপন দেশ করে নিয়েছে তারা সকলেই দেশবাসী, একদেশের লোক, এবং তাদের সকলকেই একসাথে মিলেমিশে থাকতে হবে, নিজেদের স্বার্থেই তা করতে হবে। পৃথিবীতে কোথাও এক ধর্ম এবং এক জাতি সমার্থক নয়; ভারতেও কোনোদিন তা ছিল না।

প্রকৃত সভ্যতা কি? এই প্রশ্নের জবাবে গান্ধী বলেছেন কর্তব্য বা নৈতিক দায়িত্ব পালনে উদ্দিষ্ট আচরণকেই সভ্যতা বলে। যিনি নীতিভ্রষ্ট নন তাঁর পক্ষেই সম্ভব মনকে সংযত করা এবং হৃদয়াবেগকে বশে রাখা। চরিত্রবান ব্যক্তিকেই প্রকৃত সভ্য বা সংস্কৃতিবান পুরুষ বলা যায়। ভারতীয় সভ্যতা চিরকালই নীতির উপর জোর দিয়ে এসেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা তা করেনি। অতএব একজন ভারতীয়ের পক্ষে বাইরে থেকে সভ্যতা ধার করবার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রাচীন ভারতীয়রা জেনেছিলেন যে সুখ জিনিষটা অনেকটাই মানসিক। মানুষ ধনী হলেই সুখী হয়না, বা গরীব হলেই দুঃখী হয়না। বেশ কিছু লোক চিরদিনই অন্যের তুলনায় গরীর থাকবে। তাই প্রাচীন ভারতায়রা অতিরিক্ত বিলাসব্যসনকে সর্বদাই নিন্দা করেছেন। বড় বড় শহর দুর্নীতির বাসা, কাজেই তাঁরা গ্রাম্য-জীবনের শুচিতার উপরই জোর দিয়েছেন। রাজা এবং রাজার অস্ত্রশস্ত্রকে ন্যায়নীতির চেয়ে কখনো বেশি শক্তিশালী মনে করা হয়নি। রাজারা ঋষিদের পদতলে বসতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষেও আইন, আদালত, চিকিৎসা সবই ছিল, কিন্তু জনসাধারণের সেবাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য, অর্থ-উপার্জনের বা মুনাফার উপায় হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হত না। সাধারণ মানুষ স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন কোরতো এবং কৃষিকার্যে সন্তুষ্ট থাকতো। প্রকৃত "হোমরুল" তারাই ভোগ কোরতো। গান্ধীর মতে "এই অভিশপ্ত আধুনিক সভ্যতা" যেখানে এখনো পৌছায়নি সেই দুরান্তস্থিত গ্রামগুলি এখনো প্রকৃত পক্ষে

ইংরেজমুক্ত অঞ্চল। এই গ্রামাঞ্চলগুলিতে আধুনিক সভ্যতা প্রবাহিত করবার জন্য যারা ব্যস্ত তারা প্রকৃতপক্ষে দেশদ্রোহী এবং নীতিভ্রষ্ট। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, বাল বৈধব্য, দেবদাসী প্রথা প্রভৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে গান্ধী লিখেছেন, এগুলি নিশ্চয়ই ভারতীয় সভ্যতার আসল চিহ্ন বা গৌরব নয়, এগুলি হচ্ছে সভ্যতার বিচ্যুতি। এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য চিরকালই সংগ্রাম হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও হবে। ভারতীয় সভ্যতার প্রবক্তারা যার উপর বিশেষ জোর দিতে চান তা হচ্ছে এর নৈতিক দৃষ্টিভংগি। এবং এখানেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগে সনাতন ভারতীয় সভ্যতার মূল প্রভেদ। ভারতীয় সভ্যতা বা সংস্কৃতি যদি এতই উচ্চস্তরের হয়ে থাকে তবে ভারতবর্ষ পরাধীন হল কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী বলেন, ভারতের সভ্যতা যে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা এবিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় নেই। তবে সব সভ্যতার উপর দিয়েই ঝড় ঝাপটা গিয়েছে। যখন আমরা উপযুক্তভাবে আমাদের আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তুলতে ব্যর্থ হই, তখনই আমাদের সভ্যতা ভেঙে পড়ে। ভারতবর্ষের সভ্যতা এত আক্রমণেও ভেঙে পড়েনি, এ থেকেই বোঝা যায় এই সভ্যতার উৎকর্ষ কতোটা। অন্য কোনো দেশের সংগে ভারতবর্ষের তুলনা হয়না, অন্য দেশের ইতিহাসের নজির তুলে এখানকার ইতিকর্তব্য স্থির করার চেষ্টা অবান্তর। ইংরেজরা ভারতে এসেছে, তারা এখানে থাকলেও ক্ষতি নেই। ভারতের সংগে মিশে তারা প্রকৃত ভারতীয় হয়ে যেতে পারে। ইংরেজদের ঘৃণা করার পরিবর্তে আমাদের ঘৃণা করা উচিত তাদের সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতা। আরো একটু ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, দেশপ্রেম বলতে আমি বুঝি দেশের সমস্ত জনগণের কল্যাণ। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি নিশ্চয়ই প্রজাদের উপর দেশীয় রাজাদের পীড়নকেও বাধা দিতাম যেমন আমি বাধা দিতে চাই বৃটিশ রাজের পীড়নকে। পক্ষান্তরে যদি ইংরেজদের কাছ থেকে প্রজার প্রকৃত কল্যাণ ঘটতো আমি তাদের স্বাগত করতাম।

ইংরেজ হত্যা করে ভারতের মুক্তি নয়, নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েই আমরা ভারত উদ্ধার করতে পারি। অপরকে হত্যা করার কথা চিন্তা করা দুর্বলতারই লক্ষণ। এই ভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে যে ক্ষমতা আসে তা কখনোই কল্যাণকর হয় না। হতে পারে সন্ত্রাসবাদে ভীত হয়ে ইংরেজরা মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ধুয়ো তুলেছে। কিন্তু ভয়ে পড়ে যে সুযোগ তারা দিচ্ছে ভয় দূর হলেই আবার তা কেড়ে নিতে পারবে। আমাদের অভিষ্টে পৌঁছাবার জন্য হিংসা বা বল প্রয়োগ বা যে কোনো উপায় নিতে দোষ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী বলেন, উপায় এবং অভিষ্টের মধ্যে কোনো যোগ নেই এ ধারণা মস্তবড়ো ভ্রান্তি। ধার্মিক বলে পূজিত এমন লোকও এই ভ্রান্তিবশে বহু অপরাধ ও গর্হিত কাজ করেছেন। গান্ধী শাসকদের বিরুদ্ধে যে শক্তি প্রয়োগ করতে চান তা হচ্ছে প্রেমশক্তি, সত্যশক্তি বা আত্মশক্তি, সাধারণ ভাষায় যাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় অহিংস প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ। এই শক্তির ধ্বংস নেই, পরাজয় নেই। এর সামনে অস্ত্রের শক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যাঁরা বলেন, ইতিহাসে এই শক্তির কোনো নজির নেই, গান্ধী তাঁদের জবাবে বলেন, একথা ঠিক নয়। এই শক্তি সর্বদাই বিরাজিত, প্রেমশক্তি বা সত্যশক্তি না থাকলে সমাজ বা সভ্যতার অস্তিত্বই থাকতো না। ইতিহাসে এই স্বাভাবিক শক্তির পরিবর্তে এর বিপরীত শক্তির প্রকাশগুলিই লিখিত হয়। এই জন্যই ইতিহাস শুধু পশুশক্তির পরাক্রমেরই ইতিহাস বলে মনে হয়। অবশ্য একথা ঠিক, সার্বিক কল্যাণের জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে প্রেম বা সত্যশক্তির প্রয়োগ ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। আকস্মিক ছোটখাট দুএকটা ঘটনা ঘটে গেলেও সুচিন্তিত ভাবে প্রস্তুত হয়ে সমাজে বা রাষ্ট্রে এরকম বড় ঘটনা ঘটবার দৃষ্টান্ত খুব একটা দেখিনা। অহিংস সত্যাগ্রহ হল একটি নূতন পদ্ধতি; ন্যায্য অধিকার অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত দুঃখ বা নির্যাতন বরণের পদ্ধতি। এটি সশস্ত্র প্রতিরোধের একেবারে বিপরীত পন্থা। আমার বিবেকের কাছে যা অগ্রাহ্য তা

করতে আমি যদি অস্বীকার করি, তবে বলা যায় আমি আত্মশক্তি বা সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করছি। সরকার এমন একটি আইন পাশ করলেন যেটি আমার কাছে, আমার বিবেকের কাছে, সম্পূর্ণ অন্যায় ও নীতি-বহির্ভূত মনে হল, আমি এই আইন নাকচ করতে সরকারকে বাধ্য করবার জন্য সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি অর্থাৎ বলপ্রয়োগের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি। কিন্তু তা না করে আমি যদি শুধু আইনটি অমান্য করবার জন্যেই প্রকাশ্যে অমান্য করি এবং এই আইন ভংগের জন্য সানন্দে শাস্তি ভোগ করি তাহলে বলা যায় আমি আত্মশক্তি প্রয়োগ করছি, সত্যাগ্রহ করছি। অপরকে ধ্বংস করার চেয়ে আত্মোৎসর্গ করা অনেকগুণে শ্রেয়। যদি ভুলবশত অর্থাৎ বুঝবার ভুলে কখনো এই দ্বিতীয় নীতিটি প্রযুক্ত হয়, তাহলেও সত্যাগ্রহী নিজে ছাড়া অন্য কারো উপর পীড়ন করলেন না অন্তত এটুকু বলা যায়। ভুল বুঝে হিংসা করার চেয়ে ভুল বুঝে অহিংসা করায় বিপদ ও ক্ষতি কম। কেউ জোর করে বলতে পারে না যে তার নিজের সিদ্ধান্তই ঠিক, তার কাছে খারাপ মনে হচ্ছে বলেই একটা জিনিষ খারাপ নাও হতে পারে। যতক্ষণ তার মনে হচ্ছে কোনও একটা কাজ গর্হিত বা অন্যায় ততক্ষণ সে সেই কাজ থেকে বিরত থাকবে, তাতে ফলভোগ যাই হোক না কেন; এরই নাম সত্যাগ্রহ। মেজরিটি মানতে হবে, ভাল হোক মন্দ হোক আইন হচ্ছে আইন এবং তা মানতেই হবে, এ ধারণা নেহাতই সেকেলে। সত্যাগ্রহীর কাছে ব্যক্তি-বিবেকের চেয়ে বড়ো বিচার আর নেই। সার্থক সত্যাগ্রহী তিনিই যিনি নিজে বিবেকী ও সৎ, যিনি প্রতিপক্ষের প্রতি মনে কোনো বিদ্বেষ পোষণ করেন না। সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে, যিনি সত্যাগ্রহ করছেন এবং যার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা হচ্ছে উভয়েই লাভবান হন। সত্যাগ্রহী পশুশক্তি বা পশুপ্রবৃত্তির দাস হবেন না। সত্যাগ্রহীর মন উন্নত ধরণের হওয়া চাই। সত্যাগ্রহীর মনে কোনো ধনাসক্তি থাকবে না। তিনি নির্ধন না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর মনে অবশ্যই ধন-বৈরাগ্য থাকবে, এবং সত্যাগ্রহের জন্য

তাঁকে চরমতম দারিদ্র্য বরণ করতেও প্রস্তুত থাকতে হবে। সত্যাগ্রহী অবশ্যই নির্ভীক হবেন। ধনসম্পদ, সম্মান, আত্মীয়পরিজন, গভর্ণমেণ্ট, শারীরিক নিগ্রহ, এমনকি মৃত্যু, কোনো বিষয়েই তার মনে কোনো ভীতি থাকবেনা। দেশপ্রেমের জন্য যারা কাজ করছেন না তারাও সত্যাগ্রহীর এই গুণগুলি অর্জন করতে সচেষ্ট হতে পারেন, এতে তারা মানুষ হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠতা লাভ করতে পারবেন। এমনকি যারা সৈনিক, অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করাই যাদের কাজ এবং হিংসা যাদের পেশা, তাদেরও এই সব গুণগুলি কিছু কিছু অর্জন করতে হয়। সহিংস বা অহিংস যে কোনো সৈনিককেই সাহসী ও নির্ভীক হতে হয়। অহিংস সত্যাগ্রহী পেশাদারী সৈনিকের চেয়ে অনেক বেশী সাহসী ও নির্ভীক। যার মনে বিদ্বেষ নেই, ঘৃণা নেই, আছে সত্যনিষ্ঠা ও ভালবাসা, তার কোনোই অস্ত্রের দরকার হয় না, কিন্তু তার দরকার হয় অসীম সাহস ও মনোবলের।

"হিন্দ স্বরাজ" গ্রন্থে গান্ধীজী তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধীয় ধারণাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি লেখাপড়া বা বিবিধ বিষয়ের—ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্যের—জ্ঞান। এই জ্ঞান একটি উপায় বা অস্ত্র। এর ভালো মন্দ নির্ভর করছে, কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তার উপর। কিন্তু শিক্ষিত বলতে আমরা মার্জিত মনের অধিকারীকে বোঝাবো। যার বুদ্ধি যুক্তিদ্বারা পরিচালিত, যিনি হৃদয়াবেগের দাস নন, তিনিই শিক্ষিত। গান্ধীর মতে, শিক্ষার বহিরংগের উপর খুব বেশি জোর দেওয়া অনাবশ্যক। চরিত্র-গঠনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইংরেজি শিক্ষা ভারতবর্ষের স্বাধিকার লাভের জন্য প্রয়োজন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, লক্ষ লক্ষ লোককে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া মানে তাদের উপর দাসত্ব চাপানো। আমরা যে হোমরুলের দাবীটুকু পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাতে করছি এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে? আদালতে আমাদেরই মাতৃভাষা আর একজন মাতৃভাষী (দোভাষী) ইংরেজিতে

তৃতীয় মাতৃভাষী এক বিচারকের কাছে পেশ করছেন, এর চেয়ে হাস্যকর কিছু কল্পনা করা যায় না। যারা বর্তমান ব্যবস্থার জন্য ইংরেজি শিখতে বাধ্য হয়েছেন বা কাজের সুবিধার জন্য শিখেছেন, তারা যেন সন্তানদের নীতিশিক্ষা দেবার জন্য মাতৃভাষা ব্যবহার করেন এবং সন্তানদের মাতৃভাষা ছাড়াও দ্বিতীয় একটি ভারতীয় ভাষা শেখান। ছেলেমেয়েরা বড় হলে ইংরেজি শিখতে পারে, তাতে ক্ষতি নেই, কারণ সেই শিক্ষায় ইংরেজির মুখাপেক্ষী হতে হবে না। ইংরেজের অধীনে ভাল চাকরির জন্য, অর্থার্জনের জন্য, বা ইংরেজি ডিগ্রির জন্য, ইংরেজি শেখার কোনো মানে হয় না। গান্ধীজী জোরের সংগে বলেন, আমাদের ভারতবর্ষের সব ভাষারই উন্নতি দরকার। যে সব ইংরেজি বই দরকারী সেগুলি আমরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে নেবো। বিষয় ও বিজ্ঞান শিক্ষার সময়ও নৈতিক শিক্ষার উপরই থাকবে প্রাধান্য। প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয় তার আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও হিন্দু হলে সংস্কৃত, মুসলমান হলে আরবী, এবং পার্শী হলে পার্শী ভাষা শিখবে ; এবং ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই হিন্দী শিখবে। কিছু হিন্দু আরবী ও পার্শী, এবং কিছু মুসলমান পার্শী ও সংস্কৃত শিখবে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয়দের অনেকে তামিল শিখবে। আমরা যদি এই কাজ করতে পারি অচিরেই ইংরেজরা ভারত থেকে দূর হতে পারে। পাশ্চাত্য শাসন দূর করতে হলে পাশ্চাত্য সভ্যতা দূর করে ভারতীয় সভ্যতার মূলটি পত্তন করা দরকার, এবং শিক্ষাও সেই ছাঁচে ঢালা উচিত। এর সবগুলি গ্রাহ্য না হতে পারে, কিন্তু মাতৃভাষা সম্পর্কিত তাঁর চিন্তা যে যুগের চেয়েও এগিয়ে ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

মেশিন বা যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, যন্ত্র য়ুরোপের সর্বনাশ করেছে, ইংরেজকেও করতে যাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতার প্রধান চিহ্নই হল আধুনিক যন্ত্র, আর এই যন্ত্র, গান্ধীজীর চোখে, এক মস্তবড়ো পাপ। যন্ত্র সম্বন্ধে গান্ধীর এই প্রচণ্ড বিরূপতা

ও অবিশ্বাস আমাদের অনেকেরই মনে ধরে না। গান্ধী নিজের চোখে দেখেছিলেন বোম্বাইএর মিল শ্রমিকরা কেমন ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। সেখানকার মহিলা শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। এই সব দেখে তার মনোভাব যন্ত্রপাতির প্রতিই বিরূপ হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে হয়েছে, মিল যখন ছিল না, কই তখন তো এই খেটে খাওয়া মেয়েদের অবস্থা এমন ভয়াবহ হয়নি। এর চেয়ে তাঁত ভালো, এর চেয়ে পূর্বতন যুগে ফিরে যাওয়া ভালো, ইংরেজ-পূর্ব ও শিল্প-পূর্ব ভারতবর্ষও ভালো। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কল-কারখানা সম্বন্ধে গান্ধী বল্লেন, "আমি এর সপক্ষে একটি যুক্তিও মনে করতে পারছি না।" গান্ধীর চরকাও যন্ত্র, কিন্তু এই ধরণের যন্ত্র মানুষকে মনুষ্যতর পর্যায়ে নামিয়ে আনে না। যন্ত্র যন্ত্র বলেই খারাপ, তা নয়; যন্ত্র মানুষকেও ব্যক্তিত্বশূন্য যন্ত্রে পরিণত করে বলেই খারাপ। মানুষ যন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে যখন যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ে তখনই তা খারাপ।

ভাষা বা যন্ত্রের প্রশ্নে আধুনিক ভারতের নাগরিক গান্ধীর সংগে পুরোপুরি একমত হবেন কিনা সেটি বড় কথা নয়। গান্ধী যে মংগল চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাস্তব অবস্থা এবং তাঁর নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছেন সেই মংগল চিন্তা আমাদের থাকা চাই। গান্ধীবাদী হওয়া মানে যদি গান্ধীজীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মতামত পুরোপুরি একশোভাগ মেনে নেওয়া বুঝায় তাহলে বিংশ শতকের শেষার্ধে ক'জন গান্ধীবাদী অবশিষ্ট থাকতে পারে তা বলা মুশকিল। আমিষ নিরামিষ এমন কি গোমাংস ভক্ষণের সংগে পাপের কী সম্পর্ক থাকতে পারে বলা যায় না। কিন্তু গান্ধীর জীবন—ব্যক্তিগত রুচি ও লক্ষ্যভেদ সত্ত্বেও—বহু যুগ পর্যন্ত শিক্ষাপ্রদ হয়ে থাকবে। গান্ধী বলেছিলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী।" কথাটি খুব সত্য। কিন্তু গান্ধীজী বিশিষ্ট এক জীবন যাপন করা ছাড়াও অনেক বিশিষ্ট বাণীও শুনিয়েছেন। সেই বাণীগুলি আক্ষরিক

অর্থে গ্রহণ করলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই হতাশ হবো। তিনি অনেক সময় নিজেই নিজের জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন; সেই ব্যাখ্যাকে প্রকৃত গান্ধী-আদর্শ হিসাবে না ধরাই ভালো। তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে গান্ধী নিজেই বলেছেন তিনি গান্ধীবাদী নন। ক্রমবিবর্তনশীল গান্ধী কেমন করে গান্ধীবাদী হবেন? আমরা আমাদের মতো করে, আমাদের যুগের মতো করে, যদি গান্ধীর জীবনকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে তাই হবে উপযুক্ত কাজ। গান্ধী নিজেও যুগের দাবীকে অস্বীকার করতে পারেননি। ব্যারিস্টারি করেছেন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, আবার সেই শিক্ষাকে তাঁর মতো করে নতুন দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী কাজে লাগিয়েছেন। বিংশ শতকের শেষেও তেমনি যাঁরা অন্যায়, দারিদ্র্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়ছেন তাঁরা তাঁদের মতো করে গান্ধীকে দেখবেন, এইতো স্বাভাবিক। সমাজবাদী, সাম্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে গান্ধীর জীবন ও আদর্শ থেকে প্রেরণা পেতে পারেন। বর্তমান তরুণ সমাজও পারেন। মত পথ নির্বিশেষে প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রেই গান্ধী-আদর্শ প্রয়োগ করা সম্ভব ও উচিত। গান্ধীর জীবনকথা এমনি একটি দিশারি। ব্যক্তিগত জীবনে গান্ধী-আদর্শ প্রয়োগ করতে পারলে, সমাজতন্ত্রী আরো ভালো সমাজতন্ত্রী হবেন এবং সাম্যবাদী আরো বেশি সাম্যবাদী হবেন। এজন্য গান্ধীর নাম উচ্চারণ করার দরকার নেই, গান্ধী-গীতা হাতে বা পকেটে রাখবারও দরকার নেই; গান্ধী আদর্শের অন্তরটি স্পর্শ করতে পারলেই হল।

"হিন্দস্বরাজ"এর উপসংহারে গান্ধী বলেছেন তিনি নরমপন্থীও নন, চরমপন্থীও নন, এবং তিনি নিজস্ব কোনো পার্টি গঠনেরও বিরোধী। নরম ও চরম পন্থী উভয়েরই তিনি সেবা করতে চান। যারা শুধু সেবা করতে চায় তাদের আবার পার্টি কি? চরম পন্থীদের তিনি বলতে চান যে, ইংরেজ তাড়ালেই হোমরুল বা স্বরাজ লাভ হবে এটি ভ্রান্ত ধারণা; আবার নরমপন্থীদের তিনি বলতে চান যে

ইংরেজদের কাছে কেবলি আবেদন নিবেদন জানানোও ঘৃণার্হ। ইংরেজ চলে গেলে আমাদের সর্বনাশ হবে, আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরবো, এ একটা ভুল ধারণা। আর যদি তা সত্যও হয়, তবু স্বাধীনতাসহ নৈরাজ্য পরাধীনতা সহ আইন-শৃংখলার চেয়ে শ্রেয়। গান্ধীর মূল বক্তব্য হল, আমাদের শিখতে এবং শেখাতে হবে যে আমরা বিদেশী শাসনের পীড়ন যেমন চাইনা, তেমনি দেশী শাসনের পীড়নও চাইনা। দেশী বা বিদেশী যারাই শাসক হোক তাদের ইচ্ছায় আমরা চালিত হবোনা, আমাদের অর্থাত জনগণের ইচ্ছা অনুসারেই তারা চালিত হবে। তারা জনগণের সেবকমাত্র, নইলে আমরা তাদের চাইনা, তাদের সংগে সহযোগিতা করতেও চাইনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংরেজরা রাশিয়াকে ভয় করতে পারে কিন্তু আমরা ভারতীয়রা করিনা। রুশরা ভারতে এলে তাদের সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা নেবার আমরাই নেবো। আর ইংরেজরা যদি আমাদের সংগে থাকে, আমরা উভয়ে মিলেই রুশদের গ্রহণ কোরতে পারি! কোনো জাতি দুঃখবরণ না করে উন্নত হয়নি, আমরাও দুঃখবরণ না করে স্বরাজ লাভ করতে পারবো না। প্রকৃত স্বরাজ হচ্ছে আত্মসংযম। এই স্বরাজ-লাভের উপায় হচ্ছে অহিংস অসহযোগ অর্থাৎ আত্মিক বল বা ভালবাসার শক্তি। এ বল বা শক্তি প্রয়োগ করতে গেলে সর্বতোভাবে স্বদেশী বা স্বনির্ভর হতে হবে।

১৯১৫ খৃঃ মে মাসে গান্ধী আফ্রিকার ফিনিক্স ও টলস্টয় ফার্মএর অনুরূপ গুজরাত প্রদেশের আমেদাবাদে বিশজন নরনারী নিয়ে একটি আশ্রম স্থাপন করলেন, নাম দিলেন "সত্যাগ্রহ আশ্রম"। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে সেবাকার্যের জন্য ইংলণ্ডেশ্বর গান্ধীকে ৩রা জুন তারিখে কাইজার-ই-হিন্দ্ সোনার পদক দেবার কথা ঘোষণা করলেন। ঐ একই খেতাবের তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও নাইট উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এদিকে বারাণসীতে ১৮৯২ খৃঃ অ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে এবং সেটিকে তখন

"বিশ্ববিদ্যালয়" হিসাবে গণ্য করার কথা উঠেছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত ১৯১৬ খৃঃ ৬ই ফেব্রুয়ারি তিন দিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানে গান্ধীজী একটি ভাষণ দিলেন। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ও বহু দেশীয় রাজা মহারাজা সভামঞ্চ অলঙ্কৃত করে বসে ছিলেন। এই বর্ণাঢ্য ধনাঢ্যদের সামনে তিনি উপস্থিত হলেন ছোটো ধুতি পরে এবং মাথায় দেশি পাগড়ি বেঁধে। সামনের ছাত্র, অভিভাবক ও নাগরিকদের সম্বোধন করে তিনি বল্লেন, একটি ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁকে ইংরেজিতে ভাষণ দিতে হচ্ছে এজন্য তিনি দুঃখিত। যদি গত পঞ্চাশ বছর ভারতবর্ষে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত তাহলে তার ফল কী হত? ভারতবর্ষ এতদিনে স্বাধীন হয়ে যেত। আমাদের শিক্ষিতরা তাহলে সাধারণ মানুষদের থেকে পৃথক হয়ে যেতোনা, শিক্ষার ফল সবাই ভোগ কোরতো। মন্দিরের নোংরা পরিবেশ, ভারতীয়দের নোংরা অভ্যাস, রেলযাত্রীদের অবর্ণনীয় দুর্দশা, ছাত্রদের মূর্খ ইংরেজিপনা, গান্ধী সব কিছুকেই তীব্রভাবে সমালোচনা করলেন। তারপর সভাস্থ রাজামহারাজা ও ধনীদের সম্বোধন করে বল্লেন: "এই মূল্যবান পোষাকে ভূষিত অভিজাতদের সংগে লক্ষ লক্ষ গরীব ভারতীয়দের যখন তুলনা করি, তখনই আমার বলতে ইচ্ছে করে— আপনারা যতক্ষণ না আপনাদের মণি-মাণিক্য খুলে ফেলছেন এবং ভারতবাসীদের গচ্ছিত ধন হিসাবে সেগুলি রাখছেন ততক্ষণ ভারতের মুক্তি নেই।" এমন প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, অপ্রিয় ভাষণের জন্য উদ্যোক্তারা বা মঞ্চের গণ্যমান্যরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আরো বল্লেন, আমাদের ধনকুবের ও রাজা মহারাজাদের প্রাসাদের দিকে তাকালেই আমার মনে পড়ে, এই সব প্রাসাদ তৈরির টাকা এসেছে আমাদের গরীব কৃষকদের কাছ থেকে। আমরা যদি কৃষকদের সর্বস্ব শোষণ করি বা কাউকে শোষণ করতে দিই, তাহলে স্বরাজের মনোভাব আমাদের কতোটুকু রয়েছে বলা যায়? আমাদের মুক্তি সম্ভব শুধু কৃষকদের মুক্তির মধ্য দিয়ে। এই পীড়ক ও পীড়িতের

সম্পর্ক রয়েছে বলেই সারা দেশে একদিকে ভয় অন্যদিকে সন্ত্রাস, এই জন্যই বারাণসীর পথে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাণ রক্ষার জন্য এত শাদা পোষাকের পুলিশ মোতায়েন। আমরা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ও ঈশ্বরকে ভয় করি, তাহলে আর কাউকেই ভয় করতে হবেনা ; মহারাজ, ভাইসরয়, ডিটেক্‌টিভ পুলিশ, এমনকি রাজা পঞ্চম জর্জকেও না।··· গান্ধী খুব শান্ত গলায় এই কথাগুলি বলে চলেছেন, কিন্তু শ্রীমতী বেসান্ত ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের কাছে কথাগুলি মনে হচ্ছিল সাক্ষাত রাজদ্রোহের প্ররোচনা। শ্রীমতী বেসান্ত গান্ধীকে থামতে বল্লেন, গান্ধী একবার শ্রীমতী বেসান্ত ও আরেকবার সভাপতির দিকে তাকিয়ে কি যেন বল্লেন। কিন্তু সভা তখন দুটি বিবদমান ধ্বনিতে মুখর একদিকে "বসুন বসুন", অন্যদিকে "বলুন বলুন"। গান্ধী সভাপতিকে কী বল্লেন শোনা গেলনা। হুলুস্থুলের মধ্যে সভা শেষ হল। এরপর গান্ধীকে বারাণসী ত্যাগ করে চলে যেতে হল, কারণ পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানালেন, শহরে তিনি "অবাঞ্ছিত ব্যক্তি"। পরদিন খবরের কাগজে গান্ধীর এই বক্তৃতাটি ছাপা হল এবং সারাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হল। বিশেষ করে তরুণদের মনে এই সাহসী অথচ শান্ত এবং অন্য সব রাজনৈতিক নেতাদের থেকে পৃথক মানুষটির আচরণ গভীর রেখাপাত কোরলো।

১৯১৬ খৃঃ ডিসেম্বরে লখনৌয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী যোগ দিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের "ইস্টার বিদ্রোহ" এই সময় ভারতবর্ষে চরম ও নরম পন্থীদের মনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। এই অধিবেশন চলার সময় অনেকের সংগেই গান্ধীর অনেক বিরূপ কথাবার্তা হয়। কিন্তু বিশেষ করে দুজনের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। একজন তরুণ জওহরলাল নেহরু, আরেকজন চম্পারণ জেলার গরীব নীল চাষী রাজকুমার শুক্ল। শুক্ল গান্ধীকে অনুরোধ করলেন, আপনি একবার বিহারে আমাদের জেলায় আসুন, আপনাকে আমরা চাই আমাদের দুর্দশা চাক্ষুষ করতে। এই সামান্য আহ্বান গান্ধীকে

অল্পদিনের মধ্যেই যে কোন্ দুর্গম, ঐতিহাসিক যাত্রায় নিয়ে যাবে, তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি বল্লেন, যাবো, কিন্তু এখন নয়, কিছুদিন পর। রাজকুমার শুক্ল সহজে ছাড়বার পাত্র নন। গান্ধী আশ্রমে ফিরে গেলেন। কিছুদিন পর সেখানে গিয়ে শুক্ল হাজির, "চলুন আপনাকে যেতে হবে।" গান্ধী বল্লেন, কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর কলকাতা যাবার কথা আছে, শুক্ল যেন সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কী আশ্চর্য, কয়েকমাস পর যখন তিনি কলকাতা পৌঁছালেন, দেখলেন শুক্ল সেখানেও ঠিক নির্দিষ্ট ঠিকানায় দোরগোড়ায় হাজির। কলকাতায় কাজ সেরে অগত্যা গান্ধী শুক্লর সংগে পাটনার ট্রেনে চড়ে বসলেন। শুক্লর কথা থেকে গান্ধী সঠিক কিছুই ধারণা করতে পারেন নি। পাটনায় গিয়েও গান্ধী ঠিক বুঝে উঠতে পারলেননা এই চাষী ঠিক কী চান, বা চাষীদের সমস্যা ঠিক কী। তখন শুক্ল গান্ধীকে পাটনার এক উকিলের কাছে নিয়ে গেলেন যিনি তার কথা গান্ধীকে ঠিকমতো বোঝাতে পারবেন। কিন্তু গিয়ে দেখা গেল উকিলবাবু বাড়ী নেই। এই উকিলের নাম বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভাবীকালে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি। গান্ধী পাটনা ছেড়ে মজঃফরপুর এবং সেখান থেকে চম্পারণ রওনা হলেন। মজঃফরপুরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং চম্পারণ কৃষকদের উপর ইংরেজ নীলকর সাহেবদের জুলুমের ফিরিস্তি দিলেন। কৃত্রিম নিল আবিষ্কারের পর নীল চাষ বন্ধ হয়ে গেলেও খাজনা বৃদ্ধির নতুন চুক্তিতে সই করিয়ে অশিক্ষিত চাষীদের নতুন দাসত্বে বাঁধা হচ্ছিল। যারা নতুন চুক্তিতে সই করতে গররাজী তাদের উপর চলছিল অকথ্য উৎপীড়ন—মারধোর, মিথ্যা মামলা সাজিয়ে হাজতে পাঠানো, বাড়ীঘর লুঠ করা, গরুবাছুর কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি। কোনো সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কাছে এসব খবর পৌঁছাতো না। কোন কিছু ঘটলেই বলা হত বাইরে থেকে রাজদ্রোহী বাঙালীরা এসে উস্কানি দিচ্ছে, গোলমাল পাকাচ্ছে।

গান্ধী রাজেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে সব শুনে বল্লেন, শুধু মামলা করে

কোনো ফল হবেনা, যতক্ষণ না কৃষকদের মন থেকে ভয়ের ভাব দূর হচ্ছে। তিনি নিজে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে কৃতসংকল্প, কিন্তু কৃষক-বন্ধু আইনজীবীদেরও সাহায্য দরকার। রাজেন্দ্রবাবু ও তাঁর সহকর্মীরা মনে করলেন, গান্ধী শুধু আইনগত সাহায্যই চাইছেন। কিন্তু তাঁরা শুনে হতবাক হলেন যখন গান্ধী বল্লেন, "আপনারা প্রয়োজন হলে জেলে যেতে প্রস্তুত আছেন কি ?" জেলে ? উকিলেরা মক্কেলদের জন্য জেলে যাবে ? খুব মজার কথা তো ! বেশ, জেলে যাওয়া ছাড়া আর কি করতে হবে ? গান্ধী বল্লেন, প্রয়োজন হলে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বিনে মাইনেতে কারণিক বা দোভাষীর কাজ করতে পারবেন ? এইভাবে অনেক রাত পর্যন্ত সংগী আইনজীবীদের সংগে মহাত্মার কথোপকথন চল্ল। কৃষকদের মন থেকে ভয় দূর করার আগে এই সব আইনজীবীদের মন থেকে ভয় দূর করাই গান্ধীর কাছে খুব জরুরি কাজ মনে হয়েছিল। অবশেষে ওরা তাঁকে কথা দিলেন, তারা গান্ধীর নির্দেশেই চলবেন। গান্ধী তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করতে চাইলেন। চাষীদের কথা তিনি শুনেছেন; সাহেব জমিদারদের কথাও শোনা দরকার, কারণ তারাই প্রতিপক্ষ। তিনি "প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন"এর সেক্রেটারি এবং ত্রিহুত ডিভিশনের কমিশনারের সংগে দেখা করলেন। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সাফ জবাব দিলেন, এ বিষয়ে গান্ধীর মতো বাইরের লোকের নাক গলাবার কোনো দরকার নেই; এবং কমিশনার সাহেব তাঁকে অবিলম্বে ত্রিহুত ডিভিশন পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন। এই মৃদু উপদেশের মর্মার্থ বুঝতে তাঁর কষ্ট হলনা, তাঁকে হয়তো অবিলম্বেই বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হবে। তিনি আইনজীবী দলবল নিয়ে ট্রেনে মতিহারি রওনা হলেন। মতিহারি শহরে ইতিমধ্যেই খবর রটে গিয়েছিল একজন মহাত্মা আসছেন গরীব মানুষের দুর্দশা মোচন করতে। মহাত্মাই, কারণ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি আসেননি, একবারও কংগ্রেসের নাম উচ্চারণ করেননি চম্পারণে। তিনি শুধুই মহাত্মা।

রেল স্টেশনে অগণিত মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো এবং তারপর তিনি যে বাড়ীতে উঠলেন সেখানে প্রতিদিন চলল অগণন মানুষের স্রোত। প্রতিদিন দর্শনার্থীদের কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করতে লাগলেন কৃষকদের অভিযোগের খুঁটিনাটি বিবরণ। একদিন খবর এলো, কোনো গ্রামে একটি কৃষকের উপর উৎপীড়ন হয়েছে। পরদিন ১৬ই এপ্রিল (১৯১৭ খৃঃ) তিনি তুজন সংগী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, নিজেই তদন্ত করবেন। উত্তর বিহারে তুরন্ত গরমের মধ্যে হাতীর পিঠে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা চলেছেন। কিন্তু গান্ধী এর মধ্যেও সাথীদের সঙ্গে বিহারী মেয়েদের পর্দাপ্রথা কি করে দূর করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। মাঝ পথে সাইকেল চড়ে একজন পুলিশ সাব-ইনসপেকটর এলেন, বল্লেন গান্ধীকে একটু মতিহারি যেতে হবে। সাথীদের উপর তদন্ত শেষ করার ভার দিয়ে গান্ধী গরুর গাড়ীতে ফিরে চল্লেন মতিহারি। মতিহারি পৌঁছালে পুলিশ তাঁর হাতে এক চিরকুট দিল, চম্পারণ পরিত্যাগের নোটিশ।

গান্ধী জবাব দিলেন, তিনি এই নোটিশ মানবেন না, তিনি আদেশ অমান্য করবেন। এজন্য পরদিন তাঁকে কোর্টে হাজির হতে বলা হল। গরীবের বন্ধু, কৃষকের বন্ধু, মহাত্মাজীর বিচার হবে, খবর বিত্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল শহরে ও গ্রামাঞ্চলে। ভোর হতে না হতে মতিহারির রাস্তায় কৃষকরা মিছিলের পর মিছিল নিয়ে হাজির হল ; যেন এক জাত্ন স্পর্শে তাদের মন থেকে সব ভয় দূর হয়ে গেছে। তারা কোর্টের প্রাংগনে জমায়েত হল উৎকণ্ঠায়, প্রতিবাদে। গান্ধী তাদের মহাত্মা, মহাত্মা ছাড়া আর কারো কথাই তারা শুনতে রাজী নয়। গান্ধী যখন আদালতে হাজির হলেন তখন লোকে লোকারণ্য। পুলিশ জনতাকে শান্ত করতে না পেরে গান্ধীজীর কাছেই প্রার্থনা কোরলো যেন তিনি তাদের শান্ত করেন। গান্ধী হাসিচ্ছলে রাজী হলেন। প্রমাণ হল, যে-বৃটিশ শক্তিকে লোকে ভয় ক'রে কখনো চ্যালেঞ্জ করে না, চ্যালেঞ্জ করলে দেখা যায় যে সেই শক্তি মোটেই যথেষ্ট নয়,

সর্বশক্তিমান তো নয়ই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পাবলিক প্রসিকিউটর কেউই বুঝে উঠতে পারছিলেন না গান্ধীকে নিয়ে কী করবেন। পাবলিক প্রসিকিউটর বিচার মুলতুবি রাখবার চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু গান্ধী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হোক, কারণ তিনি দোষী, তিনি জেনেশুনে অর্ডার অমান্য করেছেন। তিনি বিচারকের কাছে একটি বিবৃতি দিয়ে বল্লেন, তিনি প্রজাদের দুর্দশা সম্বন্ধে সত্য ঘটনা অনুসন্ধান করতে ও জানতে চম্পারণে এসেছেন, সেই কাজ তিনি অসম্পূর্ণ রেখে যেতে চাননা। আইন-সম্মত ভাবে গঠিত সরকারের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য নয়, বিবেকের নির্দেশে, উচ্চতর অনুশাসন পালনের জন্যই সেখানে এসেছেন। বিবেকের নির্দেশ ম্যাজিস্ট্রেটের বা বৃটিশ রাজের নির্দেশের চেয়ে অনেক বড়ো। কোর্ট তাঁকে জামিন নিতে বল্লেন, গান্ধী অস্বীকার করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট রায়দান মুলতুবি রেখে তাঁকে আপাতত ছেড়ে দিলেন, এবং পরে গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলাটাই তুলে নেওয়া হল। এই প্রথম ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলনের জয় হল। গান্ধী এই ঘটনা ব্যাখ্যা করে বল্লেন, আমি যা করেছি তা খুবই সাধারণ একটা কাজ। আমি শুধু স্পষ্ট ঘোষণা করেছি যে আমার নিজের দেশে, আমার প্রয়োজন বোধে আমি যেখানে খুশি যাবো, সে সম্বন্ধে বৃটিশের নিষেধ বা হুকুম মানতে রাজী নই। এই "সাধারণ কাজ" কিন্তু অতটা সাধারণ নয়। কারণ গান্ধীর আগে কোনো ভারতবাসী এরকম ঘোষণা কখনো করেনি। একবার এরকম কথা ঘোষিত হওয়া মানে, ভারতীয়দের উপর ইংরেজের বিধি নিষেধ জারী করার অধিকার লুপ্ত হতে যে বাকি নেই তাই স্পষ্ট হওয়া।

গান্ধী দুএকদিনের জন্য চম্পারণে থাকবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেলেন প্রায় সাত মাস। চাষীদের জবানবন্দী ও বিবৃতি নেওয়া হতে লাগলো দিনের পর দিন; পাঁচ ছ জন আইনজীবী গান্ধীকে সাহায্য করতে লাগলেন। এই আইনজীবীরা তাদের ভৃত্য ও পাচক

সংগে এনেছিলেন। গান্ধী তাদের এই বিলাসিতা দেখে হাসলেন এবং ভৃত্য ও পাচকদের বিদায় করে দিতে বল্লেন। কয়েকজন বদান্য বিহারী বড়লোক যে সামান্য চাঁদা দিতেন তাই দিয়ে গান্ধী সমস্ত খরচ চালাতেন। কৃষকরাও চাঁদা দিতে চাইতেন; কিন্তু গান্ধী তা নিতেন না; কারণ কৃষকরা নিতান্তই গরীব, তাদের সাহায্যের জন্যই ওরা ওখানে তদন্তে এসেছেন। প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে কৃষকরা এসে দুঃখ দুর্দশার কথা বলতো, আবার অনেকে আসতো শুধু মহাত্মাজীকে দর্শন করতে। তিনি সবার সংগে কথা বলতেন, সবার সহযোগিতা চাইতেন, সি-আই-ডি পুলিশদেরও তিনি বাধা দিতেন না, তারাও গান্ধীর কার্যকলাপ ও ইণ্টারভিউ নেওয়া দেখতো, জমিদার নীলকর সাহেবদের কাছেও তিনি যেতেন, তাদের বক্তব্য শুনতেন। এইভাবে প্রায় দশহাজার সাক্ষ্য নেওয়া হল। সাক্ষ্য নেওয়ার চেয়ে বড়ো কথা হল, চম্পারণ জেলার কৃষক মহলে একটা নবজাগরণ ঘটলো। মুখ বুজে অন্যায় ও পীড়ন সহ্য করার বদলে এবার তারা মুখ খুলতে পারলো। এরা এতদিন শুধু বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখেছে এবং সর্বশক্তিমান বলে মনে করে এসেছে; এই প্রথম একজন ভারতীয় স্বল্পবাস, মিতাচারী, মহাত্মাকে দেখলো যিনি বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে ভয় করেন না, বরং বৃটিশ ম্যাজিস্টেট যাঁকে ভয় করে, যিনি তাদের কোনো হুকুম শোনাতে আসেন নি, চাঁদা তুলতে আসেননি, তাদের দুঃখের মূল কিসে উৎপাটিত হয় তাই বুঝতে এসেছেন। নীলকররা সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলো গান্ধীকে এখান থেকে সরানো হোক। আবার গান্ধীকে অনুরোধ জানানো হ'ল তিনি যেন চম্পারণ ছেড়ে চলে যান। গান্ধী চলে যেতে আবারও অস্বীকার করলেন। শাসকরা তখন প্রমাদ গনলো। কিন্তু এবার গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার বদলে 'ভাইসরয়ের পরামর্শে একটি কমিশন গঠন করা হল চাষীদের অভিযোগ সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্য। এই কমিশনে চাষীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সরকার

গান্ধীকেই আহ্বান জানালেন। কমিশনের বৈঠকগুলিতে গান্ধী অত্যন্ত দক্ষতার সংগে কৃষকদের বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করলেন। সাহেব জমিদাররা বেআইনী ভাবে আর খাজনা বাড়াতে পারবে না এবং প্রজাদের কাছ থেকে যে বেশি খাজনা আদায় করেছে তার শতকরা পঁচিশ ভাগ চাষীদের ফেরত দিতে হবে, এই মর্মে সরকার অবিলম্বে আইন পাশ করলেন। গান্ধীর একক সত্যাগ্রহের জয় হল।

চম্পারণের ঘটনাবলী অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই, গান্ধী-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এখানে অনেকখানি রূপ পেয়েছে। বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্য গান্ধী চম্পারণ যাননি, বা বৃটিশ রাজকে অস্বীকার বা অমান্যও তিনি করেননি; তিনি গিয়েছিলেন গরীবদের দুর্দশা লাঘব করতে। লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ ও নির্যাতিত মানুষের বাস্তব সমস্যার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই গান্ধীর রাজনীতি গড়ে উঠেছে। কোনো বিমূর্ত আদর্শ বা ইজমে তিনি সমর্পিত ছিলেন না, তিনি সমর্পিত ছিলেন রক্তমাংসের মানুষে। তাদের বাস্তব সুখ দুঃখের সমস্যাবলীর সমাধান করাই ছিল তাঁর কাছে মূল রাজনীতি। গণতন্ত্র ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পুঁথিপড়া আদর্শের বুলি তাঁর কাছে ততোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। কোনো তৈরি ইজম প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে তিনি কোনো আন্দোলনে নামেননি, বাস্তব আন্দোলন থেকেই তাঁর যাকিছু ইজম এসেছে। আন্দোলনের জন্য আন্দোলন কিংবা আন্দোলন ভাঙিয়ে দল বা ব্যক্তির ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভ, এই ভাবে তিনি কোনো আন্দোলনকে দেখেন নি। আন্দোলনের মধ্যে তিনি নিপীড়িত ব্যক্তিমানুষটিকে কখনো ভোলেননি, এবং এই নিপীড়িত মানুষটির প্রতি তাঁর আনুগত্য চিরকাল অটুট থেকেছে। চম্পারণে দীর্ঘ অবস্থানের সময় তিনি কৃষকদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার এবং কৃষক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য শিক্ষক আনিয়েছিলেন। কস্তুরবাঈও এসেছিলেন, কৃষক রমণীদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি শেখাতে। চম্পারণ থেকে ফিরে যাবার আগে

তিনি একটি কমিটি গঠন করে যান যারা তাঁর অবর্তমানে এই কৃষকদের মধ্যে কাজ করবে। এদের মধ্যে ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আরো অনেকে। আইনজীবীদের সাহায্য করবার জন্য অনেকেই বল্লেন, দীনবন্ধু এণ্ডরুজ যেন তাদের সংগে সেখানে থেকে যান, তাতে কাজের সুবিধা হবে। এণ্ডরুজ ছিলেন গান্ধীর অনুবর্তী, তিনি সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। কিন্তু গান্ধী রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্যান্যদের ভৎর্সনা করে বল্লেন, ইংরেজের সংগে লড়াইতে একজন ইংরেজ তোমাদের সংগে থাকলে তোমরা একটু মনে জোর পাও, এই তো? এতে আসলে তোমাদের দুর্বলতা এবং নিজেদের সম্বন্ধে অনাস্থাই প্রকাশ পাচ্ছে। তোমাদের পথ যদি ন্যায়ের পথ হয়, তবে সংগ্রামে তোমাদের নিজেদের শক্তিতেই জিততে পারবে। গান্ধী যে তাদের মনের কথাটি ধরে ফেলেছিলেন, পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদই তা স্বীকার করেন। গান্ধী চম্পারণে ছটি গ্রাম বেছে নিয়ে, প্রত্যেক গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয় স্থাপনাই এর সবটা উদ্দেশ্য নয়। এই স্কুলগুলি গান্ধীর কমিউনিটি প্রজেক্ট; কারণ এখানকার শিক্ষকদের থাকা খাওয়ার সমস্ত ভার বহন করবেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা শিক্ষদের থাকা খাওয়ার ভার নেবেন কিন্তু এমন শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে যাঁরা শুধু কোনোমতে থাকা খাওয়ার বিনিময়ে গ্রামে এসে শিক্ষকতা করবেন? কিন্তু গান্ধী আশাতীত সাড়া পেলেন। অনেকে স্বেচ্ছায় আসতে চাইলেন। এই স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মহাদেব দেশাই যিনি পরে গান্ধীজীর সেক্রেটারি হন। "গঠনমূলক কর্মসূচি"র আইডিয়া চম্পারণে গ্রামবাসীদের মধ্যে কাজ করতে করতে গান্ধীর মনে দৃঢ় প্রোথিত হয়। এখানে কস্তুরবাঈ যে স্কুলটি পরিচালনা করতেন সেটি ছিল বাঁশ পাতা দিয়ে তৈরি। নীলকর সাহেবের প্ররোচনায় দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত কেউ সেটিতে একদিন আগুন লাগিয়ে ভস্মসাৎ করে দেয়। কিন্তু দেখা গেল কয়েক দিনের মধ্যেই স্থানীয় লোকদের

সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবকরা স্কুলটি আবার গড়ে তুলেছে, এবার আর বাঁশ খড়ের স্কুলগৃহ নয়, একেবারে ইঁটের দেয়াল। গ্রামবাসীদের মধ্যে কাজ করতে করতে গান্ধী গ্রামীণদের জীবনের সবদিক পর্যালোচনা করতেন। তিনি লক্ষ্য করলেন গ্রামের মহিলাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক অত্যন্ত নোংরা শাড়ী পরে থাকে। একদিন কস্তুরবাঈকে বল্লেন, জিজ্ঞাসা করো তো, ওরা কাপড় কাচেনা কেন? কস্তুরবাঈ যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে তার বাড়ীতে কস্তুরবাঈকে ডেকে নিয়ে গেল। খোলা দেয়ালশূন্য একটা চালা। তার নিজের একটিই মাত্র শাড়ী। দ্বিতীয় কোনো শাড়ী নেই যে পরবে; এখানে এই খোলা ঘরে শাড়ী খুলে কাচা তার পক্ষে অসম্ভব। এরকম বহু কাহিনী গান্ধী শুনলেন এবং এগুলি তাঁর মনে গাঁথা হয়ে গেল। চরম অভাব, অজ্ঞতা, অপরিচ্ছন্নতা, আলস্য, হাড়ভাঙা খাটুনি, উৎপীড়ন —এই হচ্ছে ভারতবর্ষের গ্রাম, গ্রামের বাস্তব চিত্র।

গান্ধী ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে সব উন্নয়ন কাজে হাত দিয়েছিলেন রাজনৈতিক পার্টি সেরকম কাজ অনেক ব্যাপক ভাবে নিশ্চয়ই পার্টি সংগঠনের মারফত করতে পারে। প্রভেদ এই যে, পার্টি নিজের দলগত ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতা লড়াইয়ে ভোটের জন্যই শুধু জনসাধারণকে ব্যবহার করে—একথা স্বীকার করুক বা নাই করুক—গান্ধীর দৃষ্টিভংগিতে তথাকথিক "রাজনীতি করা"টা একেবারেই গৌণ। এই দৃষ্টিভংগি নিয়ে রাজনীতি করলে নিশ্চয়ই দলীয় রাজনীতিও অনেক পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও নৈতিক গুণসম্পন্ন হতে পারে। ভারতবর্ষে বহু পার্টি ও বহু রাজনৈতিক মতবাদ। এজন্য এখানে একথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

১৯১৭ খৃঃ নভেম্বর মাসে গোধরায় গুজরাত রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতি হন গান্ধীজী। এ সভায় মহামান্য তিলক ভাষণ দেন। গুজরাতী ভাষায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে গান্ধীজী বলেন, ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের মতো ভারতেও পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তাতেই

আমাদের সব সমস্যার সমাধান হবে একথা ভাবলে ভুল করা হবে। অনেক ঠেকে শিখতে হবে, অনেক ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়েই স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র মজবুত হবে। কিন্তু যতোদিন ইংরেজ শাসন ভারতে রয়েছে ততোদিন ভারতবাসীর নিজের মতো ভুল করার স্বাধীনতাটুকুও নেই। কাজ করার এবং কাজের মধ্যে ভুল করার স্বাধীনতা যার নেই সে কখনোই এগোতে পারে না। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে হবে। সত্যাগ্রহীর শৃংখলাবোধ ও স্বাধীনচেতা মনোভাব ভারতের স্বরাজলাভকে ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করবে। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস অধিবেশন বসল কলকাতায়। গান্ধীও যোগদান করলেন। সেখানে অনেক কংগ্রেস-কর্মী সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, বিশেষ করে জওহরলাল নেহরু প্রমুখ তরুণরা। কিন্তু পাঞ্জাবের শ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপত রায় "অহিংস" নীতিতে খুব একটা আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। কারণ তাঁর কাছে মেরুদণ্ডহীন হিন্দুসমাজের অতীত দুর্বলতার চিরস্থায়ী রূপটিই এই "অহিংসা"র মধ্যে প্রতিফলিত বলে মনে হল।

এই সময় গান্ধী আমেদাবাদের কাপড়কলের মালিক অম্বালাল সরাভাইয়ের বোন অনসূয়ার কাছ থেকে একটি চিঠি পান। অম্বালাল সরাভাইয়ের মিলের শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। এই আন্দোলনে অনসূয়া দাদার বিরুদ্ধে মজুরদের দাবী সমর্থন করলেন, কারণ শোষিত শ্রমিকদের দাবী ন্যায্য বলে তিনি মনে করেন। গান্ধীকে অম্বালাল শ্রদ্ধা করতেন, এবং সবরমতী আশ্রম যখন অর্থাভাবে উঠে যাবার উপক্রম তখন অম্বালালই আশ্রমের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। অতএব অনসূয়া গান্ধীজীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে চিঠি পাঠান। কিছুদিন আগে যখন আমেদাবাদে প্লেগ দেখা দেওয়ায় শহর ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় তখন শ্রমিকদের শহরত্যাগ বন্ধ করার জন্য মজুরির সত্তর শতাংশ বোনাস দেওয়া হয়। প্লেগ বন্ধ হয়ে যাবার পর মালিকরা এই বোনাস বন্ধ করতে উদ্যোগী

হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকরা দাবী করে যে প্লেগ বোনাসের পরিবর্তে মহার্ঘ বোনাস হিসাবে মজুরির পঞ্চাশ শতাংশ দেওয়া হোক। মালিকরা কুড়ি শতাংশ বোনাসের জিদ ধরে এবং যারা এই বোনাস মানবেনা তাদেরই ছাঁটাই করবার ভয় দেখায়। গান্ধীজী আপোষ রফায় রাজী করাতে এগিয়ে এলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে তিনি উভয় পক্ষের সবকিছু খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে পঁয়ত্রিশ শতাংশ বোনাসকে ন্যায্য বলে সিদ্ধান্ত করলেন। মিল মালিকরা যুদ্ধের সুযোগে প্রচুর লাভ করছিলেন কাজেই এই বোনাস তারা অনায়াসেই দিতে পারবেন। কিন্তু মিল মালিকরা এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার পরিবর্তে ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯১৮ খৃঃ) তারিখে লক-আউট ঘোষণা করলেন। গান্ধীজী শ্রমিকদের সংগে বৈঠকে বসলেন, পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করার জন্য। লক-আউটের জবাবে তাদের নিজেদের দাবীতে শ্রমিকরা যদি ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে গান্ধীজী বল্লেন, ধর্মঘটে দৃঢ় থাকতে হবে এবং ধর্মঘটে পরিপূর্ণ শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখতে হবে; ধর্মঘট সম্পূর্ণ অহিংস হবে, এমনকি ধর্মঘটবিরোধী "দালাল"দের প্রতিও কোনো হিংসা প্রয়োগ করা চলবেনা। ধর্মঘট চলাকালীন শ্রমিকরা পরিবার প্রতিপালনের জন্য ভিক্ষা করতে পারবেনা, তার পরিবর্তে ছোটোখাটো ঠিকে কাজ করে কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করবে, কারণ ধর্মঘটকালে বেতন দেবার মতো কোনো তহবিল শ্রমিকদের নেই। শ্রমিক নেতারা কথা দিলেন এই নীতিগুলি মেনে চলা হবে। নদীর ধারে একটি বটগাছের ছায়ায় দশহাজার শ্রমিকের সভায় গান্ধীজী এক ভাষণ দেন এবং শ্রমিকরা সংকল্প গ্রহণ করেন পঁয়ত্রিশ শতাংশ বোনাস না পাওয়া পর্যন্ত তারা কাজে যোগ দেবেন না। এরপর প্রতিদিন বিকেলে সভা বসতো এবং প্রতিদিনই গান্ধীজী বক্তৃতা দিতেন, বক্তৃতার পর প্রতিদিনই "এক টেক" (প্রতিজ্ঞা রাখো) এই শ্লোগান সহকারে ধর্মঘটী শ্রমিকরা শোভাযাত্রা করে শহর প্রদক্ষিণ

করতেন। বিরোধ আরো ঘনীভূত হল যখন ১২ই মার্চ তারিখে অম্বালাল ও অন্যান্য মিলমালিকরা ঘোষণা করলেন যে বিশ শতাংশ বোনাসে যে সব শ্রমিক রাজী তাদের নিয়েই মিল চালু করা হবে। ধর্মঘটীদের মধ্যে দুর্বল একটি অংশ কাজে যোগ দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; এই সব ধর্মঘট ভাঙা "দালাল"দের ভয় দেখানো ও মারধোর করার প্রস্তাব উঠতেই গান্ধী দৃঢ়ভাবে এই ধরণের কথাবার্তা বন্ধ করতে বল্লেন। এদিকে ধর্মঘটীদের মনোবল ভেঙে পড়ছিল, এবং কেউ কেউ স্পষ্টই বল্ল, "অনসূয়া বেন বা গান্ধীজীর আর কি? ওঁরা তো গাড়ীতে আসেন, ঘরে ভালো ভালো খাবার খান; কিন্তু মরণযন্ত্রণা ভোগ করছি আমরা; রোজ রোজ মীটিংএ গেলেই কি উপোষের জ্বালা মিটবে?" সেদিন মীটিংএর ঠিক আগে এই কথাগুলি গান্ধীর কানে পৌঁছাল। কথাগুলি গান্ধীর মনে লাগলো। তিনি সেদিনকার সভায় আবেগের সংগে ঘোষণা করলেন, "শ্রমিক-ভাইরা তাদের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হবে এ আমার অসহ্য। তাদের দাবী না মেটা পর্যন্ত আমি অন্নগ্রহণ কোরবোনা, গাড়ীতে চড়বোনা।" সত্যাগ্রহের অংগ হিসাবে অনশনের প্রয়োগ এই প্রথম। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিনিক্স ও টলস্টয় ফার্মেও তিনি উপবাস করেছেন, কিন্তু সে আত্মশুদ্ধির জন্য। সবরমতীতেই তিনি প্রথম একটি বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ দাবীর সমর্থনে অনশনের প্রয়োগ করলেন। দাবীর যৌক্তিকতা ও সত্যাগ্রহে জীবনপাত করতেও তিনি প্রস্তুত, শ্রমিক সাধারণের কাছে এই দৃঢ়তা দেখানোর ও দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি অনশন করলেন। অনেকে বলবেন এও একধরণের বলপ্রয়োগ, চরম অস্ত্র নিক্ষেপ করে কতকগুলি সুযোগ আদায় করা, এ যেন একধরণের নৈতিক ব্ল্যাকমেইলিং। এতে দাবী হয়তো কিছুটা আদায় করা যায়, কিন্তু হৃদয় পরিবর্তন হয় কি না তা বলা শক্ত। গান্ধীর এই অনশন ধর্মঘটে সারা দেশে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হল। অনসূয়া তো গান্ধীর জন্য কাঁদলেনই, ধর্মঘটীরাও তাদের

সাময়িক দুর্বলতার জন্য গান্ধীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কোরলো এবং তারাও অনশন করতে চাইলো। মালিক পক্ষ প্রথমে নরম কাটতে চাননি, পরে তারাও একটি মীমাংসায় আসতে রাজী হলেন এবং পঁয়ত্রিশ শতাংশের দাবী কার্যত মেনে নিলেন। আমেদাবাদ ধর্মঘটে গান্ধী যে সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন তা তখনকার ভারতবর্ষের বৃহত্তম শ্রেণী-সংগ্রাম।

দাবী মিটবার পর গান্ধী "টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন" বা সূতাকল শ্রমিকসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মধারায় উৎসাহ দেন। অবশ্য মালিকরা যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে এবং শ্রমিক মালিক উভয় পক্ষই যাতে একসাথে বসে আপোষ আলোচনায় সব কিছু রফা করতে পারে গান্ধীজীর উৎসাহ ছিল সেইদিকেই। দেশবাসীর একাংশ আরেক অংশের বিরুদ্ধে লড়াই করবে—এই শ্রেণী-সংঘর্ষের নীতি অবশ্য গান্ধী অমোঘ বলে মনে করতেন না। মানুষকে শ্রেণী-বিভক্ত করা, মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করা তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি মনে করতেন এই সংগ্রাম—শ্রেণী-সংগ্রামের আকৃতি সত্বেও—শ্রমিক ও মালিক উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। যে শোষিত হয়েও শোষণ সহ্য করে শোষণকে শোষণ বলে মনে করেনা; এবং যে শোষক শোষণকে অন্যায় বলে মনে করেনা, শোষণ বজায় রাখতে চায়, উভয়েরই পরিবর্তন প্রয়োজন।

এর পর গান্ধী গেলেন গুজরাতের খেড়া জেলায় চাষীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। ফসল না হওয়ায় কৃষকদের পক্ষে পুরো খাজনা দেওয়া সম্ভব নয়. কিন্তু সরকার পুরো খাজনাই দাবী করছেন। রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজ বড়লাট লর্ড উইলিংডনের কাছে আবেদন জানালেন, কিন্তু তাতেও ফল হলনা। গান্ধী কৃষকদের কাছে গিয়ে একটি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করালেন। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে তাদের অভিযোগগুলি বিবৃত করে বলা হল যে তারা সরকার ঘোষিত খাজনা দেবেনা। সরকারকেও সেকথা জানিয়ে দেওয়া হল। ১৯১৮ খৃঃর মার্চ মাসে এই ভাবে একটি

বড় রকমের সত্যাগ্রহ শুরু হল। প্রত্যুত্তরে সরকার কৃষকদের ভাতে মারবার চেষ্টা করলেন; গরুবাছুর বাজেয়াপ্ত করে বিক্রি করে দিলেন, মাঠের ফসলও আটক করলেন। এতে কৃষকরা এমন মরিয়া হয়ে উঠলো যে তাদের হিংসার পথ থেকে বিরত রাখাই গান্ধীর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। গান্ধীজী এবার সত্যাগ্রহের প্রচলিত নীতি—আন্দোলনের সময় যে-আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সেই আইনটি ছাড়া অন্য কোনো আইনই ভাঙা চলবেনা—নিজেই লঙ্ঘন করলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে কৃষকের ফসল বাজেয়াপ্ত করা লুঠেরই সামিল; এইভাবে ফসল লুঠ করে রাষ্ট্রযন্ত্র ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করছে। অতএব ফসল আটকের যে আদেশ জারি করা হয়েছে তাও ভাঙা চলবে। সত্যি সত্যিই ভলান্টিয়াররা বাজেয়াপ্ত করা ফসল জোর করে মাঠ থেকে উদ্ধার করে নিল। এ যেন লুঠের পাল্টা লুঠ। এর জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের ফৌজদারি আইনে সাজা হল; অনেকেই জেলে গেলেন। এর পর সরকার বর্দ্ধিত খাজনা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি কমিয়ে দিলেন। যাদের দেবার ক্ষমতা নেই গভর্ণমেণ্ট তাদের কাছ থেকে আর বর্দ্ধিত খাজনা নিলেন না, শুধু যারা দিতে সক্ষম তাদের কাছ থেকেই আদায় করা হল। এই সংগ্রামে কোনো ঘোষিত জয় বা পরাজয় ঘটলো না। ধীরে ধীরে জুলুম এবং আন্দোলন দুইই স্তিমিত হয়ে গেল। অনেকে একে সত্যাগ্রহের জয় বলে মনে করলেও এটা আদৌ জয় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করা যেতে পারে।

বাজেয়াপ্ত ফসল জোর করে প্রত্যুদ্ধার করার মতো স্ববিরোধী কর্মনীতি গান্ধী আরো একটি গ্রহণ করলেন। এপ্রিল মাসে ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড দিল্লিতে একটি যুদ্ধসংক্রান্ত বৈঠক ডাকলেন। তিলক বা শ্রীমতী বেসান্তকে ডাকার কথাই ওঠেনা; শুধু গান্ধীকে ডাকলেন। তাঁকে বল্লেন, আপনি যদি সত্যিই মনে করেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্য মোটের উপর ভারতের পক্ষে শুভ, তাহলে সরকারের

এই বিপদে আপনি কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে দেবেন? গান্ধী এই বৈঠকে একটিমাত্র বাক্য বলেন এবং তাতেই যথেষ্ঠ সাড়া পড়ে, কারণ তিনি বাক্যটি বলেন হিন্দুস্থানীতে। এর আগে ঐরকম বৈঠকে ইংরেজি ছাড়া কেউ কোনো দেশীয় ভাষা ব্যবহার করেনি। পরে লর্ড চেমসফোর্ডকে তিনি একটি চিঠিতে জানান যে 'হোমরুল' সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না দিলে ভারতীয় জনগণ তুষ্ট হবেনা। তিনি অবশ্য যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বৃটিশরাজকে সাহায্য করবেন, কিন্তু সংগে সংগে "খেড়া" আন্দোলনও চালিয়ে যাবেন। তাঁর মতে, চম্পারণ সত্যাগ্রহ বৃটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টার পক্ষে বিঘ্ন তো নয়ই বরং সহায়ক হয়েছে। কিন্তু খেড়ায় ফিরে এসে খাজনা মঞ্জুর আন্দোলনের মধ্যে যখন গান্ধী সৈন্য সংগ্রহের কাজও হাতে নিলেন তখম কৃষকরা তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু সে সরাসরি সৈন্য দিয়ে নয়, স্ট্রেচারবাহক দিয়ে, আহত সৈনিকদের শুশ্রুষার ভার নিয়ে। অহিংস গান্ধীর পক্ষে এইভাবে সরাসরি যুদ্ধের সহযোগিতা করা কি ভাবে সম্ভব তা কেউ বুঝতে পারলোনা। গান্ধী দুএকটি যুক্তি যে না দেখালেন তা নয়। ইংরেজরা ভারতীয়দের নিরস্ত্র করে রেখেছে এবং কাপুরুষ বলে জাতির নামে কলংক দিয়েছে, সেই অপবাদ দুর করবার এই একটি সুযোগ। দ্বিতীয় যুক্তি হল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোমরুলের আশ্বাস যখন প্রত্যাশিত, তখন বৃটিশ শক্তিরই যদি পরাজয় ঘটে তবে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। বৃটিশ জিতলে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় খুব তাড়াতাড়ি "ডোমিনিয়ন স্টেটাস" দিয়ে দেবে; এই ব্যাপারে খেড়া থেকে যদি দশ হাজার সৈনিক সংগ্রহ করা যায় তবে খেড়ার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এতে কৃকদের মন গলানো গেলনা। সত্যাগ্রহের সময় স্বেচ্ছাসেবক, খাদ্য, পরিবহন দিয়ে যারা

সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল এখন সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে তারা একটুও এগিয়ে এল না, এমনকি পয়সা দিয়েও এদের কাছ থেকে যানবাহন সংগ্রহ করা গেলনা। গ্রামবাসীরা তাঁর সভায় এসে প্রশ্ন করতে লাগল, অহিংসার পূজারী গান্ধী কি করে তাদের যুদ্ধে যেতে বলছেন ? যুদ্ধ কি অহিংস ? তারা যে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করবে, বৃটিশ সরকার কি তাদের জন্য এপর্যন্ত কিছু করেছে ? তিলক তো রীতিমতো বিদ্রূপ করেই বল্লেন, তিনি পাঁচহাজার সৈন্য এখনই সংগ্রহ করে দেবেন, কিন্তু গান্ধী কি কথা দিতে পারবেন যে বৃটিশ সৈন্যদের সংগে ভারতীয় সৈন্যরা সমান মর্যাদা পাবে ? বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় ফল ফললো খুব সামান্যই। কিন্তু পরিশ্রমে, অনিয়মে, তাঁর শরীর ভেঙে পড়লো, এবং কয়েকমাস ধরে তিনি শয্যাগত হয়ে থাকলেন। গান্ধী গরুর দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। এবার ডাক্তারের নির্দেশ এবং কস্তুরবাঈয়ের পীড়াপীড়িতে ছাগ দুগ্ধ খেতে সম্মত হলেন। গান্ধী খেড়া থেকে এসে প্রথমে কিছুদিন অম্বালা সরা-ভাইয়ের কাছে থাকলেন এবং পরে সবরমতী আশ্রমে ফিরে গেলেন। এর কিছুদিন পরই প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হল।

১৯১৮ খৃঃ নভেম্বর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু স্বাধীনতা-কামী ভারতবর্ষে কোনো আশার আলো দেখা দিল না। ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষে রাজদ্রোহের অপরাধে বহু ধরপাকড় হয়েছে। বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত, শৌকত আলি, মহম্মদ আলি এবং আরো অনেকে জেলে, অনেক সংবাদপত্রের যুদ্ধকালীন সেন্সারশিপে প্রকাশ বন্ধ; গান্ধীজীর "হিন্দ স্বরাজ" ও "সর্বোদয়" বই দুটি বাজেয়াপ্ত। যুদ্ধের শেষে আবার নাগরিক অধিকারগুলি ফিরে পাওয়া যাবে এই ছিল স্বাভাবিক আশা। কিন্তু দেখা গেল শান্তির সময়েও বৃটিশ সরকার ভারতের উপর বজ্রআঁটুনি বজ্রদৃঢ়ই রাখতে চান। ১৯১৯ সালে মার্চমাসে দিল্লির লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে রাওলাট বিল পাশ হল। এই বিল অনুযায়ী "রাজদ্রোহে"র অপরাধের

৯

বিচার হবে জুরি ছাড়াই, এবং রাজদ্রোহের সন্দেহে বিনাবিচারে যেকোনো ব্যক্তিকে অন্তরীণ রাখা যাবে। "রাজদ্রোহ" বলতে কী বোঝাবে? অনেক কিছু। যথা পকেটে জাতীয়তাবাদী কোনো পুস্তক বা ইশতাহার রাখাই রাজদ্রোহ এবং তার জন্য শাস্তি দুবছরের জেল। এদিকে আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা এবং রুশিয়ার সফল বলশেভিক বিপ্লব ভারতবাসীর মনে নতুন আকাংখার জন্ম দিয়েছে। বৃটিশরা অপরের ঘরে প্রভু হয়ে বসে আছে, ভারতবর্ষে তাদের উপস্থিতিই একটা জাতীয় অপমান। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে অপর লোকের জন্য অপর লোক দিয়ে অপর লোকের শাসন। বৃটিশ রাজত্বে যদি ভারতীয়রা চরম সুখেও থাকতো তবু তাদের প্রতি ভারতীয়দের বিরূপতা দূর হতো না। পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার আকাংখা জাগবেই, এবং সাম্রাজ্যবাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে সাম্রাজ্য হারানো। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন-এর প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি ভারতবাসীর মনে নতুন আশা ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু "রাওলাট আইন" এই আশাকে চূর্ণ করে দিল।

চম্পারণ অভিজ্ঞতার পর এই আশাভংগে গান্ধীজী বুঝলেন বৃটিশ-রাজের সংগে ভারতবাসীর শক্তি পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। যে ইংরেজ-জাতির সংগে গান্ধীর পরিচয় হয়েছিল লণ্ডনে তাঁর ছাত্রাবস্থায়, উপনিবেশের মসনদে আসীন অত্যাচারী ইংরেজের সংগে তার কোনো মিল নেই। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সুবুদ্ধির উপর বরাবর আস্থা রেখেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে ক্রমশ আস্থাহীন করে তুলছিল। গান্ধী বড়লাটকে টেলিগ্রাম করে প্রস্তাবিত রাওলাট আইনের নিন্দা করলেন, অনুরোধ করলেন এই আইনটি যেন পাশ না করা হয়। গান্ধী আমেদাবাদে গিয়ে বল্লভভাই প্যাটেলের সংগে আলোচনা করলেন, রাওলাট আইন কী ভাবে প্রতিরোধ করা যায়। গান্ধী মনে করলেন, সত্যাগ্রহের শপথ

নেওয়া হবে প্রথম ধাপ। সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রমে আশ্রমিকদের দিয়ে তিনি এই শপথে স্বাক্ষর করালেন। এদের মধ্যে ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, অনসূয়া সরাভাই প্রভৃতি। গান্ধীকে সভাপতি করে বোম্বাইতে "সত্যাগ্রহ সভা" নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হল। বোম্বাইএর "ক্রনিকল" পত্রিকা এই সভার বুলেটিন নিয়মিত প্রকাশ করতে লাগলো ; দক্ষিণ আফ্রিকায় "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকার স্থান নিল ভারতের "ক্রনিকল" পত্রিকা। রাওলাট আইন কিন্তু তবু পাশ হল। গান্ধী অস্থির হয়ে উঠলেন। মুখ বুজে এ অপমান মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু কী করবেন? মান্দ্রাজে একদিন ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসলেন গান্ধীজী ; তাঁর সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে—দেশ জুড়ে জাতীয় হরতাল। ৩০শে মার্চ এক দিনের জন্য এই আইনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। কংগ্রেসীদের মধ্যে এনিয়ে যখন নানারকম দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, সংশয় সৃষ্টি হল ভারতবর্ষের সাধারণ নাগরিক হাজারে হাজারে এগিয়ে এল, ৩০শে মার্চের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল। দিল্লিতে হরতাল হবে ৩০শে মার্চ, এবং এক সপ্তাহ পরে ৬ই এপ্রিল হবে সারা ভারতে। শাসক শক্তি প্রথমে এই হরতালের ডাকে তেমন কিছু গুরুত্ব আরোপ করলেন না। কিন্তু এই হরতালে হিন্দু-মুসলিম সংহতির এক চমৎকার আবহাওয়া সৃষ্টি হল। আর্যসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে জুম্মা মসজিদে আমন্ত্রণ জানানো হল এবং সেখান থেকে তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করলেন, এবং বক্তৃতার পর এক বিরাট শোভাযাত্রা দিল্লির রাস্তায় পরিভ্রমণ কোরলো। ইংরেজ পুলিশ ও মিলিটারি সন্ত্রস্ত হয়ে গুলি চালালো। এই গুলিতে ন'জনের মৃত্যু ঘটলো, তারমধ্যে পাঁচজন হিন্দু ও চারজন মুসলমান। সরকারী রিপোর্টে এই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথাটি আতংকের সংগে উল্লেখ করা হল, কারণ উভয় সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও মনোমালিন্যের উপর ভিত্তি করেই ভাবী বৃটিশ শাসনের কলাকৌশল রচিত হয়েছিল ; এতে সেই প্ল্যান বিপর্যস্ত

হবার আশংকা দেখা দিল। এরপর ৬ই এপ্রিল সারা ভারতব্যাপী হরতাল পালিত হল। শহর গ্রাম সর্বত্র দোকানপাটে কেনাবেচা স্তব্ধ হয়ে গেল। ভারতের অর্থনৈতিক জীবন যে ভারতীয়দের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তার এমন জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ এর আগে কখনো পাওয়া যায় নি। এর ফলে ভারতবাসীর মনে দেখা দিল অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়। গান্ধী নিজে বোম্বাইতে এই হরতাল পালন করলেন; চৌপট্টি বীচে "মনিভবন"-এর সামনে বিরাট জনতা তাঁকে অভিনন্দন জানালো। গান্ধী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্থানীয় মসজিদে ভাষণ দিলেন। গান্ধী প্রস্তাব করলেন সত্যাগ্রহীরা বৃটিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত স্বদেশী তথাকথিত "রাজদ্রোহ" মূলক পুস্তক প্রকাশ্যে বিক্রি করবেন। এই উপলক্ষে গান্ধীর "হিন্দ স্বরাজ" ও "সর্বোদয়" বই দুটি নতুন করে ছাপা হল এবং পথে পথে বিক্রি করা হল। চার আনা দামের বই কেউ পঞ্চাশ টাকা দিয়েও কিনলেন। গান্ধী "মনিভবন" থেকে একটি বে-আইনি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। বে-আইনি, কারণ প্রকাশের পূর্বে এই পত্রিকা রেজিস্ট্রি করা হয়নি এবং পরেও করা হবেনা স্থির হল। এক কপি পত্রিকা পুলিশ কমিশনারের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু পুলিশ এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিলনা, কাউকে গ্রেপ্তারও কোরলো না। বোম্বাইতে হরতাল সম্পূর্ণ শান্ত থাকলেও ভারতবর্ষের সর্বত্র শান্তিপূর্ণ থাকেনি। রাওলাট বিরোধীরা সকলেই গান্ধীর অনুবর্তী এমন কথা মনে করার কারণ নেই। নানা জায়গায় হরতালের মধ্যে উচ্ছৃংখলতার প্রকাশ ঘটলো। পাঞ্জাবে দাংগাহাংগামা, ইটপাটকেল ছোঁড়া ও পুলিশের গুলি, এবং জনতা কর্তৃক ইংরেজপীড়ন অবাধে চললো এবং কংগ্রেস নেতা ডঃ সত্যপাল ও ডঃ কিচলু গান্ধীকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে বললেন। ৮ই এপ্রিল তারিখে গান্ধী দিল্লী অভিমুখে রওনা হলেন; কিন্তু মাঝ পথে পুলিশ তাঁকে বাধা দিল। পাঞ্জাবের লেফট্‌টেন্যান্ট গভর্ণর স্যার মাইকেল ও-ডায়ার গান্ধীর পাঞ্জাবপ্রবেশ অনুমোদন

করলেন না। গান্ধী বল্লেন, তিনি যাচ্ছেন দাংগা থামাতে, কিন্তু পুলিশ সেকথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে বোম্বাইতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। পাছে বোম্বাইতে পৌঁছালে কোনো বড় রকমের হাংগামার সৃষ্টি হয় এই ভয়ে পুলিশ বোম্বাই-এর আগেই ছোট একটি স্টেশনে গান্ধীকে নামিয়ে দিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই অতিরঞ্জিত আকারে সারা ভারতবর্ষে রটে গিয়েছিল যে পুলিশ গান্ধীকে গ্রেপ্তার করেছে। বোম্বাইতেও ছোট বড় অনেকগুলি লুঠপাঠ ও সংঘর্ষ ঘটলো। তার চেয়েও গুরুতর হাংগামা আমেদাবাদে ঘটেছে, এই খবর পেয়ে গান্ধী ছুটলেন আমেদাবাদে; এবং সবরমতী আশ্রমে ১৯ এপ্রিল তারিখে এক সভায় তিনি তাঁর অনুবর্তীদের চরম ভৎ´সনা করে বল্লেন, সত্যাগ্রহের নামে আমরা বাড়ীতে আগুন দিয়েছি, অস্ত্রশস্ত্র কেড়েছি, টাকা ছিনিয়ে নিয়েছি, ট্রেন থামিয়েছি, টেলিগ্রাফের তার কেটেছি, নিরীহ নিরপরাধ লোকের প্রাণ নিয়েছি, দোকানপাট ও গৃহস্থের ঘর লুঠ করেছি। আমি এর প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিন দিন অনশন পালন করবো। এই সময় রবীন্দ্রনাথও গান্ধীকে একখানি পত্র লেখেন; তাতে তিনি অভিযোগ করেন যে নৈতিক সংযম যেখানে অনুপস্থিত সেখানে এই ধরণের আইন অমান্য আন্দোলন বিপথগামী হতে বাধ্য।

গান্ধীকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হলনা, ফলে সেখানকার আগুন সমানেই জ্বলতে লাগলো। হরতালের সময় অমৃতসর অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকলেও এর পর গান্ধীকে পাঞ্জাবে নিমন্ত্রণ জানাবার অপরাধে সত্যপাল ও কিচলুকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করে অমৃতসর থেকে বহিষ্কৃত করলো তখন এই বহিষ্কারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও শোভাযাত্রা বেরোলো। এই শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ গুলী চালালো এবং বহু লোক হতাহত হল। স্বভাবতই জনতার ক্রোধ রুদ্রমূর্তি ধারণ কোরলো: বহু বাড়ীঘর অগ্নিসাৎ হল এবং কিছু ইংরেজকে হত্যা করা হল। কুমারী শেরউড নাম্নী একজন শিক্ষয়িত্রী নিগৃহীতা হলেন। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ

অমৃতসরে মিলিটারি তলব করলেন। ১১ই এপ্রিল তারিখে ব্রিগেডিয়ার-জেনারল রেজিনাল্ড ডায়ার ভারপ্রাপ্ত হয়ে এলেন। ডায়ার হুকুম জারি করলেন, কোনো সভা শোভাযাত্রা করা চলবেনা। এই হুকুম ইংরেজিতে জারি করা হল এবং তার ভাবার্থ সকলের কানে পৌঁছালো কিনা সে বিষয়ে ডায়ার ভ্রূক্ষেপ করলেন না। দুদিন খুব শান্ত থাকার পর ১৩ই এপ্রিল তারিখে বেলা একটার সময় ডায়ারের কাছে খবর এলো জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক দেয়ালঘেরা জায়গায় বিকেল সাড়ে চারটায় একটি সভা ডাকা হয়েছে। এটি ডায়ারের আদেশ না জেনে, অথবা জেনেশুনে অমান্য করবার জন্যই, ডাকা হয়েছে কি না তা ডায়ার বিবেচনা করা দরকার বোধ করলেন না। এই সভা বন্ধ করতে হলে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবেশপথ বন্ধ করে কাউকেই না যেতে দিলে চলতো। কিন্তু ডায়ার সভার পূর্বাহ্নে এজন্য পথে কোনো সৈন্য মোতায়েন করলেন না। বাগের একটিই প্রবেশ পথ ছিল, তাছাড়া চতুর্দিক ছিল প্রাচীর ঘেরা; অবশ্য প্রাচীরের দুয়েক জায়গা ভাঙাও ছিল এবং বহু লোক প্রবেশ পথ এড়িয়ে ঐ সব ভাঙা পথে বাগে প্রবেশ করেছিল। নির্দিষ্ট সময়ে প্রায় দশহাজার নরনারী সেখানে জমায়েত হয়েছিল; তাদের কারো সংগে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছিলনা। একজন বক্তা বাগের কেন্দ্রে একটি মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেছিলেন। এমন সময় খুব ভেবে চিন্তে, মনে মনে নিখুঁত সামরিক কায়দায় পরিকল্পনা করে, একমাত্র প্রবেশ পথ দিয়ে রেজিনাল্ড ডায়ার সেখানে এসে হাজির হলেন, সংগে পঁচিশ জন গুর্খা ও পঁচিশ জন বালুচ সৈন্য, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। দুটি সাঁজোয়া গাড়ীও এনেছিলেন কিন্তু সরু প্রবেশ পথে ঢুকতে পারেনি বলে সে দুটিকে বাগের বাইরে পথের ওপর রাখা হয়েছিল। ডায়ার একবারও জনতাকে সাবধান করলেন না, বা চলে যেতে বল্লেন না, তিনি সরাসরি সৈন্যদের উপর হুকুম দিলেন—"ফায়ার"। ত্রস্ত জনতার চীৎকার ও আর্তনাদের মধ্যে দশ মিনিট ধরে এক নারকীয়

হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হল। সৈন্যরা মোটেই এলোপাথাড়ি গুলি চালায় নি। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিপদের আশংকাই ছিলনা, অতএব ধীর স্থির ভাবে যেখানে যেখানে সবচেয়ে বেশি ভিড় সেই সব জায়গাতেই তাক করে করে বুলেট ছুঁড়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে দেড় হাজারেরও বেশি নরনারী গুলিতে ঘায়েল হল এবং মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৭৯! দশ মিনিটের যুদ্ধে বীর ডায়ার পৌনে চারশো নিরীহ নিরস্ত্র দুশমনের রক্তে মাটি রঞ্জিত করে ফিরে গেলেন; সহস্রাধিক আহত মাটিতেই পড়ে রইলো; তাদের চিকিৎসা বা শুশ্রূষার ভার কার উপর ন্যস্ত তা কেউ জানলো না!

এই ঘটনার কয়েকমাস বাদে ডায়ার ট্রেনে করে ক'জন অফিসার সহ প্রথম শ্রেণীর স্লীপারে অমৃতসর থেকে দিল্লিতে যাচ্ছিলেন; উপরের বার্থে একজন ভারতীয় শুয়ে ছিল, কিন্তু ডায়ার হয় তো লক্ষ্য করেন নি অথবা গ্রাহ্য করেন নি। ডায়ার সহযাত্রী অফিসারদের কাছে বড়াই করে জালিয়ানওয়ালাবাগের কার্যাদি সবিস্তারে বলছিলেন। গোটা জালিয়ানওয়ালাবাগই জ্বালিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল তার, নেহাৎ দয়া পরবশ হয়েই তা করেন নি! দিল্লিতে তিনি যখন প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলেন একবারও ওপরের বার্থে শায়িত তার একমাত্র ভারতীয় শ্রোতাটির কথা মনে পড়েনি। এই ভারতীয়টি আর কেউ নন, স্বয়ং জওহরলাল নেহেরু।

যেদিন অপরাহ্নে জালিয়ানওয়ানাবাগে এই নরমেধ সংঘটিত হচ্ছিল সেইদিন একই অপরাহ্নে আমেদাবাদে সবরমতী আশ্রমে গান্ধী ভারতীয়দের উপদেশ দিচ্ছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারা যেন হিংসাত্মক আচরণ না করে! এর চেয়ে নিয়তির পরিহাস আর কী হতে পারে! নিরস্ত্র ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সুশস্ত্র ইংরেজ শাসকরা যেন হিংসাত্মক আচরণ না করে, এমন উপদেশ দেবার মতো ইংরেজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোথাও ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু বৃটিশ মন্ত্রীসভায় বা দিল্লির বড়লাটের উপদেষ্টাদের মধ্যে কেউই ছিল না, কারণ এই

ঘটনার দুদিন পরই স্যার মাইকেল-ও-ডায়ার সারা পাঞ্জাবে সামরিক আইনজারি করলেন এবং পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর সংবাদ যাতে বাইরে না যেতে পারে সেজন্য কড়া সেন্সর ব্যবস্থা বলবৎ করলেন। আর অমৃতসরের ছোটো ডায়ার হুকুম জারি করলেন, বৃটিশ অফিসারদের গাড়ী বা ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াতে হবে, ছাতা বন্ধ করতে হবে এবং ইংরেজকে সেলাম করতে হবে ; কেউ এ হুকুম অমান্য করলে প্রকাশ্যে তাকে বেত মারা হবে। দুমাস ধরে সারা পাঞ্জাবে নরনারীর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হল, এমন কি এরোপ্লেন থেকে কৃষকদের গ্রামের উপর বোমা ফেলতেও শাসকদের বাধলোনা।

হিংসা ও দাংগা হাংগামার খবর প্রতিদিন গান্ধীর কাছে পৌঁছাতে লাগলো। হিংসা হিংসার জন্ম দেয়, গান্ধী তা জানতেন। পাঞ্জাবে সরকারী হিংসার প্রত্যুত্তরে আরো প্রতিহিংসা জাগরিত হবে এই আশংকায় গান্ধী শিউরে উঠলেন। তিনি মনে করলেন, সত্যাগ্রহীদের প্রস্তুত না করে, শিক্ষা না দিয়ে, তিনি যে ব্যাপক সত্যাগ্রহের আহ্বান দিয়েছিলেন সেটাই ছিল পর্বতপ্রমাণ ভুল, তাঁর নিজের ভাষায় "হিমালয়প্রমাণ ভুল"। অনিয়ন্ত্রিত, স্বতঃস্ফূর্ত, নীতিভ্রষ্ট প্রতিবাদ তার অভিপ্রেত নয়। যারা কখনো শৃঙ্খলা মানতে শেখেনি, আইন-মানার ডিসিপ্লিন যাদের রপ্ত হয়নি, তাদের পক্ষে আইন অমান্য করতে যাওয়া সাজে না। যে মনেপ্রাণে অহিংস নয়, গান্ধীর মতে সে সত্যাগ্রহী হবার অনুপযুক্ত এবং যে সত্যাগ্রহী নয়, আইন ভংগের নৈতিক অধিকার তার জন্মেনি। গান্ধী ১৮ই এপ্রিল বোম্বাইতে ফিরে এলেন এবং অসহযোগ আন্দোলন সাময়িক ভাবে স্থগিত বলে ঘোষণা করলেন। এজন্য গান্ধীর সমালোচকরা তাকে প্রকাশ্যে উপহাস কোরলো, সমর্থকরাও মনে কোরলো তাদের গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া হল! কিন্তু তবু এই সিদ্ধান্ত যে নৈতিক দিক থেকে সঠিক এ বিশ্বাসে গান্ধী অটল রইলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মন্তুদ কাহিনী কিন্তু সেন্সরশিপের কড়াকড়ি সত্ত্বেও লোকের জানতে

থাকি রইলো না। সত্য ঘটনা জানবার জন্য গান্ধী নিজে আরেকবার চেষ্টা করলেন পাঞ্জাবে যাবার জন্য। দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তক বলে ইংরেজরা গান্ধীর উপর ক্রুদ্ধ; আবার অন্যদিকে আন্দোলনের মাঝখানে ইংরেজবিদ্বেষী চরম আন্দোলনের নিবর্তক বলে পাঞ্জাবীরা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ। এবারও পাঞ্জাব সরকার তাঁর পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার নৃশংসতায় রবীন্দ্রনাথ এমনই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে একটি পত্র লিখে নাইট উপাধি পরিত্যাগ করলেন, এবং এই চিঠির নকল গান্ধীর কাছে পাঠালেন যাতে গান্ধী জনসভায় সেটি ব্যবহার করতে পারেন। এর অল্পকাল পরে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ পাঞ্জাব থেকে চাক্ষুষ বিবরণ সংগ্রহ করে আনেন এবং অক্টোবর মাসে গান্ধীও লাহোর যাবার অনুমতি পান। লর্ড হাণ্টারের অধীনে একটি সরকারী কমিটি নিযুক্ত হয় পাঞ্জাব ঘটনাবলীর রিপোর্ট তৈরি করতে এবং ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ একটা আলাদা কমিটি তৈরি করেন এই একই বিষয় অনুসন্ধানের জন্য। এই কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত থাকলেও ব্যাপক আন্দোলনের জন্য শিক্ষা দেওয়া ও জনচিত্ত তৈরি করার কাজটি গান্ধী অবহেলা করতে চাননি। দক্ষিণ আফ্রিকায় "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" সম্পাদনার মধ্য দিয়ে গান্ধী সেখানে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবারও একটি সুযোগ এল "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকার পরিচালকদের কাছ থেকে। রাজরোষে "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকার সম্পাদক হর্নিমানকে দেশত্যাগ করতে হল এবং "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকাটিও কিছুদিন পর বন্ধ করে দেওয়া হল। পরিচালকবর্গ এবার গান্ধীকে আহ্বান করলেন "ইয়ং ইণ্ডিয়া" নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক

সম্পাদনা করতে। তাদেরই একজন বন্ধু "নবজীবন" নামে একটি গুজরাতী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন, স্থির হল সেটিকেও সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত করে গান্ধীর তত্ত্বাবধানে আনা হবে। গান্ধীর অনুরোধে ও সুবিধার জন্য উভয় পত্রিকার প্রধান কার্যালয় আমেদাবাদে স্থানান্তরিত করা হল। অল্পদিনের মধ্যে দুটি কাগজের গ্রাহক সংখ্যা হল চল্লিশ হাজার এবং এদের বৈশিষ্ট্য হল দুটির কোনোটিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হতনা। এইভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও গান্ধী তাঁর স্বকীয়তা বজায় রাখলেন, এবং সারা ভারতে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করলেন।

যুদ্ধের অবসানে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালের আইনে ভারতের জন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করলেন। এতে এক ধরণের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল। প্রকৃত ক্ষমতা ভাইসরয় ও তাঁর কাউন্সিলের হাতেই রইলো, কিন্তু স্থির হল সীমিত ভোটাধিকারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে প্রাদেশিক শাসন কার্যের ভারপ্রাপ্ত হবেন। প্রাদেশিক গভর্ণরের অবশ্য ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে, আর থাকবে পুলিশ এবং অর্থ-বরাদ্দের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। মডারেট বা নরমপন্থী নেতারা চাইলেন এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখতে। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিরোধিতা করলেন। বল্লেন, এর মধ্যে "স্বরাজ" কোথায়? এতে ভারতীয়দের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা কোথায়? মিঃ জিন্না এবং বালগংগাধর তিলকও দেশবন্ধুর মতে মত দিলেন। এমন কি অ্যানি বেসান্তও এদের সুরে সুর মেলালেন।

ডিসেম্বর মাসে রক্তাক্ত পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরেই কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। গান্ধীও এলেন অধিবেশনে যোগ দিতে। তিনি নরম ও গরম পন্থীদের মধ্যে একটা আপোষ রফা করলেন। দ্বৈত শাসন আপাতত গ্রহণ করা হবে স্থির হল। এর অল্প কিছুদিন আগেই তিনি শৌকত আলি ও মহম্মদ আলির মুক্তির জন্য বড়লাটের কাছে দরবার করে সফল হয়েছেন এবং নভেম্বর মাসে দিল্লিতে জিন্না

ও আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে গঠিত খিলাফত সম্মেলনে যোগ দিয়ে এসেছেন। সেখানে অবশ্য তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে খিলাফত কমিটির আবেদন যদি বৃটিশ সরকার না শোনেন এবং পরাজিত তুরস্কের উপর ইংরেজ যদি কোনো অপমানকর শর্ত আরোপ করেন, তাহলে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান প্রজা একযোগে বৃটিশের সংগে অসহযোগ করবে। কী করে অসহযোগ বা নন-কো-অপারেশন করতে হয় জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পর "নাইট" উপাধি ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সরকারী কর্মচারীরা যদি এক-যোগে পদত্যাগ করে, তবে তাতে অসহযোগের নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারে। অসহযোগ আন্দোলন আইন-অমান্য আন্দোলনের মতো "যুদ্ধং দেহি" নয়, এর মূল জোর হচ্ছে নৈতিক প্রতিবাদের। কিন্তু মাত্র একমাস আগে যিনি ইংরেজ সরকারকে অসহযোগ আন্দোলনের হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন, তিনিই কী করে ইংরেজের সংগে সহযোগিতা করতে অগ্রণী হলেন তা লোকে ভাল করে বুঝতে পারলোনা। ১৯২০ সালে জানুয়ারি মাসে খিলাফত ডেপুটেশনের সংগে গান্ধী ভাইসরয়ের কাছে গেলেন, কিন্তু বিশেষ ফল হলনা। মে মাসে মহাযুদ্ধের অবসানে সন্ধির শর্ত ঘোষিত হল। দেখা গেল ইংরেজ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিক্রিয়ার কথা গ্রাহ্যই করেননি। অতএব অগস্ট মাসের পয়লা তারিখ থেকে অসহযোগ শুরু হবে স্থির হল। ৩১শে জুলাই তারিখে বোম্বাই থেকে মর্মান্তিক খবর এল, মহামান্য তিলকের মৃত্যু হয়েছে। তিলকের মৃত্যুতে নেতৃত্বে যে শূন্যস্থান দেখা দিল সেটি পূরণ করতে এগিয়ে এলেন গান্ধী নিজেই। পয়লা অগস্ট তারিখে বড়লাটের কাছে একটি চিঠি লিখে গান্ধী তাঁর কাইজার-ই-হিন্দ্ পদকটি ফিরিয়ে দিলেন। বৃটিশ সরকার অন্যায়ের পথে, পাপের পথে, এগিয়ে চলেছেন, অতএব গান্ধী ঘোষণা করলেন তাঁকে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। খিলাফতীদের সভায় তিনি তাঁর অসহযোগ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে বল্লেন যে অসহযোগ আন্দোলনে কয়েকটি স্তর থাকবে।

প্রথমে খেতাব বা সম্মান ত্যাগ; তারপর ছাত্রছাত্রীদের সরকারী কলেজ বর্জন; উকিল ব্যারিস্টার ও অন্যান্য আইনজীবীদের বৃটিশ আদালত ত্যাগ; নূতন আইনসভা বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্যপদপ্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার; ভোটারগণ কর্তৃক নির্বাচন বর্জন করা, বিদেশী কাপড় বয়কট ইত্যাদি। স্বদেশী কলেজ, স্বদেশী কাছারি, এবং সুতাকাটা ও স্বদেশী কাপড়ের প্রচলন, এগুলিও কর্মসূচির মধ্যে রইলো। কিন্তু শুধু খিলাফতের অজুহাত দেখিয়ে এত ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় না। মতিলাল নেহরু ব্যাপারটি সহজ করে বল্লেন, আমাদের লক্ষ্য "স্বরাজ", অন্যান্য সব কর্মসূচিই আমাদের স্বরাজ অর্জনের উপায় মাত্র। আমরা স্বরাজ লক্ষ্য করেই অসহযোগ আন্দোলন চালাবো। গান্ধী ঘোষণা করলেন, সকলের সহযোগিতা পেলে এক বৎসরের মধ্যেই তিনি "স্বরাজ" আনতে পারবেন।

"ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় গান্ধী লিখলেন, "আমার মনে হয় কাপুরুষতার চেয়ে হিংসা অনেক ভালো। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি যে বীরের অহিংসা, কাপুরুষতা ও হিংসা উভয়ের চেয়েই ভালো।" অমৃতসর কংগ্রেস তাঁর "অহিংসা" বাহ্যত স্বীকার করেছিলো শুধু এই কারণে যে সন্ত্রাসবাদ ও গঠনতন্ত্রবাদ দুয়ের প্রতিই জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। নিরস্ত্র জনতার পক্ষে সহিংস অভ্যুত্থান কী করেই বা সম্ভব? অতএব অহিংস অসহযোগের অস্ত্রটি নিয়ে গান্ধী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর নীতির মধ্যে নরম ও চরম দুয়েরই প্রতি-ফলন রইলো; নরমপন্থা দিয়ে তিনি আরম্ভ করছেন, কিন্তু প্রয়োজনে চরমপন্থাও প্রয়োগ করবেন, তবে সেক্ষেত্রে চরমপন্থাটি হবে সম্পূর্ণ অহিংস।

প্রাদেশিক কাউন্সিলের নির্বাচনের সময় প্রশ্নটি বিশেষ করে দেখা দিল। মুক্তিকামীরা কী করবেন? নির্বাচনে অংশ নেবেন, অথবা নির্বাচন বয়কট করবেন? অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীর প্রচেষ্টাতেই

নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসে, গান্ধীর প্রচেষ্টাতেই, বিপরীত প্রস্তাব গৃহীত হল। কংগ্রেস সভ্যদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হল তারা যেন ইংরেজদের তৈরি কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, পৌর সর্বপ্রকার শাসনতান্ত্রিক সংস্থার বাইরে থাকেন। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত অবশ্য তীব্র ভাষায় গান্ধীর অসহযোগ-নীতির নিন্দা করেন এবং একে "ভারতের আত্মহত্যা" বলে বর্ণনা করেন। কংগ্রেস কর্তৃক কাউন্সিল ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বয়কট করার পর ডিসেম্বরে বসলো নাগপুর অধিবেশন। চিত্তরঞ্জন দাস ও লাজপত রায় মূল প্রস্তাব পেশ করলেন, গণ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস পা বাড়াবে, প্রয়োজন হলে আইন অমান্য আন্দোলনও আরম্ভ করবে। তবে এখনই নয়। তার আগে তিলকস্মৃতি বা স্বরাজ ফাণ্ডে এক কোটি টাকা তোলা হবেই। সমগ্র আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার নেবেন মহাত্মা গান্ধী। কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্রও এই সময় গৃহীত হল। গান্ধী তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা অনুসারে কংগ্রেসের জন্য একটি সর্বক্ষণের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলেন। কিন্তু গান্ধী নিজে কংগ্রেসের সমস্ত পদ থেকে বাইরে রইলেন, এইভাবে বাঁধাধরা সাংগঠনিক কাজের বাইরে থাকায় তাঁর ব্যক্তিগত নৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রইলো। নাগপুর কংগ্রেসে স্বরাজের লক্ষ্যটিকে খুবই কাছের জিনিষ বলে তুলে ধরা হল, এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে সম্ভব না হলে সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে, এই ঘোষণা করা হল। অসহযোগের এই প্রস্তাব পাশ হলে মহম্মদ আলি জিন্না গান্ধী-নেতৃত্বে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। প্রত্যয়ীর সুরে গান্ধী ঘোষণা করলেন, একবছরের মধ্যেই স্বরাজ এনে দেবো, কিন্তু কথা দাও আমার নির্দেশ মতো চলতে প্রস্তুত থাকবে। বহুদিন পর সুভাষচন্দ্র বসুও বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের

স্বাধীনতা দেবো।" কোনো প্রাপ্তিই নিঃশর্ত নয়। কিন্তু কোটি কোটি মানুষ এক ভাবে, এক প্রাণে, কোনো শর্তই পূরণ করতে পারে না। ফলে চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে দেখা দেয় দুস্তর ব্যবধান, আসে হতাশা, অবিশ্বাস, অধৈর্য। পরাধীন দেশের মানুষের কাছে "স্বরাজ" কথাটির একটি জাদু বা মাদকতা আছে। "স্বরাজ" বা স্বাধীনতার দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাই দেওয়া হোক না কেন, শৃংখলিত জনগণ অভিজ্ঞতা ও অভীপ্সা অনুযায়ী নিজেদের ব্যাখ্যা নিজেরাই করে নেয়। তারা গান্ধীর "মুক্তি" সম্বন্ধে ধারণা কি, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, কারণ তাদের নিজস্ব ধারণা ও যুক্তিই যথেষ্ঠ উদ্দীপক। তারা তো নিজেদের মুক্তির কথাই প্রথমে ভাববে এবং তা নিশ্চয়ই নিজেদের মতো করেই ভাববে। ক্ষুধার্ত মানুষ অন্ন চায় নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই। উৎকৃষ্ট খাদ্যের দর্শন নেতার কাছেই থাকুক, নিকৃষ্ট আহারেও জনসাধারণের অরুচি নেই, কারণ তারা অনাহারে ক্লিষ্ট। একেবারে গান্ধীজীর মতো করে জনসাধারণ উচ্চ আধ্যাত্মিক অর্থে "স্বরাজ"-এর চিন্তা করবে এটি আশা করাই অবাস্তব। কিন্তু গান্ধী এই অসম্ভব আশার উপরই তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক রণকৌশল গড়ে তুলেছিলেন। অগণিত ভারতবাসী যখন তাঁর "স্বরাজ" এর প্রতিশ্রুতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল, তারা কিন্তু নিজেদের মতো করেই স্বরাজের স্বপ্ন দেখছিল। "বিশুদ্ধ" স্বরাজের চর্চার সময় বা স্পৃহা তাদের ছিলনা। ইংরেজদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়াকেই তারা স্বরাজ বলে জেনেছে, এবং গান্ধীর কথাতেও তারা তার চেয়ে বেশি কিছু বোঝেনি। গান্ধী নিজের লেখা "হিন্দ্ স্বরাজ" গ্রন্থে যে-স্বরাজের উপর জোর দিয়েছেন, তা মোটেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, কোনো বিশেষ শাসনব্যবস্থাও নয়, তা একটি মানসিক অবস্থা এবং তা রাতারাতি রূপায়িত হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যে, ১৯২১ সালের মধ্যেই, যে-স্বরাজ তিনি আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন

তা "রাজনৈতিক স্বাধীনতা" ছাড়া আর কী হতে পারে? গান্ধী স্পষ্ট করে বল্লেন না, তিনি হিন্দ্ স্বরাজ-এর ধারণা পরিত্যাগ করেছেন কিনা। শুধু বল্লেন, এক বছরের মধ্যে "স্বরাজ" হবে, যদি কয়েকটি শর্ত পালিত হয়। শর্তগুলির কোনোটিই সহজসাধ্য নয়, এবং রাতারাতি পালিত হবে এমন আশাও করা যায় না। শর্তগুলি হচ্ছে এই যে, শৃংখলা মানতে হবে, অহিংস হতে হবে, হিন্দুমুসলমানের বিভেদ ভুলতে হবে, প্রত্যেক ঘরে চরকা চালু করতে হবে, বিদেশী কাপড় ছাড়তে হবে, অস্পৃশ্যতা দূর করতে হবে, মাদক দ্রব্য বর্জন করতে হবে ইত্যাদি। একটু ভাবলে বোঝা যাবে যে, গান্ধী প্রকৃতপক্ষে যেন-তেন-প্রকারেণ জোড়াতালি-দেওয়া স্বাধীনতার কথা ভাবছিলেন না, স্বরাজ অর্জনের প্রচেষ্টাকেই তিনি বলিষ্ঠ ও বেগবান করতে চাইছিলেন। "স্বরাজ" কথাটির মধ্যে যে জাদু আছে সেটিকে তিনি পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। আন্দোলনের মাধ্যমে যাতে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর একটি জাতি গড়ে ওঠে, সেটিই তাঁর কাম্য ছিল। শুধু অন্নবস্ত্র নয়, ক্রমশ স্কুল কলেজ, শিল্প, আইন আদালত, পুলিশ, আত্মরক্ষা সব কিছুর জন্য ইংরেজ শাসনের মধ্যেই ইংরেজ শাসনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জনগণের একটি বিকল্প বা সমান্তরাল ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেটিই হবে প্রকৃত স্থায়ী স্বাধীনতা। প্রত্যেক বিষয়ে স্বাধীন বা আত্মনির্ভরশীল হতে পারলে, সবগুলির যোগফলই হবে পূর্ণ স্বাধীনতা। ইংরেজদের থাকা তখন না-থাকারই সমান হয়ে যাবে।

"স্বরাজ" সাধনার একবছর সারা ভারতবাসীর কাছে চরম অধৈর্যের বছর। ক্যালেণ্ডারের বারোটা পাতা উল্টালেই স্বরাজ! স্বরাজের এমন শর্টকাট, এমন অবশ্যম্ভাবিতার চিত্র, একটি কথার মধ্যে সমস্ত জাতির স্বপ্ন এমন করে আগে কখনো ধরা পড়েনি! স্বরাজের সাধনা থেকে বিপথগামী করার জন্য সরকার বাহাদুরেরও চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা। স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধীদের উপর অজস্র খেতাব ও

পদক বর্ষিত হচ্ছিল। পুরস্কার বা উপাধি প্রত্যর্পণের সংখ্যা যেখানে পাঁচ, অর্পণের সংখ্যা সেখানে পঞ্চাশ। সম্মানলোভী উপাধিধারীদের কাছে গান্ধী হারছিলেন। কিন্তু গান্ধী জিতছিলেন অন্যত্র। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা তাঁকে জেতাচ্ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ডাকে তারা হাজারে হাজারে হরতাল পালন করছিল, বিদেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জন করে স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছিল। প্রকৃত পক্ষে তারাই বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। গান্ধী বাংলা-দেশের তরুণ তরুণীদের অভিনন্দন জানিয়ে তরুণ বাংলার প্রতি আশীর্বাদ পাঠালেন। অনেক তরুণ লেখাপড়া ছেড়ে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হল। গান্ধী তাদের সুতো কাটতে এবং গ্রামে যেতে বললেন। অন্যেরা স্বদেশীদের তৈরি এবং মাতৃভাষায় পরিচালিত স্বাধীন শিক্ষায়তনে নূতন করে নাম লেখালো। গান্ধী আমেদাবাদে গুজরাত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন, এবং বাংলাদেশেও কলকাতায় একটি জাতীয় কলেজ স্থাপিত হল। এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হলেন পঁচিশ বছরের তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি সরকারীভাবে স্বীকৃত না হওয়ায় কর্মক্ষেত্রে বা জীবিকার ক্ষেত্রে তার কোনো দাম থাকবে না। অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ এবং ম্রিয়মাণ হলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই স্কুল কলেজ ত্যাগের হিড়িককে হুজুগ বলে বর্ণনা করলেন। স্বদেশী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাকে তিনি পূর্ণ সমর্থন ও অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠান গড়ে না তুলে আগেই হাজার হাজার ছাত্রকে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তন বর্জনের জন্য ডাক দেওয়া তিনি সমর্থন করতে পারলেন না। স্বাদেশিকতার নাম করে সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগির প্রশ্রয় দেওয়া রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনও স্বাধীন ধাঁচে গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কিন্তু অসহযোগ রাজনীতিতে তাঁর সায় ছিল না। গান্ধী নিজস্ব ভংগিতে রবীন্দ্রনাথের জবাব দিলেন। তিনি বল্লেন, এই বর্জনের ফলে, সাময়িকভাবে ছাত্রদের যে ক্ষতি

হচ্ছে সেটা বিচলিত হবার মতো কিছু নয়। কিন্তু তারা নৈতিক দিক দিয়ে যে উৎকর্ষ অর্জন করছে সেটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বই-পড়া বিদ্যা সম্বন্ধে গান্ধীর কোনোদিনই উচ্চধারণা ছিলনা, ইংরেজদের তৈরি কলেজের পড়াশুনা সম্বন্ধেও তাই, বিশেষত শিক্ষার মাধ্যম যেখানে ইংরেজি। ইংরেজি কলেজগুলির কাজ হচ্ছে শাসকদের সুবিধার জন্য কেরাণী ও দোভাষী তৈরি করা। অসহযোগ একটি নেতিবাচক নীতি, কবিগুরুর এই অভিযোগের জবাবে তিনি বললেন, উপনিষদে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ পরিচিতি হচ্ছে "নেতি" ; অথচ ব্রহ্মের চেয়ে "ইতি" আর কী আছে ? তেমনি পরাধীন ভারতের এই যে নেতিবাচন, এই যে অসহযোগ, একে একটা প্রকাণ্ড অর্থবহ ইতি হিসাবেই গণ্য করতে হবে। শুধু আইন অমান্য নয়, আইনজীবীদের একযোগে আদালত বর্জনের ডাক দিলেন গান্ধী। সাড়া মিললো, কিন্তু যথেষ্ট নয়। অনেক সেরা আইনজীবী কোর্ট ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। গান্ধীর স্বরাজ ধর্মে দীক্ষিত হলেন মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লবভাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচারি—কিন্তু কোর্ট কাছারি তাতে অচল হয়ে পড়লো না। গান্ধী কিন্তু একটুও হার স্বীকার করলেন না। কংগ্রেসের জন্য এক কোটি সদস্য সংগ্রহ করতে হবে বলে তিনি ঘোষণা করলেন এবং অচিরেই ষাট লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করলেন। তেমনি তিলক ফাণ্ডের জন্যও এককোটি টাকা তুলবার প্রতিজ্ঞা নিলেন এবং এক বছরের মধ্যেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেলেন। ছাত্রদের মধ্য থেকে জাতীয় ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়লেন, এবং গ্রামে গ্রামে জাতীয় সংগঠন গড়ে উঠতে লাগলো। গ্রামবাসীদের কাছে গান্ধীর আবেদন ছিল —চরকা কাটো। স্বেচ্ছাসেবকরা চরকা ও জনশিক্ষার প্রসারে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে, পর্দার বিরুদ্ধে, অকমণ্যতার বিরুদ্ধে তারা সমানে প্রচার করতে লাগলেন। এই সময় গান্ধী-স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এগিয়ে এলেন এক অপ্রত্যাশিত মানুষ—আবদুল গফ্ফর খাঁন। উত্তর

পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এই দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ পাঠান সর্দার সীমান্তের পাঠান উপজাতিদের মধ্যে অহিংসা প্রচারের ভার নিলেন। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতিও যথেষ্ঠ বাড়লো। স্বেচ্ছায় মুসলমানেরা গো-হত্যা বন্ধ রাখলেন এবং হিন্দুরা মসজিদের কাছে বাজনা থামালেন। শ্রমিক অঞ্চলেও হরতালের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। সুদূর আসামের চা-বাগানে চা-শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন। মাসের পর মাস গান্ধী গ্রাম গ্রামান্তরে পদব্রজে ভ্রমণ করতে লাগলেন। ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাম এই ভাবে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অংগীভূত হলো। দীর্ঘ গ্রামপরিক্রমার সময় "ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও "নবজীবন" পরিচালনার ভার রইলো মহাদেব দেশাইয়ের উপর। গান্ধী শুধু আন্দোলনের ব্যাখ্যা হিসাবে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন, এবং এগুলি ভারতবর্ষের সব বড় বড় কাগজেই পরে পুনঃপ্রকাশিত হত।

অসহযোগ বিস্তৃত হল ঠিকই। কিন্তু ঘোষিত এক বছরের যখন ছ-মাস কেটে গেল এবং বৃটিশ শাসন ভেঙে পড়বার কোন ইংগিতই প্রকট হল না, লোকে একটু একটু অধৈর্য বোধ করতে লাগলো। সুভাষচন্দ্র বিলেত থেকে ফেরার পথে বোম্বাইতে গান্ধীর সংগে দেখা করলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের বিষয় নিয়ে তাঁর সংগে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় প্রত্যয় হল, গান্ধী চরমপন্থা কখনোই প্রয়োগ করবেন না। তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন, যদিও গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর কমলো না।

জুলাই মাসে করাচিতে খিলাফত কমিটির বৈঠক বসলো। তুরস্কের সুলতানের উপর বৃটিশের খবরদারির প্রতিবাদে আলি ভাইয়েরা আন্দোলন তীব্রতর করতে চাইলেন। কমিটি জানালেন মুসলমানেরা যেন পুলিশ ও সৈন্য বিভাগে চাকরি না নেন, এমন কি যারা ইতিমধ্যে নিয়েছেন তারা যেন তা পরিত্যাগ করেন। হুমকি দেওয়া হল যে, কোনো প্রতিবিধান না হলে ঐ বছরের শেষেই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে

ভারতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হবে। গান্ধীর "এক বছরে স্বরাজ"-এর স্লোগানকে এঁরা বাস্তব প্রয়োগের দিকে টানলেন। মালাবার উপকূলে নিপীড়িত মুসলিম উপজাতি মোপলারা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। তারা নির্ধারিত সময়ক্ষণের জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কোরলো, এবং শুধু ইংরেজই নয় তাদের সহযোগী বহু হিন্দু জমিদার ও মহাজনদেরও হত্যা কোরলো। মোপলা সন্ত্রাসে গান্ধী খুব বিপর্যস্ত বোধ করলেন। তিনি চাইলেন মোপলাদের সংগে সরাসরি কথা বলতে, কিন্তু বৃটিশ-সরকারের কাছ থেকে অনুমতি মিললো না। সরকার মোপলা বিদ্রোহ খুব নির্মমভাবে দমন করলেন। গান্ধীর সমালোচকরা সবকিছুর জন্য গান্ধীকেই দায়ী করতে লাগলেন। তারা বল্লেন, চরকা একটা ভাঁওতা, তিলক ফাণ্ডের টাকা দিয়ে গান্ধীভক্তরা মজা লুটছে, ইত্যাদি। গান্ধী দমলেন না। তিনি তখনও বল্লেন, এখন আইন অমান্যের কোনো কথাই নয়, স্বদেশী কার্যক্রমের উপর জোর দিয়ে অসহযোগের নীতিকে জয়যুক্ত করাই এখন প্রধান কাজ। তিনি নিয়ম করলেন, স্বদেশী কাপড় যিনি পরবেন না তিনি কংগ্রেসী হতে পারবেন না। তিনি বল্লেন, তিন মাসের মধ্যেই কাপড়ের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে স্বয়ং-নির্ভর হতে হবে। ৩১শে জুলাই বোম্বাইতে এক জনসভায় গান্ধী সর্বপ্রথম বিদেশী কাপড়ের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করলেন। এই বস্ত্রদাহ জনতার মধ্যে এক নূতন উৎসাহ সৃষ্টি করলেও অনেক খাঁটি মানুষকে ব্যথিতও কোরলো। মিঃ এণ্ড্রুজ যিনি নিজে খাদিবস্ত্র ছাড়া কিছুই পরতেন না প্রতিবাদ করে বল্লেন, যেসব সুন্দর বস্ত্র পোড়ানো হল সেগুলি গরীবদের মধ্যে বিলি করলেও কাজ হত। গান্ধী জবাব দিলেন, তাতে গরীবদের আরো অপমানই করা হত। যাদের বস্ত্র নেই বস্ত্র দিয়ে তাদের দয়া করার প্রয়োজন নেই, তাদের কাজ দিতে হবে, তাহলেই তাদের খাদ্য বস্ত্র সবই দেওয়া হবে। চরকা সেই কাজ। তারপর প্রতি সপ্তাহে প্রতি জনসভায় এই বিলিতি কাপড় পোড়ানোর

যজ্ঞ চলতে লাগলো এবং বলা বাহুল্য সংগে সংগে চরকা প্রচারের কাজও। চরকা ক্রমশ একটা ধর্মানুষ্ঠানের রূপ নিতে থাকলো। চরকা ধ্যান, চরকা জ্ঞান, চরকাই মুক্তি, এই হল নব নামপ্রচার। চরকা কাটার অন্য নাম হল "সূত্রযজ্ঞ"। গান্ধী রবীন্দ্রনাথকেও আহ্বান করলেন এই সূত্রযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার প্রতি শুভেচ্ছা নিবেদন করলেন, কিন্তু অন্ধ হুজুগ ক্রমাগত অনুসরণ করলে তাতে মন অনুদার হয়ে পড়ে এই সাবধান বাণীও উচ্চারণ করলেন। "আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিজ্ঞান এবং অনুধাবনেরও প্রয়োজন।" রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি কবির মতোই বল্লেন, পাখি কি শুধু খাবার খাবে, গান গাইবে না? গান্ধী "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে এক প্রবন্ধে এর উত্তর দিলেন। গান্ধীকে রবীন্দ্রনাথ "মহাত্মা" সম্বোধন করেছেন, গান্ধীও রবীন্দ্রনাথকে জাতির "মহান প্রহরী" বা গ্রেট সেন্টিনেল বলে সম্বোধন করলেন। তিনি বল্লেন, ভয়েই হোক বা আশার সূচনাতেই হোক, দাস মনোবৃত্তি ও অন্ধ হুজুগের প্রতি আনুগত্যের বিরুদ্ধে কবির এই মুখর প্রতিবাদ আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে। কবি যে সত্য এবং যুক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন এর জন্য সমস্ত জাতি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু দেশব্যাপী স্বরাজ সাধনের যে আন্দোলন চলছে তাকে অন্ধ আবেগের আনুগত্য ও যোগফল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঘরে যখন আগুন লাগে তখন গৃহবাসীরা সকলেই ঘরের বাইরে আসে, প্রত্যেকেই জলের বালতি হাতে নিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করে। চারপাশে যখন সকলে অন্নাভাবে মারা যাচ্ছে, তখন আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া। অর্থনীতি ও নীতির মধ্যে খুব একটা ব্যবধান টানা যায় না। চরকা শুধু অর্থনৈতিক সমাধান নয়, নৈতিক শক্তিরও আশ্রয়। গান্ধী বল্লেন, আমি গরীবদের দয়ালু পৃষ্ঠপোষক বা পেট্রন হতে চাইনা, যে-শোষণে তারা শোষিত সেই শোষণের আমিও অংশীদার এই কথা জেনে আমি চাই তাদের সুযোগ

করে দিতে; খাদ্যের উচ্ছিষ্ট বা পরিত্যক্ত পোষাক নয়, আমি চাই তারা আমার সবচেয়ে ভালো খাবার ও পরিচ্ছদের অধিকারী হোক এবং হোক আমার সংগে একই কাজের সমান অংশীদার। কোটি কোটি ক্ষুধার্ত ভারতবাসী এখন একটি কবিতাই কবির কাছে দাবী করে, সেটি হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্য।

সেপ্টেম্বর মাসে আলি ভাইদের গ্রেপ্তার করা হল। অক্টোবর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলেন যে-শাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক হীনতার জন্য দায়ী তার অধীনে ভারতীয়দের চাকরি নেবার কোনো অর্থই হয় না। কংগ্রেসকর্মীরা আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য দাবী জানাতে লাগলেন। এই দাবী আরো সোচ্চার হল আয়ার্ল্যাণ্ডে সিনফিন আন্দোলনকারীদের সাফল্যে। কিন্তু গান্ধী সায় দিলেন না। অন্যান্য প্রদেশে প্রস্তুতি শুরু হল, কিন্তু গান্ধী পরীক্ষামূলক ভাবে মাত্র একটি জেলাতে ভূমি-রাজস্ব ধর্মঘট চালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। গুজরাতের বর্দৌলি জেলা হবে এই পরীক্ষাস্থল। নভেম্বর মাসে ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস বা রাজকুমার-এর ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করলেন, এবং নির্দেশ দিলেন, প্রিন্স অব ওয়েলসের জন্য আয়োজিত প্রত্যেকটি সম্বর্ধনা সভা বর্জন করতে হবে। বোম্বাইতে প্রিন্স অব ওয়েলসের সম্বর্ধনা নিয়ে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। ধনী-পার্টিরা সম্বর্ধনায় যোগ দিতে গেলে তাদের উপর আক্রমন চালানো হল শহরে দাংগা বাধলো এবং কয়েকজন পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা করা হল। এই সময় গান্ধী বোম্বাইতে ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে এই হিংসাত্মক ঘটনাবলী দেখলেন। বর্দৌলিতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলে যদি এরকম দাংগা হাংগামা আরো ঘটে তাহলে কী হবে? গান্ধী ভাবতে শুরু করলেন। তিনি মনে করলেন তাঁর নিজেরই চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। বোম্বাইতে হিংসাত্মক মনোভাবের প্রতিবাদে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

রক্ষার জন্য তিনি অনশন শুরু করলেন, এবং আপাতত বর্দৌলি সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখলেন। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে রাজশক্তি পালটা আঘাত হানতে শুরু কোরলো। ব্যাপকভাবে ধরপাকড় চললো এবং নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, লাজপত রায়, আজাদ সকলেই গ্রেপ্তার হলেন। কংগ্রেস বা স্বরাজ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনি বলে ঘোষিত হল। যাদের ধরা হল তাদের কেউই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন কোরলেন না, কারণ বৃটিশ আদালতকেই তারা স্বীকার করেন না। দু-মাসেই গ্রেপ্তারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো তিরিশ হাজার।

১৯২১ পেরিয়ে ১৯২২ সাল শুরু হল, কিন্তু স্বরাজ এল না। গান্ধীর উপর স্বরাজ আন্দোলনের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া আছে, কিছু করা না করা সবই তাঁর উপর; কারণ তিনিই সত্যাগ্রহীদের ডিক্টেটর। খিলাফত পন্থীরা আইন অমান্য ছাড়া কোনো পথ দেখতে পাচ্ছিলেন না। কংগ্রেসের একটি বড়ো অংশও তাই চাইছিলেন। সারা দেশে শাসক ও শাসিত সকলেই উৎকণ্ঠ। মহম্মদ আলি জিন্না, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একটা আপোষ রফার জন্য সচেষ্ট হলেন। বড়লাট সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিয়ে গান্ধীর সংগে আলোচনায় বসতে রাজী হলেন; কিন্তু গান্ধী আলোচনার এমন কয়েকটি প্রাক্-শর্ত আরোপ করলেন যা ভাইসরয়ের পক্ষে স্বীকার করা তখন অসম্ভব। একটি শর্ত হল, পিকেটিং করাকে আইনি বলে স্বীকার করতে হবে। গান্ধীজী এরপর কী করবেন ভাবতে লাগলেন। কিন্তু মোপলা বিদ্রোহের মতো গুন্টুর জেলার কৃষকরা বর্দৌলির আগেই ১২ই জানুয়ারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করে দিল। গান্ধী এই আন্দোলন সমর্থন করলেন। ২৯শে তারিখে বর্দৌলির সত্যাগ্রহীরা ট্যাক্স সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলো, তিনি এই আন্দোলনও সমর্থন করলেন। গান্ধী ১লা ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড রীডিংকে লিখলেন, তাঁর দাবীগুলি মানা না হলে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি

বর্দৌলি জেলায় সার্বিক আইন-অমান্য আন্দোলনের আহ্বান জানাবেন। দাবীগুলির প্রকৃতি একটু অদ্ভুত। কিছু সামান্য, কিছু অসামান্য। লোকে যে-সব দাবীর কথা ভাবছিল—খিলাফত, স্বরাজ, ইত্যাদি সম্পর্কিত যে-সব দাবীর সপক্ষে গান্ধী নিজেও অনেক বলেছেন—সে সব কিছুই নয়। তিনি চাইলেন, সব বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক। এটি সামান্য দাবী। এই সংগে অসামান্য দাবী হল, সর্বপ্রকার অহিংস কার্যক্রম সর্বত্র বিনা বাধায় করতে দেওয়া হোক। শুনতে খুবই নিরীহ, কিন্তু এর তাৎপর্য হচ্ছে গান্ধী-পরিকল্পিত সমান্তরাল রাষ্ট্র বা স্বরাজ গঠনের কাজে সরকার বাধা দিতে পারবেন না। অহিংস সত্যাগ্রহী যদি সৈন্যদের বলে, আমাদের দলে যোগ দাও বা অস্ত্র ত্যাগ করো, তাহলেও তাতে বাধা দেওয়া চলবে না। যখন তিনি শান্তিপুর্ণভাবে বৃটিশ দ্রব্য বয়কটের আহ্বান দেবেন, বাধা দেওয়া চলবে না। তিনি যদি অহিংস থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করেন, বাধা দেওয়া চলবে না। বলা বাহুল্য লর্ড রীডিং কূটনীতি জানেন। এর উত্তরে তিনি স্পষ্ট "না" জানালেন।

৮ই ফেব্রুয়ারি। ঐ তারিখে বর্দোলি জেলা অহিংস সত্যাগ্রহের পথে "মুক্ত অঞ্চলে" পরিণত হবে। তারপর? সরকার কী করবেন? সত্যাগ্রহীরা কী করবেন? বর্দৌলি জেলার বাইরে বিরাট ভারতবর্ষ কী করবে? কিন্তু কিছুই করতে হল না। ইংরেজ সরকার যে সংকল্প নড়াতে পারতো না সেই সংকল্প ভেঙে দিল গান্ধীর অসহযোগী সৈনিকরাই। ৫ই ফেব্রুয়ারি বর্দৌলি থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক জায়গায় পুলিশের সংগে অসহযোগ আন্দোলনকারীদের এক সংঘর্ষ ঘটলো। পুলিশ যখন শোভাযাত্রা ভাঙতে আসে তখন শোভাযাত্রীরা হঠাৎ হিংস্র হয়ে পুলিশকেই আক্রমণ করে। সংখ্যায় অল্প বলে পুলিশরা ভীত হয়ে টাউন-হলে আশ্রয় নেয়, তখন উন্মত্ত জনতা টাউন-হলেই অগ্নিসংযোগ

করে এবং বাইশ জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে সেখানেই মারা যায়। খবর শুনে গান্ধীজী স্তম্ভিত হলেন। বোম্বাইয়ে হিংসার দৃশ্য নিজে প্রত্যক্ষ করে তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, এখন চৌরিচৌরার তাণ্ডব হত্যালীলার সংবাদে তিনি চরম বিচলিত বোধ করলেন। অহিংস আচরণে দৃঢ় থাকা সহজ নয়। এই আচরণে অভ্যস্ত না হয়ে আইন অমান্য আন্দোলন করতে গেলে হিংসার আশ্রয় ও প্রশ্রয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, বোম্বাইয়ের ঘটনা ছিল তারই সাবধানবাণী। এখন তা আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো। এই বীভৎস ঘটনার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে গান্ধী পাঁচ দিনের জন্য অনশন বা উপবাস করলেন। প্রায়শ্চিত্ত কেন? কারণ বর্দৌলি আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি, আন্দোলন সমর্থন করেছেন তিনি, এর দায়-দায়িত্ব তাঁরই। অনশন করলে প্রায়শ্চিত্ত হয় কি না, অনশনে কোনো উদ্দেশ্য আদৌ সাধিতব্য কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ অবশ্যই আছে। গান্ধীর মনের গঠনটি ছিল ধর্ম-নির্ভর, এবং বর্দৌলির এক বছর আগে (১৯২৩ খৃঃ) তিনি লিখেছিলেন, খাঁটি উপবাসে দেহ, মন ও আত্মা শুদ্ধ হয়, নির্মল হয়। ১৯২৪ ও ১৯২৫ খৃঃ "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, আমার ধর্ম আমাকে এই শিক্ষাই দেয় যে যখন কোনো দুরপনেয় দুর্দৈব ঘটে তখন উপবাস এবং প্রার্থনাই বিধেয়। উপবাস আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। যেমন চোখ ছাড়া আমি চলতে পারিনা, তেমনি উপবাস ছাড়াও আমার চলেনা। বাইরের জগতে যেমন চোখ, অন্তরের জগতে তেমনি অনশন। আমি বোম্বাই ও বর্দৌলিতে যে অনশন করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল যারা আমাকে ভালবাসে তাদের সংশোধন করা। যারা আমাকে ভালবাসে অনশন ক'রে তাদের সংশোধন করা সম্ভব। কিন্তু জেনারেল ডায়ারকে সংশোধন করবার জন্য আমি অনশন করতে যাবো না, কারণ ডায়ার আমাকে ভালো তো বাসেনই না, পরন্তু আমাকে শত্রু বলে মনে করেন। এর অনেকদিন পরে তিনি

লিখেছিলেন, অনশন সত্যাগ্রহীর তূণীরে একটি মহা অস্ত্র, এই অস্ত্রটি খুব লঘুভাবে, খেয়াল খুশি মতো, ব্যবহার করা উচিত নয়। এর অপপ্রয়োগ হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব, কিন্তু তাই বলে অস্ত্রটি একেবারে পরিত্যাগ করা চলেনা। এর পর গান্ধী অবিলম্বে বর্দৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলেন এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যাবতীয় পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন। এজন্য তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীরা অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপ করলেন, তাঁকে ভীতু কাপুরুষ বলে অভিহিত করলেন এবং তাঁর পশ্চাদপসরণকে বর্দৌলির জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে ঘোষণা করতেও ছাড়লেন না। গান্ধী এক প্রবন্ধে এমনকি স্বীকারও করলেন যে, রাজনৈতিক বিচারে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল বা সুবিবেচনা-সম্মত নাও হতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় বিচারে এই সিদ্ধান্ত একেবারে খাঁটি। ধর্ম বা বিবেকের বিচার তাঁর কাছে রাজনৈতিক বা জাগতিক বিচারের চেয়ে ঢের বড়ো। গান্ধী তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী "ধর্ম" কথাটি বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। আমরা অনায়াসেই "ধর্ম"কে "বিবেক" বা "নীতিজ্ঞান" বলে অনুবাদ করে নিতে পারি। বলা বাহুল্য, নীতির প্রশ্নে যে সিদ্ধান্ত আমরা নিই তা ব্যক্তিগত অনুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, যৌথ সিদ্ধান্ত সেক্ষেত্রে অচল। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংখ্যাগুরুর যৌথ সিদ্ধান্তই একমাত্র গ্রাহ্য। তাই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে নৈতিক ডিক্টেটরশিপের সমন্বয় কখনো সম্ভব কি না, এ প্রশ্নটি থেকেই যায়।

রাজনীতিকে আমরা প্র্যাগম্যাটিক আর্ট বলেই জানি। রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী কর্তৃক বিরোধী পক্ষকে পর্যুদস্ত করে ক্ষমতার কেন্দ্র দখল করার কলাকৌশলই রাজনীতির প্রধান উপজীব্য ; চাণক্য বা মাকিয়াভেল্লির কূটনীতিই এর চরম লক্ষ্য। ধর্মের ভেক ধরতে অনেক সময় রাষ্ট্রনায়ককে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে শুধু প্রজার কল্যাণ বা সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার জন্য। রাষ্ট্রনায়ক কোনো

ক্ষেত্রেই ধার্মিক পুরুষ হননি তা নয়, এবং ধর্মের নামে রাজ্য শাসনের দৃষ্টান্তও কম নেই। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি দখলের উপায় হিসাবে প্রচলিত কূটনীতি বা ছলাকলার রাজনীতি পরিত্যাগ করে নীতি, বিবেক বা সত্যাচরণকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা গান্ধীর আগে কেউ কখনো করেননি। সার্থকতার কথা আপাতত না হয় বিচার নাই করলাম, নিছক প্রচেষ্টা হিসাবেও এর অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বা রাষ্ট্রে গান্ধীর আপত্তি ছিলনা, কিন্তু নীতি বা বিবেক নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা রাজনীতি কোনোটিতেই তাঁর সায় ছিল না। সত্যের জন্য সব কিছুই পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনো কিছুর জন্যই সত্যকে পরিত্যাগ করা যায় না, রাজনীতির জন্য তো নয়ই। সত্যকে শুধু আত্মিক শক্তি জেনেই গান্ধী ক্ষান্ত থাকেননি, রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক শক্তি হিসাবেও তাকে প্রয়োগ করতে এগিয়ে এসেছেন। এখানেই গান্ধীর মহত্ত্ব ও অভিনবত্ব।

কিন্তু গান্ধীর রাজনৈতিক শিষ্য ও সহযোগীরা প্রায় সকলেই অসহযোগ আন্দোলন এইভাবে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রত্যাহৃত হওয়ায় ক্ষুব্ধ হলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, মতিলাল নেহরু, লাজপত রায় চৌরিচৌরাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বেশি কিছু বলতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তবু পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্তে গান্ধী অবিচল থাকলেন। বড়লাটের বুঝতে বিলম্ব হলনা যে গান্ধী তাঁর সহযোগীদের থেকে আপাতত অনেকখানি বিচ্ছিন্ন। অতএব তাঁকে গ্রেপ্তার করার এই সুযোগ। ১০ই মার্চ প্রার্থনা শেষ হবার পর সবরমতী আশ্রম থেকে পুলিশের গাড়ী গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে সবরমতী জেলে নিয়ে গেল। গান্ধী পাঁচখানা বই সংগে নিলেন—গীতা, রামায়ণ, কোরাণ, বাইবেল ও প্রার্থনা পুস্তক। পরদিন কোনো বড় রকমের বিক্ষোভ ঘটলো না। "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র কয়েকটি আপত্তিকর প্রবন্ধ লেখার দায়ে বিচারের জন্য যখন তাঁকে আমেদাবাদে বিচারপতি ব্রুমফীল্ডের সামনে হাজির করা হল, গান্ধী নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করলেন।

তাঁর পেশা কি? উত্তরে তিনি জানালেন, কৃষি ও সুতাকাটা। তিনি যে শ্রমজীবী মানুষেরই সহোদর এই কথাটাই বুঝাতে চাইলেন। এই বিচার দেখতে অগণিত দর্শক আদালতে ভেঙে পড়েছিল, এদের মধ্যে একজনের নাম সরোজিনী নাইডু। গান্ধী কোর্টে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে বলেন: আমি দুঃখের সংগে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে বৃটিশের সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষ এমন অসহায় দশায় পৌঁছেছে যা কোনো কালেই ছিল না। ভারতবর্ষ এমন নিঃস্ব যে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ক্ষমতা তার নেই। শহরবাসীদের ধারণা নেই বুভুক্ষু সাধারণ মানুষ কেমন করে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।...আমি বিশ্বাস করি অসহযোগ আন্দোলন করে আমি ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশেরই সেবা করেছি। আমি দেখিয়েছি এই দুটি দেশ যে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে তা থেকে উদ্ধারের পথ অসহযোগ। আমি মনে করি, ন্যায়ের সংগে সহযোগিতা যেমন আমাদের কর্তব্য, অন্যায়ের সংগে অসহযোগিতাও তেমনি। কিন্তু অতীতে অন্যায়কারীর প্রতি অসহযোগিতার প্রকাশ ঘটেছে স্বেচ্ছাকৃত হিংসায়। আমি দেশবাসীর কাছে দেখাবার চেষ্টা করছি যে সহিংস অসহযোগ আরো বহুগুণ অন্যায়ই সৃষ্টি করে এবং অন্যায়কে যেহেতু শুধু হিংসাত্মক উপায়েই টিঁকিয়ে রাখা সম্ভব, অতএব অন্যায়ের সংগে অসহযোগিতা সফল করতে হলে হিংসার সংগেও অসহযোগিতা প্রয়োজন। অহিংসা মানে অন্যায়ের সংগে অসহযোগিতা এবং তার জন্য যে কোনো শাস্তি বা নির্যাতন স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া। বিচারক ব্রুমফীল্ড রায় দিতে গিয়ে বল্লেন: "মিঃ গান্ধী, আপনি নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করায় এক হিসাবে আমার কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছেন। তবু এক্ষেত্রে ন্যায্য শাস্তির নির্দেশ দেবার কাজটি আমার কাছে খুব সহজ নয়, কোনো বিচারকের কাছেই সহজ হত না। আইনের চক্ষে যদিও সব মানুষই সমান, তবু একথা অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব যে আমি জীবনে যতো মানুষের বিচার করেছি বা

ভবিষ্যতে যাদের বিচার করতে পারি তাদের সবার থেকে আপনি পৃথক। একথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে আপনার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর চোখে আপনি একজন মহান দেশপ্রেমিক ও মহান নেতা। রাজনীতিতে যাঁরা আপনার সম-মতাবলম্বী নন তাঁরাও আপনাকে একজন উচ্চ আদর্শের ও মহৎ, এমন কি ধার্মিক, চরিত্রের মানুষ বলে শ্রদ্ধা করেন।" বিচারপতি ব্রুমফীল্ড যখন গান্ধীর প্রতি ছ-বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করলেন তখন গান্ধী মন্তব্য করলেন, "এর চেয়ে লঘু শাস্তি কোনো বিচারকের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব ছিল না!" শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই বিচারের প্রত্যক্ষদর্শিনী হিসাবে লিখেছিলেন: "এই অসাধারণ বিচার যতক্ষণ চলেছিল আমি আমার প্রভুর অমর উচ্চারণ নিবিষ্ট হয়ে শুনছিলাম। আমার মনে পড়ছিল যীশুখৃষ্টের কথা, যীশুর বিচারের কথা। বহু শতাব্দী পরে যেন সেই নাটকেরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল। আমি দেখছিলাম, আরেকজন অজেয় মানবদরদী, ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ, মহাপুরুষ গান্ধী, গরীবের বেশে গরীবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, দুঃখবরণ করতে।" কোর্টে গান্ধীর বিচার এই শেষ। ১৯২২ খৃঃর পর যখনই গান্ধীকে আটক করা হয়েছে তখনই বিনা বিচারে তা করা হয়েছে।

গান্ধীর বন্দীদশা কাটে যারবেদা জেলে। এখানে প্রথম প্রথম সব বিষয়ে তাঁর উপর খুব কড়াকড়ি করা হত। কিন্তু পরে এই কড়াকড়ি শিথিল করে দেওয়া হয়। গান্ধী এই অবসরে কিছু বই পড়ে ফেলবেন স্থির করেন এবং জেল কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রায় দেড় শো বই তিনি পড়বার অনুমতি পান; এর মধ্যে ছিল মহাভারত, মনুসংহিতা, উপনিষদ: হিন্দু, খ্রীষ্টান, জরথুষ্ট্রীয়, বৌদ্ধ, শিখ ও ইসলাম ধর্ম এবং ভারতীয় দর্শন-এর বেশ কিছু বই; গীতা, এবং শংকর, তিলক ও অরবিন্দ রচিত গীতাভাষ্য; টলস্টয় ও রাস্কিনের রচনা; এচ-জি-ওয়েলস-এর "ইতিহাসের রূপরেখা", গিবন-এর "রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন", বার্ণার্ডশ-র "মানব ও মহামানব"

(ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান), কিপলিঙের "ব্যারাক-গাথা" (ব্যারাকরুম ব্যালাডস), গ্যয়টের "ফাউস্ট", রবীন্দ্রনাথের "সাধনা" ইত্যাদি। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে এই সময় তিনি একখানি বই লিখতে শুরু করেন, এবং আরো ভাল করে তামিল ভাষা শিক্ষায়ও মনোনিবেশ করেন। গোটা মহাভারত এই সময়ই তিনি পড়ে শেষ করেন। ইতিহাস পড়বার সময় তিনি ইতিহাসের দর্শনেই বেশি নিবিষ্ট হতেন। ইতিহাসের আধুনিক ধারণার পরিবর্তে প্রাচীন হিন্দু ধারণাই তিনি বেশি পছন্দ করতেন, অর্থাৎ সন তারিখ ও নিছক ঘটনা নয়, ঘটনাবলীর তাৎপর্য ও সার সত্য। তাঁর মতে মহাভারত এই ধরণের ইতিহাস-সার বা মানবেতিহাসের নির্যাস। গিবনের রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে তিনি মহাভারতের এক নিকৃষ্ট সংস্করণ বলে মনে করতেন।

গান্ধীর ছ-বছরের সাজা হয়েছিল, কিন্তু দু-বছরের মধ্যেই তিনি গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়লেন। ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গেল তিনি অ্যাপেণ্ডিসাইটিস রোগে ভুগছেন এবং তাঁর ক্ষত অপারেশন করা দরকার। অপারেশনের জন্য তাঁকে অবিলম্বে পুণার হাসপাতালে ভর্তি করা হল। অপারেশনের সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে; ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে সারা হাসপাতাল অন্ধকার হয়ে যায়। একজন নার্স তখন আর কোনো উপায় দেখতে না পেয়ে অপারেশনের কাছে একটি ফ্ল্যাশ লাইট তুলে ধরেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তাও নিভে যায়। তখন নিরুপায় হয়ে লণ্ঠনের আলোতেই অস্ত্রোপচার শেষ করতে হয়। অস্ত্রোপচার সফল হল, কিন্তু এর পর কতকগুলি উপসর্গ ও জটিলতা দেখা দিতে আরম্ভ কোরলো। এই অবস্থায় জেলখানায় তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ায় বিপদ আছে বুঝে ১৯২৫ খৃঃ ৫ই ফেব্রুয়ারি সরকার তাঁর বাকি দণ্ড মকুব করে দিলেন। ছাড়া পেয়ে গান্ধী স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বোম্বাই শহরের অদূরে জুহু সৈকতে এক গুজরাতী ভদ্রলোকের বাংলোতে গিয়ে উঠলেন। এখানে এই আরোগ্য-

নিকেতনেও দেশের রাজনৈতিক বাতায়নটি তিনি একেবারে বন্ধ রাখতে পারেন নি। "ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও "নবজীবন"-এর তদারকি কাজ আবার একটু একটু করে করতে লাগলেন এবং মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতারা তাঁর সংগে আলোচনার জন্য জুহু সৈকতে এলেন। ইতিমধ্যে অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এঁরা "স্বরাজ্য পার্টি" নাম একটি নূতন দল গঠন করে নির্বাচনে লড়েছিলেন; এই দলে সুভাষচন্দ্রও যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের রাজনৈতিক দাবী ছিল "ডোমিনিয়ন স্টেটাস", কিন্তু অ্যাসেমব্লি বয়কট করার পরিবর্তে অ্যাসেমব্লিতে ঢুকে ভিতর থেকে ভাঙার নীতিই এঁরা গ্রহণ করেছিলেন। নির্বাচনে এই স্বরাজ্য দল, যাদের বলা হত পরিবর্তনপন্থী বা "চেঞ্জার", বাংলা দেশে বেশ সাফল্য লাভ করেছিলেন। যাঁরা অ্যাসেমব্লিতে ঢোকার বিরোধী ছিলেন তাঁদের বলা হত পরিবর্তন-বিরোধী বা "নো-চেঞ্জার"। এই দলে ছিলেন রাজাগাপালাচারি ও বল্লভভাই প্যাটেল। গান্ধী এই উভয় দলের দরবার মন দিয়ে শুনতেন, কিন্তু এদের কোনোটির প্রতিই তাঁর কোনো আগ্রহ ছিলনা।

কয়েকমাস জুহুতে কাটিয়ে গান্ধী সোজা সবরমতী ফিরে গেলেন। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ স্তিমিত হয়ে আসছিল। যখন বহু-ঘোষিত এক বছরের মধ্যে "স্বরাজ" অর্জন করা গেল না, তখন স্বভাবতই জনসাধারণের মনে হতাশার সৃষ্টি হল। চরম মুহূর্ত সমাগত মনে করে চরম আত্মত্যাগের পথে যারা এগিয়েছিলো তারা নিজেদের অসহায় ও বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলো। বর্জিত কোর্ট কাছারিতে আবার উকিল মোক্তারদের ভীড় দেখা দিল, শূন্য স্কুল কলেজের ব্ল্যাকবোর্ডে আবাব নূতন নূতন চাখড়ির লেখা ফুটে উঠলো, সরকারী অফিস আবার তদ্বির উমেদারির কেন্দ্র হয়ে উঠলো। "দেশ প্রস্তুত নয়" এই কথা বলে, জনতার ক্রোধবহ্নি বা হিংসার উপর অভিমান করে, গান্ধী আন্দোলন স্থগিত রেখেছিলেন। কিন্তু

যখন আন্দোলন স্থগিত, তখন সাধারণ মানুষ কী করবে, পরবর্তী আন্দোলনের জন্য কী ভাবে প্রস্তুত হবে, পরবর্তী ছ-বছর ধরে গান্ধী ভারতবাসীকে হাতে কলমে তাই বোঝাতে বসলেন।

সবরমতী আশ্রম ছিল গান্ধীর এক ল্যাবরেটরি। গান্ধী যখন যারবেদা জেলে, তখন রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর আশ্রমে একবার এসেছিলেন, এবং আশ্রমিকদের কাছে "মহাত্মা" সম্বন্ধে এক প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যাঁর জীবন সারা বিশ্বের মানব কল্যাণে নিয়োজিত তিনিই মহাত্মা। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর সব কথা বা সব কাজে সায় দেননি, কিন্তু তাঁর কাছে গান্ধী ছিলেন সর্বদাই মহাত্মা। আশ্রমিকদের কাছে গান্ধী ছিলেন "বাপু", এবং পরে তিনি সারা দেশেই "বাপু" নামে পরিচিত হয়েছিলেন। আশ্রমে নানা ধরণের লোক—নারী ও পুরুষ—থাকতো। সকলেই—অসুস্থ বা একান্ত অপারগ না হলে—সুতো কাটতো এবং দৈহিক কাজ করতো। নৈতিক কড়াকড়ি সবাইকেই মানতে হত। কেউ নীতিভ্রষ্ট হলে তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হত এবং তাকে ভৎ´সনা করা হত। সময়ানু-বর্তিতা এবং পরিচ্ছন্নতা ছিল গান্ধীর দুটি মূলমন্ত্র। তাঁর কোমরে ঝুলানো ট্যাকঘড়িটি ছিল তাঁর সর্বক্ষণের শাসক। এই শাসকের সদাজাগ্রত চোখের সামনে বসে তিনি কাজ করতেন বলেই এত কাজ তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হত। তাঁর হাতের লেখা সুন্দর ছিলনা, কিন্তু স্পষ্ট ছিল। তিনি ডান হাত বাঁহাত দুহাত দিয়েই লিখতে পারতেন; ডান হাত ক্লান্ত হলে বাঁহাত দিয়ে লিখতেন। চিঠিপত্র, বিভিন্ন ধরণের লেখালেখি বা হিসাবনিকাশ এসবের জন্য যে কোনো অর্ধব্যবহৃত কাগজের টুকরোই যথেষ্ট ছিল। এক-পিঠ-লেখা কাগজ, ছেঁড়া খাম, পুরোনো চিঠির শাদা অংশ—তাঁর কাছে অব্যবহার্য ছিল না। পোস্টকার্ডেই বেশির ভাগ লিখতেন, কারণ মিতব্যয়িতা ছিল তাঁর দ্বিতীয় স্বভাব। লিখতে লিখতে পেন্সিল একেবারে ক্ষয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি ফেলে দিতেন না। তিনি মিতব্যয়ী

ছিলেন, কিন্তু প্রচলিত অর্থে সঞ্চয়ী ছিলেন না। তার নিজের জন্য কোনো সঞ্চয়ের প্রশ্নই উঠতো না। তাঁর মিতব্যয়িতার মূল কারণ ছিল এই যে তিনি সর্বদা নিজেকে একজন দরিদ্র ভারতবাসী বলে জ্ঞান করতেন। ভারতের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সামান্যতম অমিতব্যয়িতাও তিনি অন্যায় বলে মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর মতপার্থক্যের মূলও এইখানে, চিরাচরিত পলিটিশ্যানদের সংগেও তাঁর পথের পার্থক্য এইখানে। যন্ত্র, কলকারখানা, রুচিবান সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প এবং আধুনিক জীবনের অনেক কিছু সম্বন্ধেই তাঁর যে নেতিবাচক দৃষ্টিভংগি তারও ব্যাখ্যা এইখানে। ভালোমন্দ বিচারের তাঁর একটি সহজ ও সর্বজনীন মাপকাঠি ছিল—জনগণের পক্ষে যা ভালো তাই ভালো, যা মন্দ তাই মন্দ। কলকারখানা যখন ছিলনা তখনও শোষণ ছিল, পীড়ন ছিল, কিন্তু বস্তিজীবনের চরম দারিদ্র্য ও অমানুষিকতা ছিলনা। কল-কারখানা যদি সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গীকৃত না হয়, তাদের মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দিতে পারে, তবে গান্ধী তার বিরোধী। যে যন্ত্রের উপর শ্রমজীবী মানুষের পূর্ণ কর্তৃত্ব নেই, তিনি তারই বিরোধী। যন্ত্রমাত্রেরই তিনি বিরোধী নন। চরকাও যন্ত্র, সেলাইয়ের কলও যন্ত্র, এমনকি তিনি একবার বলেছিলেন, আমার এই দেহটাও তো একটা চমৎকার যন্ত্র। কিন্তু এই দেহযন্ত্র যদি আত্মিক বিকাশের সহায়তা না করে দেহসর্বস্বতারই উপায় হয়, তবে সেই দেহের জন্য যত্ন করার দরকার নেই। আমি বর্জন করতে চাইলেও মেশিন বা যন্ত্র থাকবেই, যেমন আমি না চাইলেও দেহ আছে। একে আত্মিক উৎকর্ষের প্রতিবন্ধক হতে দিলে চলবে না। যখন দেহ এই উৎকর্ষের বাধা হবে, তখন আমি দেহও বিসর্জন দিতে বোলবো। যন্ত্রের জন্য মত্ততার আমি বিরোধী, যন্ত্রের বিরোধী নই। মেশিনে শ্রম বাঁচানো যায় ঠিকই, কিন্তু শ্রম বাঁচিয়ে হাজার হাজার মানুষকে বুভুক্ষু ও পথের ভিক্ষুক করে লাভ কি? শ্রম এবং সময় বাঁচানোর আমিও

পক্ষপাতী, কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের নয়, কীভাবে জনসাধারণের প্রত্যেকের শ্রম ও সময় বাঁচানো যাবে সেটিই আমার ভাবনা। এখন মেশিনে যে শ্রম ও সময় বাঁচানো হচ্ছে তা কার স্বার্থে, কী জন্য? মুষ্টিমেয় মালিকের স্বার্থে, এবং তাদের লাভ ও মুনাফা বৃদ্ধির জন্য। আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী। গান্ধীর এই দৃষ্টিভংগি শুধু ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। ১৯২৬ খৃঃ গান্ধী সূতাকল শ্রমিক সংঘ কর্তৃক বস্ত্রশিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব পাশ করান, কিন্তু পাশ্চাত্য "সোশ্যালিজমের" প্রতি তিনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন না। রাষ্ট্রকর্তৃক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন তিনি খানিকটা বলপ্রয়োগ বলে মনে করতেন; তিনি উপর থেকে না চাপিয়ে, নিচু থেকে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ একমাত্র তাতেই জনগণের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ ঘটে। মুষ্টিমেয় মানুষের বা গোষ্ঠীর ধন ও ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত যন্ত্রে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। ধন বা ক্ষমতা প্রত্যেকের কাজে এবং প্রত্যেকের কাছে আসা চাই। গান্ধীর ভাবনা ছিল প্রধানত ভারতবর্ষকে ঘিরে। ভারতের মতো দরিদ্র দেশে প্রত্যেক মানুষকে কাজ দেওয়াই প্রাথমিক দায়িত্ব, এখানে শ্রমলাঘবের প্রশ্নই ওঠে না কিংবা অবসর বাড়ানোর প্রশ্নও ওঠে না, বেকার জীবনের বাধ্যতা-মুলক অবসরের পরিবর্তে শ্রমের সংস্থান করাই এখানে সমস্যা। গান্ধী মেশিনের বিরোধী নন। যে-মেশিন মানুষকে বেকার ও অকেজো করে, তিনি শুধু সেই মেশিনের বিরোধী। সকলের উপকারে আসে এমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে তিনি সর্বদাই স্বাগত জানান। যেমন তিনি মনে করেছেন, ভারতে ভারী শিল্পের স্থানও থাকবে তবে তা অবশ্যই রাষ্ট্রায়ত্ত হবে এবং তাকে সম্পূর্ণ ভাবে জনস্বার্থে নিয়োজিত রাখা হবে। যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু "স্বরাজ্য পার্টি" গঠন করেন তখন গান্ধী যে বিশেষ উৎসাহ দেখাতে পারেননি, তার কারণ নেহরু ও দাশের মতো সমাজের কতিপয় উঁচু-

তলার মানুষ অ্যাসেমব্লি, অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা, দখলের যে চেষ্টা করছিলেন তার সংগে জনসাধারণের "স্বরাজ" অর্জনের কোনো সম্বন্ধই তিনি দেখতে পাননি।

গান্ধী শুধু গণতন্ত্রী নন, প্রকৃত জনতন্ত্রী, জনসাধারণের মুখ্য ভূমিকা ও অধিকার যেখানে নেই সেখানে গান্ধীও নেই। বিলাতের পার্লামেণ্ট রাজনীতির প্রতি এই কারণেই তিনি ছিলেন বীতস্পৃহ, এবং বোধ করি এই কারণেই জীবনের শেষ প্রান্তে ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ই অগস্ট দিল্লিতে পতাকা উত্তোলনের মধ্যে গান্ধী থাকতে পারেননি। চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের নেতৃত্বে "স্বরাজ্য পার্টি" শাসনতন্ত্রের মধ্যেই অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছিল। নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা দেশের সর্বত্র মিউনিসিপ্যালিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের পদ দখল করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন কলকাতার প্রথম মেয়র। বিটলভাই প্যাটেল বোম্বাই কর্পোরেশনের এবং বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। পুনা মিউনিসিপ্যালিটি গভর্ণমেণ্টের আদেশ অমান্য করে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে লোকমান্য তিলকের প্রতিমূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। বোম্বাই কর্পোরেশন ও আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি গান্ধীকে পৌর মানপত্র দিলেন। করাচি, বোম্বাই, কলকাতা ও পাটনা পৌরসভার সভাপতিরা বড়লাটের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠান বর্জন করলেন। ভারতের সর্বত্র পৌর সভাগুলি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করতে লাগলো এবং মাথা উঁচু করে সরকারের সংগে দ্বন্দ্বে নিযুক্ত হল। কাউন্সিল ও মিউনিসিপ্যালিটির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের কোনো বাস্তব সমস্যা সুরাহা হলনা, বরং ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশি করে দেখা দিতে লাগলো।

গান্ধী স্বরাজ্যপন্থীদের সাফল্যে একটুও উৎফুল্ল হতে পারলেন না। বিশেষত যখন তিনি দেখলেন, এতটুকু একটু ক্ষমতার পিঠে

ত্যাগ নিয়ে এত লাঠালাঠি শুরু হয়েছে। তিনি তাঁর "হিন্দ স্বরাজ"-এ উচ্চারিত স্বাবলম্বনের মন্ত্রই আরো উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন। ১৯২৪ খৃঃ কংগ্রেস কমিটিতে একটি প্রস্তাব পাশ করালেন যে, কংগ্রেস সংগঠনে যারাই গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হবেন তাদের প্রত্যেককে নগদ চাঁদার পরিবর্তে সমমূল্যের হাতেকাটা সুতো চাঁদা হিসাবে জমা দিতে হবে। বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠির মতপার্থক্য যতোই থাক এটি হবে ন্যূনতম ঐক্যের প্রতীক। এই সময় লাহোরের একটি ঘটনা নিয়ে দিল্লি ও অন্যান্য শহরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাংগা বেধে উঠে। গান্ধী ব্যথিত হয়ে পুর্ণ তিন সপ্তাহের অনশন পালন করেন, এবং এর ফলে আপাতত কিছুটা সম্প্রীতির লক্ষণ দেখা দেয়। ঐ বৎসর কংগ্রেস কর্মীদের চাপে গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। কারণ তিনিই হবেন সবচেয়ে উপযুক্ত ঐক্যের প্রতীক ও সাধক। সভাপতি হিসাবে গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহের কার্যসুচি আরো জোরদার করতে চাইলেন। বেলগাঁও কংগ্রেসের কর্মকর্তারাই নন, প্রত্যেক কংগ্রেস সভ্যকেই হাতে কাটা সুতো চাঁদা হিসাবে জমা দিতে হবে। বিদেশী কাপড় বর্জন ছাড়া অন্য সব বিষয়ে অসহযোগ তিনি সাময়িক ভাবে রদ করলেন। মিলের কাপড়, আদালত, স্কুল কলেজ, সরকারী খেতাব ও আইনসভা এই পঞ্চবর্জনের শুধু প্রথমটিই বহাল থাকলো। প্রস্তাবিত কর্মসুচি যদি ব্যর্থ হয় তাহলেই আবার পুর্ণ অসহযোগের প্রশ্ন উঠবে; কংগ্রেসের মধ্যেই হোক বা বাইরেই হোক, কোনো না কোনো ভাবে অহিংস অসহযোগ তখন আবার শুরু করতে হবে। এর ফলে স্বরাজ্য পন্থীরা যেমন কাউন্সিল রাজনীতি করছিলেন তেমনি করতে পারবেন। অবশ্য গান্ধীর নিজের এই রাজনীতির উপর আস্থা ছিলনা। কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে মাত্র একবছরই তিনি কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করেছেন, সেটি হচ্ছে তাঁর কংগ্রেস সভাপতিত্বের বছরটি। এবং ঐ সময়ই তিনি কংগ্রেস পরিচালকদের সম্বন্ধে তীব্রতম মন্তব্য করেছেন। শিক্ষিত

ভদ্রলোকেরা সাধারণ ভারতীয়দের সংগে ব্যবধান রেখে চলেন, এটিই তাঁর কাছে সবচেয়ে পীড়াদায়ক ছিল। এই সময় কলকাতার মেয়র হিসাবে চিত্তরঞ্জন দাশ অবশ্য নিয়ম করেন যে পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মীর পোষাক হবে খাদি, কিন্তু অচিরেই দেখা যায় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সুতো কাটা বিষয়ে মৌখিক সমর্থন ছাড়া প্রকৃত আবেগ কিছু নেই। তিনি "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় লিখলেন—"আমাদের অসহযোগ এখন বৃটিশের সংগে অসহযোগের পরিবর্তে নিজেদের পরস্পরের মধ্যে অসহযোগে পরিণত হয়েছে। এই ভাবে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমরা নিজেদের দুর্বল করে ফেলছি এবং যে শাসন ব্যবস্থা আমরা ভাঙতে চাই তাকেই মজবুত করে তুলছি। আমাদের অসহযোগ বর্তমান হিংসাশ্রয়ী ব্যবস্থার বিপরীত দিকে জীবন্ত সক্রিয়, অহিংস শক্তি হিসাবে রূপ নেবে এই ছিল আশা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের অসহযোগ কখনোই কার্যকরী ভাবে অহিংস হয়নি। আমরা শুধু দৈহিক অহিংসা, দুর্বল ও অসহায়ের অহিংসা নিয়েই তৃপ্ত থেকেছি।"

গান্ধী এই সময় জার্মান কবি গ্যয়টের "ফাউস্ট" কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেকে মার্গারেটের সংগে তুলনা করেন। হতাশা ও বিষাদ-ভারাক্রান্ত মার্গারেট কোথাও সান্ত্বনা বা উপশম না পেয়ে চরকার কাছে গিয়ে চরকার ঘর্ঘরে মনের শান্তি খুঁজে পেয়েছিল। মার্গারেটের ঘরে বই ছিল, ছবি ছিল, বাইবেল ছিল, কিন্তু মার্গারেট চরকার কাছেই গিয়েছিল, কারণ বই, ছবি, বাইবেল এসবে তার কোনো উপশম হয়নি। গান্ধী নিজের মনের অবস্থাকে গ্যয়টে বর্ণিত গ্রেটচেন (বা মার্গারেট) এর মনোভাবের সংগে তুলনা করেন। গ্রেটচেনের গানটির প্রথম যে অংশটুকু গান্ধী উল্লেখ করেন তার বাংলা অনুবাদ অনেকটা এরূপ :—

আমার হৃদয়ে নেই সুখ
বুক ভরা শুধু মনোভার,

শান্তি ফিরে আসবেনা জানি
আসবেনা আসবেনা আর।

যেখানে পাইনে খুঁজে তারে
সে আমার কবর সমান
সমস্ত সংসার জুড়ে দেখি
বিস্বাদে ভরেছে আশমান।

আমার মস্তকে এক জ্বালা
যন্ত্রণায় আমি ঘূর্ণ্যমান
আমার এ মন গেছে ভেঙে
আমার এ চিত্ত খান খান।
আমার হৃদয়ে নেই সুখ
বুকভরা শুধু মনোভার,
শান্তি ফিরে আসবেনা জানি
আসবেনা আসবেনা আর।

গান্ধী নিজেও যেন তাঁর প্রিয়তম আদর্শ হারিয়ে ফেলেছেন এবং তাঁর মনোভারও যেন কিছুতেই কাটছেনা। কাজেই গ্রেট্চেন-এর মতো তাঁরও চরকার কাছে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯২৫ খৃঃ গান্ধী তাঁর আত্মজীবনী রচনা শুরু করেন। চার বছর আগে যখন সহকর্মীদের অনুরোধে তিনি আত্মজীবনী লেখা শুরু করতে যান তখন বোম্বাইতে দাংগা লাগে এবং তাঁকে লেখার কাজ বন্ধ রাখতে হয়। যারবেদা জেলে আবার আরম্ভ করবেন স্থির করেন, কিন্তু সেবারও শুরু করবার আগেই জেল থেকে ছাড়া পান এবং লেখা মুলতুবিই থাকে। এবার ১৯২৫ খৃঃ ডিসেম্বর থেকে মূল গুজরাতীতে লেখা এই আত্মজীবনী "নবজীবন" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। মহাদেব দেশাইকৃত ইংরেজি অনুবাদও এক সাথেই "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় দু-বছর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। গান্ধী গুজরাতীতে এই আত্মজীবনীর নাম দেন "সত্যনা প্রয়োগো অথবা আত্মকথা"। লক্ষণীয়, সত্যই মুখ্য, আত্ম এখানে গৌণ। এ যেন আত্মজীবনীর আকারে সত্য-জবাণী। প্রয়োগ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্য-সন্ধানের কাহিনীই এই আত্মজীবনী। জীবন এখনে বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরির সমতুল্য। ভূমিকায় তিনি একথা স্পষ্টই বলেছেন: এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত এমন দাবী আমি করি না। বৈজ্ঞানিক যেমন নিজের এক্সপেরিমেণ্টটি খুব সাবধানে, বিচার বিবেচনা করে, এবং নিপুণভাবে করলেও তার পরীক্ষার ফলকে চূড়ান্ত বলে জাহির করেন না; নিজের ফলাফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও তিনি আত্মতুষ্ঠ হন না, তার মন আরো বিচার বিবেচনা ও সংশোধনের জন্য সর্বদাই মুক্ত রাখেন; গান্ধীও তেমনিভাবেই তাঁর অতীত কার্যাবলীর মধ্যে "আত্মনিরীক্ষণ" করেছেন। সত্য নিয়ে পরীক্ষার বিষয়গুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন, তবু সেগুলি একেবারে নিখুঁত বা সম্পূর্ণ, এমন দাবী তিনি কোনোদিনই করবার আশা রাখতেন না। তিনি যেন

বিজ্ঞান-সাধক; তাঁর জীবনচর্চা আত্মবিজ্ঞানেরই চর্চা। এর লব্ধ ফল সারা বিশ্বমানবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর কার্যাবলীর কথা ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে অনেকেই জানেন, কিন্তু সেগুলিকে তিনি নিজে খুব বড় বলে মনে করতেন না। তাঁর কাছে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োগের বিবরণীই বেশী মূল্যবান, কারণ এই আত্মিক প্রয়োগ থেকেই তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করার যা কিছু শক্তি লাভ করেছেন। কাজেই তাঁর "আত্মকথা" মামুলি আত্মকথা নয়, এর মূল বিষয় গান্ধী নন, মূল বিষয় "সত্যনা প্রয়োগো"। ভূমিকার শেষে তিনি সুরদাসের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে বিনয়নম্র ঈশ্বর ভক্তের ভাষায় বলেছেন:

মো সম কৌন কুটিল খলকামী?
জেন তনু দিয়ো তাহি বিসরায়ো
অ্যায়সো নিমকহরামী।

অর্থাত:

কে আছ আমার মতো দুষ্টখলকামী
যাঁর দেওয়া দেহমন তাঁকে করি বিস্মরণ
এমনই নিমকহারামী।

১৯২৫ খৃঃ "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র ৩রা ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় "আত্মজীবনী"র প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়। ঐ একই সংখ্যায় গান্ধীজী তাঁর সাম্প্রতিক এক সপ্তাহব্যাপী উপবাস সম্পর্কেও একটি রচনা প্রকাশ করেন। এই সময় সবরমতী আশ্রমের কতিপয় আশ্রমিক ছাত্র সমকামী যৌনাচারে লিপ্ত হয়। গান্ধীজী যখন এই ঘটনা জানলেন তখন তিনি বালকদের শাস্তিদানের পরিবর্তে তাদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিজেই সাত দিনের জন্য উপবাস করেন। উপবাস তিনি কীভাবে পালন করেন এবং প্রয়োজন হলে অন্যেরাও কীভাবে পালন করবে, এসম্বন্ধে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় তিনি বিস্তারিতভাবে লেখেন। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বলেন:

আত্মশুদ্ধি ছাড়াও নিম্নলিখিত যে কোনো শারীরিক কারণে উপবাস করা যেতে পারে : (১) কোষ্ঠবদ্ধতা (২) রক্তাল্পতা (৩) জ্বরজ্বরভাব (৪) অপরিপাক (৫) মাথাধরা (৬) বেদনা (৭) বাত (৮) বিরক্তিবোধ (৯) মনমরা ভাব (১০) অতিউৎফুল্লতা। উপবাস কালে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়া দরকার; শারীরিক ও মানসিক শক্তি যথাসম্ভব ব্যয় না করে উপবাসের প্রথম থেকেই শক্তি সঞ্চয় করা; উপবাসের সময় খাদ্যচিন্তা একেবারেই মনে না আনা; যতোটা পারা যায় ঠাণ্ডাজল পান করা, তবে কখনই একেবারে বেশি পরিমাণ নয়, জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নেওয়া; প্রতিদিন ঈষদুষ্ণ জলে গা রগড়ানো; উপবাসকালে নিয়মিত ডুসের সাহায্যে অন্ত্র পরিষ্কার রাখা; যতোটা সম্ভব মুক্ত বাতাসে নিদ্রা যাওয়া; ভোরবেলার সূর্য গায়ে লাগানো, হাওয়া ও সূর্যরশ্মিতে দেহ নির্মল করা; ঈশ্বর এবং অন্য যে কোনো বিষয়ে চিন্তা করা; তবে উপবাস সম্বন্ধে কোনো সচেতনতা বা চিন্তা মনে ঠাঁই না দেওয়া।

প্রথম কিস্তি আত্মজীবনী বেরোবার একমাস আগে, ৬ই নভেম্বর, ১৯২৫খৃঃ, তিরিশোত্তীর্ণা ইংরেজ মহিলা কুমারী ম্যাডোলিন স্লেড ইংলণ্ড থেকে বোম্বাই এসে পৌছান। একবছর আগে তিনি গান্ধীজীকে প্রথম চিঠি লেখেন এবং সবরমতী আশ্রমে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন বীঠোফেন ভক্ত, সংগীত ও সুর ছিল তার প্রাণের সাধনা। রম্যাঁ রলাঁর সংগে পরিচিত হবার পর রলাঁর মুখেই তিনি গান্ধীর বিবরণ শোনেন এবং গান্ধীর রচনা পড়েন। কুমারী স্লেড স্থির করেন গান্ধীর আশ্রমে তিনি আবাসিক হবেন। গান্ধীকে কুমারী স্লেড লেখেন, একবছর ধরে তিনি সুতো কাটা শিখবেন এবং নিরামিষ ভোজন অভ্যাস করবেন এবং তারপর গান্ধী রাজী হলে তাঁর আশ্রমে যাবেন। গান্ধী প্রথমে খুব বেশি উৎসাহ দেখাননি, কিন্তু এক বৎসর পর তিনি লিখলেন, যদি ভারতবর্ষের গরম এবং আশ্রমের কষ্টসাধ্য কাজকর্ম তার সহ্য হয় তিনি আসতে পারেন।

তিনি ৭ই নভেম্বর বোম্বাই থেকে সোজা আমেদাবাদে এসে পৌঁছালেন। গান্ধীর সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই যখন স্টেশন থেকে তাঁকে আনতে গেলেন, দেখলেন শ্রীমতী স্লেডের পরণে বিশুদ্ধ খাদি। গান্ধী তাকে অভ্যর্থনা করে বল্লেন, "এখন থেকে তুমি আমার মেয়ে।" কুমারী স্লেডের নতুন নাম দিলেন মীরা, পরে আশ্রমে তিনি হলেন মীরা বেন, বাংলায় মীরা বোন। বাপু তাকে প্রথমে যে কাজের ভার দিলেন তা হচ্ছে পায়খানা পরিষ্কার করা। মহাদেব দেশাইয়ের কাছে তার হিন্দুস্থানী শেখাও শুরু হয়ে গেল। ডিসেম্বর মাসে বাপু তাকে সংগে নিয়ে ওয়ার্ধা গেলেন এবং সেখানকার আশ্রম দেখে মীরা খুব খুশি হলেন। গান্ধীর প্রতি মীরার ভক্তির তুলনা হয় না। গান্ধী সযত্নে মীরাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারতেন না, গান্ধীর ব্যক্তিগত পরিচর্যার দিকে মীরার লক্ষ্য ছিল নিপুণ অভিভাবিকার মতো। গান্ধী যখন আশ্রমের বাইরে যেতেন মীরা তখনও চিঠি লিখে তাঁর খাদ্যের এবং সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর নিতেন। গান্ধীও তাকে বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে চিঠি লিখেছেন, চিঠিগুলির সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে ছ-শো। গান্ধীর আত্মজীবনীর যে ইংরেজি অনুবাদ মহাদেব দেশাই করছিলেন, মীরা বেন তা নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখতেন, এবং প্রয়োজন মতো শব্দ পরিবর্তন করে দিতেন।

এই সময়ে আমেদাবাদে দুটি ঘটনা ঘটে, ঘটনাগুলি এক হিসাবে খুবই তুচ্ছ, কিন্তু সেই সময় এ নিয়ে গান্ধী-বিরোধী হৈ হল্লা নিতান্ত কম হয়নি। ঘটনাগুলি তুচ্ছ হলেও গান্ধীর বাস্তববোধ এবং সত্যের প্রয়োগে তাঁর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপেক্ষিক নমনীয়তার দিকটি এতে বেশ পরিস্ফুট।

আমেদাবাদে এই সময় হঠাৎ পাগলা কুকুরের উপদ্রব দেখা দেয়। কিন্তু পশুবধ সম্বন্ধে লোকের মনে সংস্কার এমনই প্রবল যে কেউই এই পাগলা কুকুরের আতংক দূর করতে অগ্রসর হয় না।

অবশেষে একদল প্রগতিকামী নাগরিক অগ্রণী হলেন এবং এ বিষয়ে গান্ধীর উপদেশ নিতে এলেন। গান্ধী বল্লেন, পাগলা কুকুরগুলিকে গুলি করে মেরে ফেলা একমাত্র পন্থা। কিন্তু লোকে যখন জানলো অহিংসার পূজারী গান্ধী স্বয়ং কুকুর হত্যা সমর্থন করছেন তখন ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও প্রশ্নের অন্ত রইলো না: এই কি অহিংসা? এই কি সনাতন ধর্ম? ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি আসতে লাগলো গান্ধীকে তীব্র ভৎর্সনা করে। তিনি উত্তর দিলেন, জলাতংকে শত শত মানুষ প্রাণ হারাবে, পাগলা কুকুরগুলির দেখাশোনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো লোক পাওয়া যাবে না, এ অবস্থায় কুকুরদের মৃত্যু-যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ করা এবং জনসাধারণকে আতংকের হাত থেকে বাঁচানোই প্রকৃত অহিংসা। তিনি একথাও বল্লেন যে, ভারতীয়দের উচিত য়ুরোপীঅদের কাছ থেকে কুকুর পালন ও কুকুর পরিচর্যা শিক্ষা করা; কারণ দায়িত্বহীন, ফাঁকা পশুপ্রীতি ভণ্ডামি মাত্র। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে সবরমতী আশ্রমের একটি বাছুরকে নিয়ে। এটি প্রথমটিরই অনুরূপ। বাছুরটি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কদিন ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। তাকে বাঁচানোর সব চেষ্টাই যখন একে একে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং পশু চিকিৎসক বলেন এর প্রাণের কোন আশাই নেই, তখন গান্ধীজী বিধান দিলেন 'দয়াপরবশ হত্যা'র। গোমাতা সাধারণ হিন্দুদের কাছে দেবতার মতো। গান্ধী নিজেও গো-সেবার একজন প্রথম সারির প্রবক্তা। কিন্তু তিনিই বিধান দিলেন গোহত্যার! এবার তীব্র বিরোধিতা করলেন সর্বাগ্রে কস্তুর বাঈ; গোহত্যা চলবে না, কোনোমতেই না। গান্ধী বল্লেন, বেশ তুমি নিজে ভার নাও, চেষ্টা করে ছাখো বাছুরটির কোনো উপায় বিধান করতে পারো কি না। কস্তুর বাঈ চেষ্টা করলেন কিন্তু বাছুরটিকে কিছু খাওয়াতে বা তার কষ্ট লাঘব করতে ব্যর্থ হলেন। তখন তিনি বাধ্য হলেন হাল ছেড়ে দিতে। গান্ধীর নির্দেশে ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিলেন, বাছুরটি অল্পক্ষণের মধ্যেই

মারা গেল। বলা বাহুল্য, এ নিয়েও তুমুল সমালোচনা আরম্ভ হয়ে গেল। গান্ধী নির্বিকার চিত্তে তাঁর কাজের সমর্থনে যুক্তি দেখালেন।

গোঁড়া ধ্যান ধারণার সংগে গান্ধীর দৃষ্টিভংগির এই মৌলিক প্রভেদ যারা বুঝতে পারেন না তারাই তাঁকে গোঁড়া হিন্দু পুনর্জাগরণের পূজারী বলে ভুল করেন। আরেকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। জেলে থাকবার সময় গান্ধী ভাল করে মূল গীতা অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর রাজনৈতিক গুরু তিলকের পথ অনুসরণ করে নিজেও একটি গীতাভাষ্য রচনায় ব্রতী হন। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রবন্ধ আকারে কিছু কিছু প্রকাশিত হয় এবং অবশেষে ১৯১৯ খৃঃ টীকাটিপ্পনিসহ গুজরাতী ভাষায় "অনাসক্তি যোগ" নামে তাঁর গীতা ভাষ্যটি প্রকাশিত হয়। এই গীতার প্রচলিত নাম "গান্ধী গীতা"। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, গীতায় আমরা দেখি যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মনে নির্বেদ উপস্থিত হয়েছে এবং তিনি হিংসা থেকে বিরত হতে উদ্যোগী হয়েছেন। কৃষ্ণই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছেন হিংসার পথ গ্রহণ করতে, যুদ্ধ করতে। গীতার মধ্যে নানা তত্ত্বের অবতারণা আছে একথা ঠিক, কিন্তু সব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন "যুদ্ধকর", "যুদ্ধকর"। মনে হয়, অহিংসা তত্ত্বের বিপরীত মতই যেন গীতার মূল প্রতিপাদ্য, অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যেই গীতার অবতারণা :—"তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত (২।১৮)" "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" (২।৩১); "তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ" (২।৩৭): "ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি" (২।৩৮); "তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্" (১১।৩৩); "যুদ্ধস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্" (১১।৩৪)। গান্ধীর মতে, যে-যুদ্ধের সপক্ষে গীতায় এত কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে নৈতিক যুদ্ধ, এবং যে-ভাষায় বলা হয়েছে তা রূপকের ভাষা। কামনা-বাসনাই সবচেয়ে দুর্নিবার শত্রু।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং" (৩৷৪৩) —কামরূপী দুর্জয় শত্রুকে সংহার করো। মানুষের অন্তরে যে ন্যায় অন্যায়ের দ্বন্দ্ব চলছে, সেটিই আসল ধর্মযুদ্ধ, এবং মনই আসল কুরুক্ষেত্র। সাধারণ ব্যাখ্যায় মনে হয়, গীতার বক্তব্য এই যে অহিংসা নিশ্চয়ই, কিন্তু অহিংস হয়েও যুদ্ধ করা চলে ; কারণ হিংসা বা অহিংসা মনের ব্যাপার, কর্মের নয়। স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগীর কোনো কর্মই, এমনকি যুদ্ধও, পাপের কারণ হয় না। গান্ধী কিন্তু এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলেন, নরঘাতী যুদ্ধের সংগে স্থিতপ্রজ্ঞের কোনো সম্পর্ক কল্পনাই করা যায় না। গীতার শ্লোকের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করলে অবশ্য দাঁড়ায় কর্মফল ত্যাগীর পক্ষে নৃশংস যুদ্ধেও যোগ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছরের নিরন্তর অভ্যাসের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বিনীতভাবে বললেন, "সত্য ও অহিংসা পালন না করে সম্পূর্ণ কর্মফল ত্যাগ করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।" শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন ভাবে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে শাস্ত্রবিরোধী ব্যাখ্যা জোরগলায় প্রচার করার নজির খুব বেশি পাওয়া যায় না। এখানেই গান্ধীর অনন্যতা। যা সত্য তা শাস্ত্রবিরোধী হলেও তিনি সেই সত্যকেই সমর্থন করবেন। এখানে গান্ধী সাহসী, বিদ্রোহী এবং যুক্তিবাদী—অবশ্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও পরীক্ষিত আচরণের উপর তাঁর যুক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু গান্ধীর ব্যাখ্যা কোনো সনাতন পণ্ডিতই মেনে নেন নি। সকলেই এই বলে আক্রমণ করেছেন যে, গান্ধী খৃষ্ট-ধর্মের প্রভাবে গীতার এমন অশাস্ত্রীয়, অহিংস ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু গীতারই নয় সমগ্র মহাভারতের ব্যাখ্যাতেও তিনি অনুরূপ সাহসী, প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধী, দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করেন। মহাভারতের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সরাসরি সমর্থন করা যায় না ; বিশেষত ন্যায়যুদ্ধ এবং অস্ত্রবলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার ধারণা এতে প্রবল ভাবে উত্থাপিত। তাছাড়া ন্যায়ের পক্ষাবলম্বীরাও সর্বদাই ন্যায় পথে রয়েছেন

এমন নয়; পাণ্ডবরা নানা ছল চাতুরি ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তবেই জয়ী হতে পেরেছেন, এবং যিনি স্বয়ং ভগবান সেই শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত শঠতায় অদ্বিতীয়। সত্য ও অহিংসার পূজারী গান্ধীর পক্ষে এসব মেনে নেওয়া অবশ্যই কঠিন। তিনি সাহসের সংগে সরাসরি বল্লেন যে সমগ্র মহাভারতের যদি কোনো প্রতিপাদ্য থাকে তবে তা আর কিছুই নয়, যুদ্ধ ও হিংসার অসারতা প্রতিপন্ন করা। অবশ্য শান্তিপর্ব পর্যন্ত অগ্রসর হলে মহাভারতের এই ব্যাখ্যা একেবারে অসমীচীন মনে হয় না। কিন্তু এখানেও পণ্ডিতদের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করার জন্য গান্ধী বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। গান্ধীর ধরণধারণ ও উক্তিতে অনেক হিন্দু আবরণ থাকলেও গান্ধী প্রথমে গান্ধী, পরে হিন্দু বা অন্য কিছু।

যেমন খাদ্য নিয়ে, উপবাস নিয়ে, তেম্নি ব্রহ্মচর্য নিয়েও গান্ধী নিজের মতো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, এবং বলা বাহুল্য সনাতন ও আধুনিক উভয় পন্থীরাই গান্ধীকে এ বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন। গান্ধী সেক্স বা যৌনাচার বিষয়ে হ্যাভলক এলিস প্রমুখ অনেক প্রামাণ্য লেখকের গ্রন্থ পড়েছিলেন। জন্ম বা পরিবার নিয়ন্ত্রণের ঔচিত্য তিনি মানতেন, এবং আত্মিক উন্নতির পক্ষে তা আবশ্যিক জ্ঞান করতেন। ভারতবর্ষের মতো দেশে এর প্রয়োজনীয়তাও তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধে তিনি সায় দিতে পারেননি। আদর্শবাদীর মতো তিনি নরনারীর সংযম সাধনার উপরই সম্পূর্ণ জোর দিতে চেয়েছেন। আবার বাস্তব সত্য উপেক্ষা করতে না পেরে কখনো স্বীকার করেছেন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া শুধু মানুষের নিজের চেষ্টায় ব্রহ্মচর্যপালন অসম্ভব। কখনো বা হাস্যকরভাবে উপদেশ দিয়েছেন, সংযম সাধনার জন্য বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রী যেন পৃথক ঘরে শয়ন করেন, ঠাণ্ডা জলে স্নান করেন, প্রার্থনা করেন, চরকা কাটেন ইত্যাদি। তবু একথা স্বীকার্য যে, অহিংসা নিয়ে যেমন গান্ধী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, ব্রহ্মচর্য নিয়েও তেমনি পরীক্ষা-

নিরীক্ষা তিনি করেছিলেন এবং আরো পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সূচনায় তিনি সম্ভবত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আইডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মতো তিনিও মনে করতেন যে যিনি বীর্যধারণ করতে পারেন তিনি অসামান্য আত্মিক শক্তির অধিকারী হন। যে প্রাণশক্তি থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয় সেই শক্তিকে হেলায় নষ্ট না করে, অপব্যয় না করে সংহত করা দরকার। বাজে চিন্তা বা অসৎ চিন্তায় এই শক্তি নষ্ট হয়। যিনি প্রকৃত অহিংস হবেন তাঁকে এজন্য চিন্তার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতেই হবে। ১৯৩৮ খৃঃ "হরিজন" পত্রিকায় তিনি লেখেন, ব্রহ্মচারী কামীর মতো নারী-সংসর্গ করবেনা, নারী স্পর্শ করবে না, নারী চিন্তা বা নারীর সংগে বাক্যালাপ করবে না। আসলে সকাম উপভোগের উপরই এই সব নিষেধ। নারীপুরুষের মধ্যে মেলামেশার ক্ষেত্রে ব্রহ্মচারীর পক্ষে কী ধরণের নিষেধ থাকবে, বা আদৌ থাকবে কিনা, এ বিষয়ে গান্ধী গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং এক্সপেরিমেণ্টও করেছেন, কিন্তু তিনি নিজেই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি ; স্বীকার করেছেন সম্পর্ক কী হওয়া উচিত তা তিনি নিজেই এখনো জানেন না। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত এক বইতে (কী টু হেল্‌থ) তিনি বলেছেন, "আমি আমার ব্রহ্মচর্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করতে পেরেছি একথা বলতে পারিনা, কিন্তু আমার ধারণা আমি এবিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। আমি মনে করিনা এই প্রচেষ্টা বা এক্সপেরিমেণ্টের পক্ষে ছত্রিশ বছর খুব বেশি সময়। অম্বিষ্ট যতো মূল্যবান হবে, তার জন্য প্রয়াসও সেই অনুপাতে বৃহৎ হবে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছে। আমার কিছু কিছু এক্সপেরিমেণ্ট এখনো এমন স্তরে পৌঁছায়নি যাতে সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে লাভ হতে পারে। ভবিষ্যতে যদি এই এক্সপেরিমেণ্টের ফলে আমি তুষ্ট হতে পারি, তবে আশা করি তখন এগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারবো। যদি

আমি নিজে সাফল্য অর্জন করতে পারি তবে অন্যদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়ে যাবে।” এক্সপেরিমেণ্টের জন্য সেবাগ্রাম আশ্রমে তিনি অনেকসময় রোগিনীর পরিচর্যায় পুরুষ শুশ্রূষাকারী এবং রোগীর পরিচর্যায় মহিলা নার্স নিযুক্ত করতেন। সেবাগ্রাম বা সবরমতী কোথাও আশ্রমে তিনি কোনো আড়াল রাখেন নি। তাঁর কোনো দেয়ালঘেরা একান্ত ব্যক্তিগত জীবন ছিল না। কোনো গোপনীয়তাই তিনি পছন্দ করতেন না। চার্চিল একবার তাঁকে “অর্ধনগ্ন ফকির” বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত প্রত্যুত্তরে গান্ধী চার্চিলকে লিখেছিলেন, “সম্পূর্ণ নগ্ন” হওয়াই তাঁর একমাত্র উচ্চাকাংখা। সেক্স বা যৌনচিন্তা ও যৌন ক্রিয়া থেকে বিরত বা মুক্ত থাকার উপর গান্ধী বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। নরনারীর মিলন দেহ-সম্ভোগের জন্য, একথা তিনি মানতেন না; সন্তানধারণ ছাড়া আর কোনো কারণেই রতিক্রিয়ার সার্থকতা আছে বলে তিনি মনে করতেন না। নরনারীর মিলিত জীবনকে পবিত্র প্রেমের আধার হিসাবে গড়ে তোলার কথাই তিনি বলেছেন। এই অত্যুচ্চ আদর্শবাদ সত্ত্বেও সেক্স বিষয়ে গান্ধীর মনোভাব ছিল অনুসন্ধানী এবং সাহসী। তিনি বুঝতেন মানুষের পূর্ণ মুক্তির জন্য সেক্স বিষয়েও মুক্তির পথ খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তিনি বৈজ্ঞানিকের মনোভাব নিয়ে এক্ষেত্রেও দুঃসাহসী এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ করেছিলেন, যদিও তার ফললাভের আগেই গান্ধী আততায়ীর হাতে নিহত হন।

১৯২৬ সালকে গান্ধীর মৌন সাল বলা যায়। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে একবৎসরের জন্য তিনি রাজনীতি থেকে একেবারেই সরে থাকবেন। এই সময় কংগ্রেসের সংগে তাঁর যোগাযোগ ছিলনা বল্লেই হয়। ১৯২৬খৃঃর বেশির ভাগ সময় তিনি আশ্রমের মধ্যেই কাটালেন, এবং পত্রিকা-সম্পাদক হিসাবে সাপ্তাহিক লেখাই তাঁর একমাত্র নিয়মিত কাজ হয়ে উঠলো। অবশ্য আত্মজীবনীর ধারাবাহিক লেখা

এবং পরিপূরক রচনা "দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ" প্রকাশ করার কাজও চলছিল।

১৯২৭খৃঃ অধিকাংশ সময় চিকিৎসকের পরামর্শে গান্ধী বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। বৎসরের শেষ দিকে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন, এবং নভেম্বর মাসে খাদি প্রচারে সিংহল ভ্রমণে যান। ফিরে এসে আশ্রমে তিনি পুত্র ৩২ বছর বয়স্ক রামদাসের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। রাজাগোপালাচারির কন্যার সংগে তাঁর ছেলে দেবদাসের বিয়ের ব্যাপার নিয়েও কিছুটা আলাপ আলোচনা করেন। সিংহল যাত্রার ঠিক আগে বড়লাট লর্ড আরউইনের কাছ থেকে গান্ধী একটি চিঠি পান যে ৫ই নভেম্বর দিল্লিতে তাঁর আমন্ত্রণ। দিল্লিতে লর্ড আরউইন তাঁর হাতে একটুকরো কাগজ তুলে দেন। বিলেত থেকে সার জন সাইমন-এর নেতৃত্বে একটি পার্লামেণ্টারি কমিশন ভারতের শাসন সংস্কার বিষয়ে আলোচনার জন্য এদেশে আসছেন, মেমোতে শুধু এই সরকারী-খবরটুকু ছিল। গান্ধী মেমোটি পড়লেন এবং লর্ড আরউইনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই খবরটুকু দেবার জন্যই কি আমায় আমন্ত্রণ করেছেন?" আরউইন জানালেন, "হ্যাঁ"। গান্ধী এর পরে মন্তব্য করেছিলেন, এক টুকরো কাগজ দেবার জন্য বারো-শ মাইল দূর থেকে তাঁকে ডেকে আনার কোনো দরকার ছিলনা, একটি পোষ্টকার্ড ডাকে ফেললেই যথেষ্ট হত। ভারতের ভবিষ্যৎ বৃটিশ পার্লামেণ্ট স্থির করবেন, ভারতের জাতীয় প্রতিনিধিরা নন, এই দৃষ্টিভংগী গান্ধীর পক্ষে একেবারেই গ্রাহ্য নয়। তিনি তাই সাইমন কমিশন বিষয়ে একটুও উৎসাহ দেখালেন না। এই কমিশন ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রতি চপেটাঘাত ছাড়া আর কি? আর ঠিক এই সময় প্রকাশিত হল শ্রীমতী ক্যাথারিন মেয়োর লেখা "মাদার ইণ্ডিয়া," ভারতবর্ষের বিরূপ বর্ণনা ও সমালোচনায় বইটি ঠাসা।

গান্ধী এই বইটিকে "ড্রেনইনসপেকটরের রিপোর্ট" বলে নিন্দা করলেন। সারা ভারতবর্ষ এই বইয়ের জন্য অপমানিত বোধ করলো,

এবং এর বিরুদ্ধে সারা দেশ তোলপাড় হয়ে উঠলো। এই বৃটিশ বিরোধী উত্তেজনার মুখে ১৯২৮খৃঃর ফেব্রুয়ারি সাইমন বোম্বাইতে এসে পৌঁছালেন। কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা সব রাজনৈতিক পার্টি একযোগে সাইমনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাইমন কমিশন যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই কালো পতাকা, হরতাল, এবং "সাইমন ফিরে যাও" শোভাযাত্রা। কোনো নেতৃস্থানীয় ভারতীয়ই সাইমনের সংগে দেখা করেননি, কথা বলেননি, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেননি। গান্ধী তো সাইমনের নামও উচ্চারণ করেননি. সাইমন কমিশনের অস্তিত্বই তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে, কথায় নয় কাজে, সাইমন কমিশনের প্রত্যুত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল। এই প্রত্যুত্তর এল সাইমন বোম্বাই পৌঁছাবার ন-দিন পর, ১২ই ফেব্রুয়ারি, বর্দৌলিতে। বর্দৌলিতে কৃষকদের উপর কর শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছিল, এর প্রতিবাদে গান্ধী আমেদাবাদের মেয়র বল্লভভাই প্যাটেলকে ভার দিলেন প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্বের। বর্দৌলির কৃষকরা কর দেওয়া বন্ধ করলো। প্রায় এক লক্ষ কৃষক মাসের পর মাস হিংসার প্ররোচনা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অহিংস থেকে সরকারী 'নির্যাতন সহ্য করলো, দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হতে থাকলো, গ্রামকে গ্রাম কৃষকদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হল, কিন্তু কিছুতেই আন্দোলন নিবৃত্ত করা গেল না। ১২ই জুন সারা ভারতে হরতাল করে "বর্দৌলি দিবস" পালিত হল। গান্ধী নিজে বর্দৌলিতে গিয়ে হাজির হলেন। অবশেষে বৃটিশ সরকার নতি স্বীকার করলেন এবং করভার কমাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। রবীন্দ্রনাথ নীরবতা ভংগ করে বর্দৌলি আন্দোলনের প্রশংসায় উচ্ছ্বাসভরে লিখলেন, এই আন্দোলনের বীরত্ব মহাকাব্যের বীরত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই ভাবে ভারতবর্ষে চরম সংগ্রামের মনোভাব ক্রমশই দানা বাঁধছিল। কলকাতায় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস পতাকাতলে সামরিক কায়দায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলছিলেন। বর্দৌলি আন্দোলনের

মধ্যে সামরিক য়ুনিফর্ম পরে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর সংগে সবরমতী আশ্রমে গিয়ে দেখা করলেন এবং সারা দেশে আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ জানালেন। মহাত্মা সুভাষচন্দ্রের পরিধানে সামরিক য়ুনিফর্ম দেখে বিরক্ত হলেন এবং অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাবে সায় দিলেন না। ১৯২৮ খৃঃ শুধু বর্দৌলিতে কৃষক আন্দোলনই ঘটেনি, সংগে সংগে ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামী ট্রেড ইউনিঅন আন্দোলনেরও দ্রুত প্রসার ঘটছিল। শ্রমিক ধর্মঘটের প্রসার দেখে বৃটিশ সরকার নতুন ভাবে আতংকিত হলেন এবং ট্রেড ইউনিঅন আন্দোলনের জন্য সমাজবাদী ও সাম্যবাদীদের দমন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এদিকে সাইমন-বিরোধী আন্দোলনে নানা জায়গায় সভা ও শোভাযাত্রার উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করতে লাগলো। লাহোরে লাজপত রায় আহত হয়ে অল্পদিনের মধ্যে মারা গেলেন এবং লক্ষ্মৌতে জওহরলাল নেহরুর গায়ে পুলিশের লাঠি পড়লো। গান্ধী নেহরুকে লিখলেন: "সাবাস! তোমাকে ভবিষ্যতে আরো অনেক সাহসের কাজ করতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে দীর্ঘজীবন দিন, এবং ভারতবর্ষকে পরাধীনতার জোয়াল থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করুন। গান্ধীর পর নেতৃত্ব কার উপর বর্তাবে এ প্রশ্নের উত্তর তখনই স্থির হয়ে গিয়েছিল। তরুণ নেহরুর গান্ধী-নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা ছিল। যদিও ১৯২৬ ও ২৭ সাল তিনি সারা য়ুরোপ ভ্রমণ করে গান্ধীর কাছে যখন ফিরে আসেন তখন তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী এবং শিল্পায়নের সমর্থক বলেই বর্ণনা করেন। কার্ল মার্ক্স ও গান্ধী উভয়ের চিন্তাধারাই নেহরুর মধ্যে সহ অবস্থান লাভ করেছিল। গান্ধীর কাছে যখন জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে লোকে বলতে আসতো যে নেহরু ঈশ্বর মানেন না, গান্ধী জবাব দিতেন অনেক ঈশ্বর-ভক্তের চেয়ে জওহরলাল ঈশ্বরের বেশি কাছাকাছি আছেন। গান্ধীর বিরুদ্ধে যখন লোকে নেহরুর কাছে বলতো যে গান্ধী সোশ্যালিজম মানেন না,

নেহরু জবাব দিতেন, গান্ধী যে সমাজ উন্নয়নের সংগ্রাম করছেন তা সোশ্যালিজমেরই দোসর।

ইতিমধ্যেই শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি আদর্শ বা ইজমের প্রসার ঘটছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক এ বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না। ১৯২৪ খৃঃ কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ভারতে মার্ক্সবাদের অন্যতক আদি প্রবর্তক মুজফফর আহমদ ও তাঙ্গের প্রতি দীর্ঘ কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ১৯২৮ খৃঃ শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং এক গিরনি কামগার ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যাই দাঁড়ায় সত্তর হাজার। এই সময় বোম্বাইতে দীর্ঘ ছমাস ধরে দেড়লক্ষ সুতাকল শ্রমিকের ধর্মঘট চলে। ১৯২৯ খৃঃ ট্রেড ইউনিঅন নেতাদের গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়ে গেল। কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ জন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে মীরাটে নিয়ে যাওয়া হল রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে বিচারের জন্য। এই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা পুরো চার বছর ধরে চালানো হল, উদ্দেশ্য এই দীর্ঘ সময় শ্রমিক নেতারা শ্রমিক আন্দোলনে যাতে অংশ গ্রহণ করতে না পারেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে লেবর পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করায় রামজে ম্যাকডোনাল্ড নতুন সরকার গঠন করলেন এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশা আকাংখার প্রতি বৃটিশ মনোভাবের কী পরিবর্তন ঘটে তা দেখবার জন্য সকলেই উৎসুক হল। কিন্তু বড়লাট আরউইন ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসে ডোমিনিঅন স্টেটাস সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট আশ্বাস দিতে পারলেন না, শুধু আলোচনার জন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু এই গোলটেবিলে দেশীয় রাজ্যের রাজাদেরও যোগদানের অধিকার থাকবে, বল্লেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লিতে মিলিত হয়ে এক পালটা বিবৃতি রচনা করলেন। গান্ধী, অ্যানি বেসান্ত ও নেহরু রচিত এই বিবৃতি দিল্লি ইশতাহার নামে খ্যাত। তাঁরা দাবী করলেন, রাজনৈতিক আলোচনার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ,

এবং সেজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান। বৈঠকে কংগ্রেসের বিশেষ ভূমিকার কথাও বলা হল এবং বিশেষ জোরের সংগে বলা হল যে কেবলমাত্র আলোচনার জন্য কোনো গোলটেবিল বৈঠকের প্রয়োজন নেই। গোলটেবিল বৈঠকের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত ভারতের ডোমিনিঅন স্টেটাসের জন্য একটি গঠনতন্ত্র রচনা করা। গন্ধী যখন ডোমিনিঅন স্টেটাসের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দাবী করলেন, কোনো প্রতিশ্রুতি তখন পাওয়া গেল না। সুভাষচন্দ্র এই ইশতাহারকে নেতৃবৃন্দের দুর্বলতার দলিল বলে সমালোচনা করলেন এবং পরে জওহরলাল নেহরুও সুভাষচন্দ্রের মতে সায় দিলেন।

এর পর কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো লাহোরে, সভাপতি হলেন তরুণ জওহরলাল নেহরু। তিনি কংগ্রেস এবং ট্রেড ইউনিঅন কংগ্রেস উভয়েরই সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সুভাষচন্দ্র এই অধিবেশনেই ভারতে বৃটিশবিরোধী পালটা সরকার গঠনের ঘোষণা দাবী করলেন, কিন্তু নেহরু অতদূর না গেলেও তাঁদের দুজনের আগ্রহেই ডোমিনিঅন স্টেটাসের বদলে একেবারে "পূর্ণ স্বরাজ"-এর প্রস্তাব পাশ হল। প্রস্তাবে বলা হল, কংগ্রেস সদস্যরা আইন সভা থেকে বেরিয়ে আসবে এবং গোলটেবিল বৈঠকও বর্জন করবে; এখন থেকে ভারতবর্ষের একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। আন্দোলন কখন কী ভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণ করবার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হল গান্ধীজীর ওপর। ১৯২৯ খৃঃ রাত বারোটায় লাহোরে স্বাধীন ভারতের নামে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হল।

১৯৩০ খৃঃ জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ এলেন সবরমতী আশ্রমে। তিনি মহাত্মার কাছে জানতে চাইলেন, এরপর কী? গান্ধীর মনেও ঠিক এই প্রশ্নই আন্দোলিত হচ্ছিল। তিনি গুরুদেবকে বল্লেন, "আমি রাতদিন ভাবছি, ভীষণ ভাবছি, কিন্তু চারিদিকে অন্ধকার, এর মধ্যে আমি কোনোই আলো দেখতে পাচ্ছিনা।" সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে বলেই গান্ধী তাঁর দায়িত্ব কীভাবে পালন করবেন

তাই ভাবছিলেন। লর্ড আরউইন ঘোষণা করলেন, গোলটেবিল বৈঠকের কাজ হবে শুধু সুপারিশ করা, কিন্তু সেই সুপারিশ গ্রহণে বৃটিশ সরকারের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। গান্ধী এবার সাহসী প্রত্যাঘাতের প্রহর গণনা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন ২৬শে জানুয়ারি সারা ভারতে "স্বাধীনতা দিবস" উদযাপিত হবে। ১৯৩০ খৃঃ ২৬শে জানুয়ারি প্রতি শহরে ও গ্রামে যে উদ্দীপনার মধ্যে এই স্বাধীনতা দিবস পালিত হল তাতে সন্দেহ রইলো না যে সারা দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম মুহূর্তের দিকেই চলমান। এই দিন স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষিত হল। এই উপলক্ষে সর্বত্র পতাকা উত্তোলিত হল এবং গান্ধী-রচিত স্বাধীনতার শপথবাক্য সমবেত ভাবে পাঠ করা হল। এতে বলা হল: "আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক জাতির মতো ভারতীয়দেরও স্বাধীনতালাভের অলংঘনীয় অধিকার রয়েছে। তাদের অধিকার আছে নিজেদের শ্রমের ফল এবং জীবন ধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি ভোগ করার এবং আত্মবিকাশের সর্বপ্রকার সুযোগ লাভ করার। আমরা আরো বিশ্বাস করি, যদি কোনো সরকার কোনো জাতিকে এইসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের উপর পীড়ন চালায়, তবে সেই জাতির অধিকার আছে এমন সরকারের পরিবর্তন বা উচ্ছেদ ঘটানোর। ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণকে শুধু স্বাধীনতা থেকেই বঞ্চিত করেনি, পরন্তু জনগণকে শোষণ করার উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, এবং ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকারে ধ্বংস করেছে। অতএব আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষ অবশ্যই বৃটিশের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিবে।" এর চারদিন পর ৩০শে জানুয়ারি তিনি এগারো দফা সম্বলিত এক দাবী বা প্রোগ্রাম ঘোষণা করে বল্লেন, তিনি আইন অমান্য বন্ধ রাখতে রাজি আছেন এবং স্বাধীনতার দাবী স্থগিত

রাখতেও প্রস্তুত, যদি বৃটিশ সরকার এই এগারো দফা রূপায়ণে রাজী থাকেন। এই এগারো দফা হচ্ছে :—মাদক ব্যবসা বে-আইনি করা; টাকার অবমূল্যন রদ; জমির উপর কর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস; লবণ শুল্ক লোপ; সামরিক ব্যয় অবিলম্বে অন্তত পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস; আই-সি-এস দের বেতন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস; বিদেশী বস্ত্রের উপর কর স্থাপন; উপকূল বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা; হত্যার অপরাধে অপরাধী ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি; গোয়েন্দা বিভাগ লোপ; এবং আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দান।

ফেব্রুয়ারি মাসে সবরমতীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসলো। আইন অমান্য আরম্ভ হবে স্থির হল, কিন্তু শুধু তারাই এই অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবে যারা পূর্ণ-স্বরাজ লাভের জন্য অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী। গান্ধীজী স্পষ্টই বল্লেন, আইন অমান্য আন্দোলনে ঝুঁকি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-ঝুঁকি নিতে হবে। বৃটিশ সরকারের সংগঠিত হিংসার বিরুদ্ধেই এই সংগঠিত অহিংস সংগ্রাম। কিন্তু অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের পাশাপাশি যদি সহিংস ঘটনা ঘটতে থাকে তাহলেও এবার বর্দৌলির মতো আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা উঠবেনা। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, হিংসার বিরুদ্ধে অহিংসার সংগ্রাম, দেশী বা বিদেশী যেখান থেকেই আসুকনা কেন, সর্বপ্রকার হিংসার বিরুদ্ধেই এই সর্বাত্মক সংগ্রাম চলবে এবং চলতে থাকবে। কিন্তু আইন অমান্য কী দিয়ে শুরু করা হবে তখনো তা স্থির করা হয়নি। সারা ফেব্রুয়ারি মাস গান্ধী চিন্তা করলেন। অবশেষে মার্চ মাসের গোড়ায় তিনি পথ খুঁজে পেলেন। লবণ আইন অমান্য দিয়েই আন্দোলন শুরু করা হবে। ২রা মার্চ তিনি ভাইসরয়ের কাছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক পত্র লিখলেন, এবং শেষবারের মতো আবেদন জানালেন যেন তাঁর এগারো দফা দাবী বা কর্মসূচি সরকার কার্যকরী করেন, অন্যথায় তিনি আইন, বিশেষত লবণ আইন, অমান্য করতে

বাধ্য হবেন। ভাইসরয় সংগে সংগে জবাব দিলেন, তিনি অপারগ, দুঃখিত। গান্ধী বল্লেন, "নতজানু হয়ে আমি রুটি ভিক্ষা করলাম, বদলে পেলাম পাথর।" তিনি লিখলেন, গোটা ভারতবর্ষ একটা বৃহৎ জেলখানা। আমি বৃটিশের আইন স্বীকার করিনা, এবং এই বাধ্যতা-মুলক শান্তির শোকাবহ একঘেয়েমি ভংগ করা আমি আমার পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি; কারণ এই তথাকথিত শান্তি জাতির অন্তরকেই পিষ্ট করছে।

১২ই মার্চ, ১৯৩০। আটাত্তর জন আশ্রমিক সংগে নিয়ে গান্ধী সবরমতী থেকে তাঁর ঐতিহাসিক ডাণ্ডী যাত্রা শুরু করলেন। এই দলে পুরুষ, মহিলা, হরিজন, মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু সকলেই ছিলেন, এবং সর্বাগ্রে ছিলেন মহাত্মা। প্রায় আড়াইশো মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডী, যেখানে লবণ সহজলভ্য প্রকৃতির দান—মাটিতে, জলে, ছড়ানো; সেখানে তিনি লবণ আইন অমান্য করে লবণ সংগ্রহ করবেন। "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় আগেই গান্ধী তাঁর গন্তব্য, যাত্রাপথ এবং সত্যাগ্রহীদের প্রত্যেকের নাম প্রকাশ করেছিলেন। দীর্ঘ আড়াইশো মাইল তিনি দলবলসহ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করবেন। তারপর চব্বিশ দিন ধরে চললো এই কঠিন পদযাত্রা, যেন এক পবিত্র তীর্থ-যাত্রা। পথে নেহরু ও অন্যান্য কংগ্রেসকর্মী গান্ধীর সংগে দেখা করলেন এবং তাঁর নির্দেশ নিলেন; পথের দুধারে শত শত গ্রাম পতাকা ও পুষ্পমাল্যে আলোকিত হল, কৃষক ও গ্রাম-বাসীদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে দিতে তিনি অগ্রসর হলেন। সকাল সন্ধ্যায় উপাসনা তো ছিলই, তা ছাড়া দলের প্রত্যেকেই এক ঘণ্টা করে সুতো কাটতেন এবং রোজনামচা লিখতেন। এঁদের মধ্যে সরোজিনী নাইডুও ছিলেন। যতোই লবণ পদযাত্রা সমুদ্র-তীরের দিকে পৌছাতে লাগলো ততোই অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো এবং ডাণ্ডীতে যখন তাঁরা এসে পৌছালেন দেখা গেল উনআশি জনের পরিবর্তে হাজার হাজার নারীপুরুষ সেখানে জমায়েত।

৬ই এপ্রিল ভোরবেলা প্রার্থনার শেষে গান্ধী সমুদ্রতীর পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন এবং বালুতট থেকে একদলা লবণ হাতে তুলে নিলেন। এই ভাবে প্রতীকের আকারে সারা দেশের কাছে তিনি আইন অমান্যের সংকেতটি পৌঁছে দিলেন।

সংকেত ছড়িয়ে পড়লো দ্রুত, গুজরাত, বাংলা, বিহার, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব সর্বত্র। আইন অমান্যের জোয়ারে গোটা শাসন যন্ত্র ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। তরুণ, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, গ্রামীন, শহরবাসী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, হাজারে হাজারে বেরিয়ে পড়লো আইন অমান্য করতে। গ্রেপ্তার, পুলিশের লাঠি, এমনকি গুলিতে পর্যন্ত তারা দৃকপাত করলো না। দেখা গেল সর্বত্র সভা হচ্ছে, শোভা-যাত্রা হচ্ছে, ইশতাহার পড়া হচ্ছে, বিলি হচ্ছে; বেআইনি ভাবে লবণ তৈরী হচ্ছে, বিলি হচ্ছে; সমুদ্রতীরের কৃষক, ধীবর ও গ্রামবাসীরা সানন্দে লবণ তৈরি ও সংগ্রহ করছে। আমেদাবাদ শহরে প্রকাশ্যেই বে আইনি নুনের ডিপো খোলা হল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ লোক গ্রেপ্তার হল। সবরমতী আশ্রম থেকে রামদাস, দেবদাস গান্ধী ও মহাদেব দেশাইকে গ্রেপ্তার করা হল। এলাহাবাদে জওহরলাল নেহরুও গ্রেপ্তার হলেন। বল্লভভাই ও বিঠলভাই প্যাটেল এবং চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কেউই বাদ গেলেন না। বহু সরকারী কর্মচারী পদত্যাগ করলেন। সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল; প্রতিবাদে কয়েকটি পত্রিকা তাদের প্রকাশই বন্ধ কোরলো এবং দেশব্যাপী হরতাল পালিত হল। লবণ আইন অমান্যের সংগে সংগে ১৯২১ সালের মতো বিদেশীবস্ত্র বয়কট এবং মাদকদ্রব্য বর্জন পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগলো। অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি সহিংস বিদ্রোহও প্রকাশ পেতে আরম্ভ কোরলো। চট্টগ্রামে বেশ কয়েকজন অসীম সাহসী বাঙালী তরুণ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যর্থ চেষ্টায় প্রাণ দিলেন এবং আরো অনেকে বৃটিশ বিরোধী সন্ত্রাসবাদের পথে অগ্রসর হলেন। এদের নেতৃত্বে ছিলেন

"মাষ্টারদা" বা সূর্য সেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গফফর খাঁ বা বাদশা খান-এর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যখন জনতা অশান্ত হয়ে ওঠে তখন মিলিটারি সাঁজোয়া গাড়ী ব্যবহার করা হয় এবং একটি গাড়ীতে ক্রুদ্ধ জনতা অগ্নিসংযোগ করলে অন্য একটি গাড়ী থেকে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মেশিনগান চালনা করেন এবং এতে সত্তর জন নিহত হন। এরপর পেশোয়ার সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং পুলিশ গোটা শহর পরিচালনার ভার গফফর খানের খুদা-ই-খিদমতগার বা লালকোর্তার হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর যখন মিলিটারি আসে, হিন্দু গাড়োয়ালি রাইফেলধারী সৈন্যরা নিরস্ত্র মুসলমান জনতার উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। তখন গুর্খা সৈন্য আমদানি করে গুলি চালানো হয় এবং বিদ্রোহী গাড়োয়াল সৈন্যদের করা হয় কোর্টমার্শাল। ১লা মে তারিখে গান্ধী বৃটিশ দমননীতিকে "গুণ্ডারাজ" আখ্যা দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, শীগগিরই তিনি বোম্বাই থেকে দেড়শো মাইল দূরে "ধরাসনা" নামক সরকারী লবণ কুঠি দখল করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকসহ রওনা হবেন এবং লবণ কুঠির ভার জনসাধারণের হাতে তুলে দেবেন।

অবশেষে ৪ঠা মে গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হল। ডাণ্ডীর অনতিদূরে এক গ্রামে একটি আমগাছের তলায় গান্ধী নিদ্রিত; মাঝ রাতে সুরাট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এলেন ত্রিশ জন সশস্ত্র কনস্টেবল সংগে করে, ১৮২৭ খৃঃর পঁচিশ নং রেগুলেশন অনুযায়ী গান্ধীকে গ্রেপ্তার করলেন। এই আইনের ধারায় কারণ না দর্শিয়ে এবং বিনা বিচারে গ্রেপ্তারের বিধান দেওয়া আছে। গান্ধীকে ডাণ্ডী থেকে যারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হল। গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া মাত্র স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হল সর্বত্র। সামান্য অজুহাতে গুলি চালানো হল কলকাতায়, দিল্লিতে। বোম্বাইয়ের সুতাকল এবং রেলওয়ে কারখানা বন্ধ হয়ে গেল; শোলাপুরে সুতাকল শ্রমিকদের সংগে পুলিশের সংঘর্ষে কয়েকজন পুলিশ নিহত হলেন এবং শ্রমিকগণ জাতীয় পতাকা

উত্তোলন করে নিজেরাই নিজেদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সুদূর বরিশালে ক্রুদ্ধ জনতা একদল পুলিশকে একটি স্কুলঘরে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দিল, যেমন চৌরিচৌরাতে ঘটেছিল এক দশক আগে। প্রভেদ এই যে এখানে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরাই এগিয়ে এসে দরজা ভেঙে জনতা এবং আগুনের হাত থেকে বন্দী পুলিশদের উদ্ধার করেন। লক্ষণীয় যে আইন ও শৃংখলার নামে ইংরেজ রাজকর্মচারীরা বহুক্ষেত্রে বহু দমনপীড়ন চালানো সত্ত্বেও কোথাও একজন ইংরেজেরও প্রাণহানি ঘটেনি। গান্ধীকে গ্রেপ্তারের দুসপ্তাহের মধ্যে "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান" (১৭ই মে) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এক বিবৃতি প্রকাশিত হল, তাতে রবীন্দ্রনাথ বল্লেন: "যারা প্রাচ্যদেশ থেকে বহুদূরে ইংলণ্ডে রয়েছেন তাদের এখন বোঝা দরকার যে এশিয়া মহাদেশে ইয়োরোপ তার পূর্বের নৈতিক গরিমা সম্পূর্ণ হারিয়েছে। সারা বিশ্বে সুবিচার এবং উচ্চনীতিবোধের ধারক বলে এখন আর তাকে কেউ মনে করেনা; মনে করে য়ুরোপ শুধু পাশ্চাত্য জাত্যাভিমানের প্রবক্তা এবং বিদেশে পরজাতির শোষক। য়ুরোপের পক্ষে এটি বাস্তবিকই এক নিদারুণ নৈতিক পরাজয়। যদিও এশিয়া দৈহিক ক্ষেত্রে দুর্বল, এবং যেখানে চরম স্বার্থ বিঘ্নিত সেখানেও আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করতে অক্ষম, তবু পূর্বে যেখানে য়ুরোপের প্রতি তার উচ্চ ধারণা ও শ্রদ্ধা ছিল এখন তার পরিবর্তে সে য়ুরোপকে নীচ বলে মনে করে এবং তার দিকে ঘৃণাভরে তাকায়।"

গ্রেপ্তারের পূর্বে গান্ধী "ধরাসনা" লবণকুঠি দখলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর এই কর্মসূচি রূপায়ণের ভার নিলেন মনিলাল গান্ধী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। এই অভিযানে আড়াই হাজার স্বেচ্ছাসেবক অংশ গ্রহণ করলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দেশ্য করে শ্রীমতী নাইডু এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বল্লেন, "গান্ধীজীর দেহ এখন কারাগারে, কিন্তু তাঁর আত্মা আমাদের সংগে। ভারতবর্ষের সম্ভ্রম এখন আমাদের হাতে। আমরা কোনো অবস্থাতেই হিংসার

আশ্রয় নেবোনা। আমরা মার খাবো কিন্তু বাধা দেবোনা, হাত তুলবো না, প্রত্যাঘাত হানবো না। ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদদাতা মার্কিন সংবাদিক ওয়েব মিলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এই অভিযানের সময় ধরাসনায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রেরিত মর্মন্তুদ বিবরণীতে জানা যায় যে, চারিপাশের পরিখা অতিক্রম করে কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত এগোতেই স্বেচ্ছাসেবকদের মাথার উপর অজস্রধারে বর্ষিত হয় ইস্পাতবাঁধানো পুলিশের লাঠি; ওদিকে বেড়ার মধ্যে পঁচিশ জন রাইফেলধারী রাইফেল উঁচিয়ে প্রস্তুত। একজন সত্যাগ্রহীও হাত তুললো না, আঘাত ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা কোরলো না, ক্রমাগত মাথার খুলি ভাঙার ও আর্ত চীৎকারের শব্দে আকাশ মুখরিত হয়ে উঠলো। একদল সম্পূর্ণ দলিত ও সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়তে না পড়তে আরেকদল একই ভাবে আশ্চর্য মনোবল নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। আঘাত, বেদনা, মৃত্যু সব তুচ্ছ করে এই আত্মাহুতি ক্রমাগত চলতে লাগলো।

সত্যাগ্রহীদের শাদা পোষাক রক্তে লাল এবং দেহ পিষ্ট, ছিন্ন, ভূলুণ্ঠিত হল। আহত বা নিহতদের সরাবার মতো যথেষ্ট স্ট্রেচারবাহকও ছিলনা। একসংগে প্রায় বিশ জনকে স্তূপীকৃত ভাবে রক্তাক্ত স্ট্রেচারে করে বয়ে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এর পর পুলিশবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে শান্ত সত্যাগ্রহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অমানুষিক ভাবে এলোপাথাড়ি লাথি মারতে লাগলো; পেটে, তলপেটে কোথাও বাদ দিলনা; হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে পরিখার কাদাজলে ছুঁড়ে দিয়ে তার উপর লাঠি চালাতে লাগলো। মিলার যাতে ভারতের বাইরে রিপোর্ট পাঠাতে না পারেন সরকার সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু তবু সহস্রাধিক সংবাদপত্রে সারা পৃথিবী মিলার-প্রদত্ত রিপোর্ট ছাপা হল। মিলার রিপোর্টের সংগে লিখে পাঠালেন: "রিপোর্টার হিসাবে আঠারো বছরে বিশটি দেশে আমি ঘুরেছি এবং অসংখ্য গোলোযোগ, দাংগাহাংগামা, পথযুদ্ধ এবং বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু আমি

কখনো ধারাসনের মতো বীভৎস দৃশ্য দেখিনি।" শুধু ধারাসনেই নয় অনুরূপ লবণকুঠি অভিযান আরো অনেক জায়গায় ঘটেছিল—বোম্বাইয়ের শহরতলী ওয়াডালায়, কর্নাটকের অন্তর্গত সানিকাট্টায়। সানিকাট্টা অভিযানে লাঠি ও বুলেট অগ্রাহ্য করে দশ হাজার অভিযাত্রী হাজার হাজার মণ তৈরি লবণ লবণ-কারখানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। প্রত্যহ কোথাও না কোথাও, কোনো না কোনো প্রতিবাদ দিবস, শোভাযাত্রা, হরতাল, বয়কট, পিকেটিং, গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ, মৃত্যু ঘটছিলোই। গান্ধী দিবস, পেশোয়ার দিবস, গাড়োয়াল দিবস, শহীদ বিবস প্রভৃতি উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করছিল। বোম্বাই এবং অন্য বড় বড় শহরে বিদেশী কাপড় বয়কট আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছিল। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকার ভূমিকা এক্ষেত্রে ছিল বিশেষ দ্রষ্টব্য। বৃদ্ধা কস্তুরবাঈ গান্ধী ও মতিলাল নেহেরুর সহধর্মিনীও পিকেটিংএ অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক কাপড়ের দোকানের সামনে ভলান্টিয়ার মোতায়েন, কোনো ক্রেতা তাদের মাড়িয়ে যেতে বা আসতে পারেন না ; কোনো বিলিতি কাপড় বোঝাই গাড়ীও যেতে বা আসতে পারেনা। প্রতিটি গলির মোড়ে স্বদেশী ইনসপেক্টর সব কিছু দেখে পরীক্ষা করে দিচ্ছেন, প্রতিটি গুদামে তারা মাল পরীক্ষা করে দেখছেন এবং স্বদেশী মতে "বেআইনি" কাপড় বাজেয়াপ্ত করছেন। প্রত্যেক দিন প্রভাতে প্রভাতফেরি বেরোতো, স্বদেশীগান গেয়ে গেয়ে বিলিতি দ্রব্য বর্জনের আওয়াজ উঠতো এবং হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু, এই সংকল্প উচ্চারিত হত। ফলে বিলিতি বস্ত্রের আমদানি শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে গেল, সিগারেট আমদানি হ্রাস পেল শতকরা ৮৫ ভাগ। বোম্বাইতে ইংরেজ মালিকানার ১৬টি কাপড় কল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল ; পক্ষান্তরে ভারতীয় মালিকানার মিলগুলিতে ডবল ডবল শিফটে কাজ চলতে লাগলো। শতাধিক দেশী মিল লিখিত ভাবে অংগীকার কোরলো তারা খাদি বস্ত্রের সংগে

প্রতিযোগিতা করবে না, আঠারো কাউন্টের নিচে কোনো সুতো দিয়ে তারা মিলে কাপড় তৈরি করবে না। ১৯২৯ খৃঃ-র তুলনায় ১৯৩০ খৃঃ খাদির উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ বাড়লো, খাদি ভাণ্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল দ্বিগুণ। সারা ভারত কাটুনি সংঘের অধীনে প্রায় দেড়লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হল। বিলাতের "ডেইলি মেইল" পত্রিকা লিখলেন, ভারত থেকে সর্বশেষ প্রাপ্ত সংবাদ সম্ভবত হবে এই যে ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ। ৩০ জুন অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে কারাগারে পাঠানো হল, এবং রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য স্থান সংকুলানের জন্য সাধারণ কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হতে লাগলো ; তা ছাড়া কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে বহু বিশেষ ধরণের জেল তৈরি করা হল। জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রের ওপর সরকারী আঘাত আসতে লাগলো এবং বহু ছাপাখানা, সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেল। আমেদাবাদে "নবজীবন প্রেস" বাজেয়াপ্ত করা হল এবং "ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও "নবজীবন" পত্রিকা দুইই সাইক্লোস্টাইল করে প্রকাশিত হতে লাগলো। জুলাই মাসে বিলাতের "অবজার্ভার" পত্রিকা লিখলেন, ভারতস্থ ইংরেজদের মধ্যে এখন চরম পরাজিত মনোভাব ও নৈরাশ্য।

জুলাই মাসে ভাইসরয় কংগ্রেসের সংঙ্গে মিটমাটের প্রয়োজনীয়তা কিছুটা হৃদয়ংগম করলেন। সপ্রু ও জয়াকরকে মীমাংসার সূত্র অন্বেষণে পাঠানো হল। জেলেই গান্ধী, মতিলাল ও জওহরলালের সংগে তাঁরা সাক্ষাৎ করলেন। প্রকৃতপক্ষে যারবেদা জেলে গান্ধীর কাছে অন্য সবাইকে এই উপলক্ষ্যে নিয়ে আসা হল। কিন্তু আলাপ আলোচনার পর ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস-নেতারা এক বিবৃতি প্রকাশ করে বল্লেন : আমরা এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছি যে আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে সম্মানজনক কোনো মীমাংসায় আসার সময় এখনো আসেনি। বড়লাটের মীমাংসা প্রচেষ্টার যারা কঠোর সমালোচক তারা এতে খুশি হলেন। চার্চিল বিদ্রূপ ভরে বল্লেন, "ভারত সরকার

গান্ধীকে কারাগারে আটক রেখে তাঁর সেলের দরজার বাইরে বসে এতদিন তাঁর কাছেই প্রার্থনা করছিল তিনি যাতে সরকারের মুশকিল আশান করে দেন !"

এদিকে দমননীতি অব্যাহতই চলছিল। সারা দেশে নেতারা গ্রেপ্তার হচ্ছিলেন এবং সর্বত্র কংগ্রেস কমিটিগুলি বেআইনি ঘোষণা করা হচ্ছিল। এর ফলে কংগ্রেস প্রকাশ্য রাজপথ ছেড়ে আত্মগোপন করলো বটে কিন্তু তার অদৃশ্য অস্তিত্ব প্রতিদিন অনুভূত হতে লাগলো। গোপনে কংগ্রেস বুলেটিন মুদ্রিত ও প্রচারিত হতে লাগলো। পথের মোড়ে বিনা নোটিশে স্বল্পক্ষণের সভা হতে লাগলো। শহরগুলিতে প্রকৃতপক্ষে দ্বৈত সরকার চালু হয়ে গিয়েছিল। সামান্য কিছু রাজভক্ত মানুষ বৃটিশ আইনের আওতায় ছিল, বাকি অধিকাংশই ছিল কংগ্রেসের আওতায়। আইন অমান্য অন্দোলনের একটি বিশেষ দিক ছিল খাজনা বন্ধ। সরদার প্যাটেল জেল থেকে ছাড়া পাবার পর আবার বর্দৌলি সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। বৃটিশ দমননীতি এমন নিষ্ঠুর পর্যায়ে উঠেছিল যে এক সময় আশি হাজার গ্রামবাসী প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে অস্থায়ী শিবিরে বসবাস যাপন করতে বাধ্য হয়ে ছিল। গরু, বাছুর, বিছানা, বাক্স, চালডাল, জামাকাপড়, লাঙল, কোদাল সব নিয়ে তারা এই শিবির জীবন যাপন করতে থাকে। এই সব উৎপাটিত পরিবারগুলির প্রত্যেকের কাছে থাকতো একটি করে মহাত্মা গান্ধীর ছবি। সাংবাদিক ব্রেইলসফোর্ড তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা বাড়ীঘর ছেড়ে চলে এলে কেন ?" ওরা উত্তর দিয়েছিলো, "মহাত্মাজী জেলে রয়েছেন, তাই।"

বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই গোলটেবিল বৈঠক ডাকা স্থির করলেন। উদ্দেশ্য, ভারতের ভাবী শাসন ব্যবস্থার কাঠামো স্থির করা। ১৯৩০ খৃঃ ১২ই নভেম্বর লণ্ডনে এই বৈঠক শুরু হল এবং চলল ১৯৩১ খৃঃ ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। সপ্রু, জয়াকর এবং জিন্না এই বৈঠকে যোগ দিলেন। বৈঠক চলাকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এই

আশা প্রকাশ করলেন যে পরবর্তী বৈঠকে নিশ্চয়ই কংগ্রেস যোগদান করবে এবং তাঁরই নির্দেশে পরবর্তী বৈঠকের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কংগ্রেস নেতাদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হল। ১৯৩১ খৃঃ ২৬শে জানুয়ারি কংগ্রেস-ঘোষিত স্বাধীনতা দিবসে, গান্ধী যারবেদা জেল থেকে ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়েই গেলেন তিনি মতিলাল নেহরুর সংগে দেখা করতে। মতিলাল তখন মৃত্যুশয্যায়। ৬ ফেব্রুয়ারি মতিলাল মারা গেলেন, তাঁর চিতাগ্নির সামনে গান্ধী শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বল্লেন, "এই পূত চিতা আমি জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি।"

এলাহাবাদে ওয়ারকিং কমিটির সভা বসলো, স্থির হল কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা চালাবে। গান্ধী লর্ড আরউইনের কাছে চিঠি লিখলেন, তিনি বড়লাটের সংগে দেখা করতে চান। ১৬ ফেব্রুয়ারি এই সাক্ষাৎকার ঘটলো দিল্লির লাট প্রাসাদে। এই সময় দেশে পুলিশের হামলা এবং স্বদেশী পিকেটিং সমানেই চলছিল, এবং এরই মধ্যে গান্ধী-আরউইন বৈঠকও চলতে লাগলো। উইনস্টন চার্চিল এতে এতই ক্ষুব্ধ হন যে তিনি বিদ্রূপ করে বলেন: "এ এক বিপজ্জনক এবং ন্যক্কারজনক দৃশ্য যে মিঃ গান্ধী এক রাজদ্রোহী, মিডল টেম্পলের আইনজীবী, এখন প্রাচ্য দেশীয় সাধারণ সাজ সেজে অর্ধনগ্ন বেশে মহামান্য ইংলণ্ডের প্রতিনিধির সংগে সমকক্ষ হিসাবে আলোচনা চালাবার জন্য ভাইসরয়ের প্রাসাদের সিঁড়ি ভেঙে উঠছেন, এবং একই সংগে তিনি আবার বিদ্রোহাত্মক আইন অমান্য আন্দোলনেরও সংগঠন পরিচালনা করে যাচ্ছেন।"

অবশেষে ৫ই মার্চ তারিখে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে গান্ধী স্বীকৃত হলেন। সমুদ্রতীরের প্রজারা বিনা শুল্কে লবণ তৈরি করার অধিকার পেল এবং বিদেশী বস্ত্র ও মাদক দ্রব্য প্রভৃতি বর্জনের জন্য শান্তিপূর্ণ পিকেটিং এর অধিকারও স্বীকৃত হল। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রজাদের

ফিরিয়ে দেওয়া হবে স্থির হল, এবং অহিংস রাজবন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হবে, কিন্তু হত্যা প্রভৃতির অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে ছিল তাদের মুক্তি দিতে সরকার অপারগ বলে জানালেন। বিদ্রোহী গাড়োআল রক্ষীদের মুক্তি দিতেও সরকার অস্বীকৃত হলেন। তাছাড়া পুলিশী অত্যাচারের তদন্তের দাবীটিও সরকার মেনে নিতে পারলেন না।

সাময়িক সন্ধির এই শর্তগুলি অনেকের কাছেই মনঃপুত হয়নি। গান্ধী যখন বোম্বাইতে এক সম্বর্ধনা সভায় চুক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বল্লেনঃ "গত এক বৎসর ধরে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, আমাদের চিন্তায়, কাজে, কথায়, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো মনোভাব ছিল না। কিন্তু এখন আমাদের পরিবর্তিত অবস্থায় সন্ধির পরিবেশের সংগে সংগতি রেখে, অন্য সুরে কথা বলতে হবে, অন্যভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কারণ যুদ্ধের পরিবর্তে এখন আমরা শান্তির পথ গ্রহণ করেছি। সত্যাগ্রহী দুর্বল হবে না, কিন্তু আলোচনার পথ পরিত্যাগও করবেনা। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা অবশ্য এখনই সম্ভব হচ্ছেনা, কিন্তু এই দাবী অনিবার্য করে তোলার মতো নৈতিক শক্তিও আমাদের সত্যিই নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, বিদেশী বস্ত্র এবং মাদকদ্রব্য বর্জনের প্রোগ্রাম যখন আমরা সম্পূর্ণ সফল করে তুলতে পারবো শুধু তখনই আমাদের অন্যান্য দাবী অনিবার্য করে তোলা সম্ভব হবে।" ঐ একই দিনে শ্রমিকদের এক সভায় গান্ধী উপস্থিত হলে একদল সাম্যবাদী কর্মী জোর করে সেই সভায় প্রবেশ করেন এবং মঞ্চের উপর রক্তপতাকা স্থাপন করেন। ত্রিবর্ণ পতাকা ও রক্তপতাকার মাঝখানে গান্ধীকে উপবিষ্ট দেখা যায়। একজন কমিউনিস্ট নেতা গান্ধীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, তিনি রাজামহারাজা ও ধনিকের হাতে ক্ষমতা রাখবার জন্যই বড়লাটের সংগে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। "কোথায় গেল আপনার এগারো দফা দাবী? ভগৎ সিং এবং মীরাট [বিদ্রোহীদেরই

বা কী করলেন ? তারা যদি জেলেই থাকলো, তাহলে এই শাস্তির মূল্য কি ?" গান্ধী উত্তর দিতে গিয়ে বল্লেন, "ভারতবর্ষে যে কমিউনিস্টপন্থীরা আছেন তা আমার অজানা নয়। অবশ্য মীরাট জেলের বাইরে আমি তাদের কখনো দেখিনি বা তাদের কোনো বক্তৃতা শুনিনি। মীরাট জেলে দু-বছর আগে কমিউনিস্ট বন্দীদের সংগে আমি দেখা করেছিলাম এবং তাদের সংগে কিছুটা পরিচয়ও হয়েছিল। আজ সন্ধ্যায়ও আমি আবার তাদের একজনের বক্তব্য শুনলাম। আমি কমিউনিস্ট বন্ধুদের বলতে চাই যে তারা যদিও দাবী করেন যে তারা শ্রমিকদের স্বরাজ এনে দেবেন, তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার কিন্তু সন্দেহ আছে। এদেশের তরুণ কমিউনিস্টদের জন্মের অনেক আগে আমি শ্রমিকদের দাবীর সংগে একাত্ম হয়ে সংগ্রাম করেছি, শ্রমিকদের মধ্যেই থেকেছি এবং তাদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়েছি। আমি শ্রমিকদের হয়ে কথা বলার দাবী কেন করি তা অবশ্যই আপনারা বুঝবেন। আমি আপনাদের কাছ থেকে আর কিছু না হোক ভদ্র ব্যবহারটুকু নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। আমি আহ্বান করছি আপনারা আমার কাছে আসুন এবং আমার সংগে যতো খোলাখুলি পারেন সমস্ত বিষয় আলোচনা করুন। আপনারা নিজেদের সাম্যবাদী বলে দাবী করেন। কিন্তু আপনাদের দেখে মনে হয় না আপনারা সাম্যবাদীর মতো জীবন যাপন করেন। আমি আপনাদের বলতে পারি কমিউনিজমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে আমি চেষ্টা করছি। কমিউনিজম মানে ভদ্রতা বর্জন নয়। বলপ্রয়োগ করে দেশের লোককে আপনাদের দলে টানতে পারবেন না। দেশকে আপনাদের পথে চালিত করার জন্য আপনারা হয়তো বিনাশ ঘটাতে পারেন। কিন্তু কতো জনকে আপনারা বিনাশ করবেন ? লক্ষ লক্ষ নিশ্চয়ই নয়। আমি আপনাদের বলি, যদি পারেন আপনারা কংগ্রেসকে স্বমতে নিয়ে আসুন এবং কংগ্রেসের ভার আপনারাই নিন। কিন্তু আপনারা ন্যূনতম ভদ্রতাবোধ বিসর্জন দিলে, তা

পারবেন না। আপনারা অকারণে কেনই বা ভদ্রতাবোধ বিসর্জন দেবেন, যতোক্ষণ ভারতবর্ষ যে কোনো লোকের কথা শুনতে প্রস্তুত? কম্যুনিস্ট পার্টির জন্মের অনেক আগে জাতীয় কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শ্রমিক ও কৃষকদের স্বরাজ না হলে স্বরাজ অর্থহীন।…মীরাট বন্দীদের মুক্তির জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমার যদি ক্ষমতা থাকতো আমি জেল থেকে প্রত্যেকটি বন্দীকেই মুক্ত করতাম।" এর পর গান্ধী নিজেই আরউইনের সংগে সাক্ষাতের জন্য দিল্লি গেলেন। ১৯ মার্চ তিনি বিশেষ করে বড়লাটকে বন্দীমুক্তির কথা বল্লেন এবং ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের ফাঁসির হুকুম রদ করতে বিশেষ অনুরোধ জানালেন। ২৩ মার্চ এই মর্মে আবার আরউইনকে পত্র লিখলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হলনা। ২৩ মার্চ রাত্রে লাহোর জেলে ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হল, এবং শতদ্রু নদীর জলে তাদের দেহাবশেষ ভাসিয়ে দেওয়া হল। ফাঁসির সংবাদ ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে সর্বত্র শোকের ছায়া নামলো এবং জওহরলাল নেহরু বল্লেন, "ভগৎ সিংএর মৃতদেহ ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে থাকবে।" গান্ধী এই ফাঁসির প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিলেন, কিন্তু দেশবাসীকে ক্রোধে উন্মত্ত না হয়ে স্বরাজ অর্জনের জন্য আরো স্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে আহ্বান জানালেন।

২৪ মার্চ সর্বত্র শোক দিবস পালিত হল।

কিন্তু "ভগৎ সিং জিন্দাবাদ" ধ্বনিকে ছাপিয়ে পরদিন ২৫ মার্চ, ১৯৩১, কানপুর শহরে এক আর্ত কলরোল আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললো। সাম্প্রদায়িক দাংগায় জ্বলে উঠলো শহর, এবং ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের তাণ্ডব থামাতে গিয়ে নিহত হলেন গনেশশংকর বিদ্যার্থী। গান্ধী লিখলেন, কোনো চুক্তিপত্রই আমাদের হৃদয়ের মিলন ঘটাতে পারবে না। কিন্তু গনেশশংকর বিদ্যার্থীর মতো বীরত্ব নিশ্চয়ই পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করবে এবং হিন্দুমুসলমানকে এক করবে।

এই বিদ্বিষ্ট পরিবেশের মধ্যে করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসলো। গান্ধী যখন করাচি স্টেশনে পৌঁছালেন বামপন্থী নওজোয়ান সভার কিছু সদস্য গান্ধীবিরোধী ধ্বনি দিতে থাকেন এবং পরে গান্ধীর সংগে খোলাখুলি আলোচনাও করেন। তাঁরা বলেন, গান্ধীর পথে তাঁদের অন্বিষ্ট, ভারতে শ্রমিক ও কৃষকের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, কখনোই সম্ভব হবেনা, এজন্যই তাঁরা গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এই নওজোয়ান সভার নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। গান্ধী করাচী অধিবেশনে এই তরুণদের উদ্দেশ্য করে বহুক্ষণ বক্তৃতা করেন। অহিংসার স্বপক্ষে তিনি বিশেষ করে এই যুক্তি দেখান যে আন্দোলন যদি সহিংস হত তাহলে আর যাই হোক নারীদের এই আন্দোলনে টানা যেতো না এবং ভারতবর্ষের এই বিরাট নারী-জাগরণও সম্ভব হত না। আর কিছু না হলেও শুধু এই জন্যই অহিংস আন্দোলনকে স্বাগত জানানো উচিত। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ গণজাগরণকে ব্যাহতই করে এবং "স্বরাজ"কে ত্বরান্বিত না করে বিলম্বিতই করে। শ্রমিক ও কৃষকদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তরুণ বিরোধীদের সংগে তাঁর কোনোই পার্থক্য নেই; কিন্তু তাঁর বিরোধ স্বরাজ অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে। তিনি এবিষয়ে নিশ্চিত, ভাবীকাল প্রমাণ করবে যে গান্ধীই ঠিক, অন্যেরা বেঠিক। করাচি অধিবেশনে অনেক বাগবিতণ্ডার পর গান্ধীই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হলেন এবং "পূর্ণ স্বরাজ"ই যে কংগ্রেসের লক্ষ্য সেকথাও আবার ঘোষণা করা হল।

কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য ২৯ আগস্ট, ১৯৩১ জাহাজে রওনা হলেন। লণ্ডনে তিনি ইষ্ট-এণ্ডে শ্রীমতী মুরিএল লিস্টার-এর অতিথি হিসাবে কিংসলি হল-এ উঠলেন। গরীব শ্রমিকদের পাড়ার কাছে থাকতে পেয়ে তিনি খুশিই হলেন। প্রথম প্রথম তাঁর কটিবস্ত্র ও সামান্য চাদর ও চটি দেখে অনেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেও ক্রমশ গান্ধী যতোই নানা

স্তরের লোকের সংগে মিশতে লাগলেন ততোই সকলের কাছে তিনি প্রিয় হয়ে উঠলেন। পোষাক সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন : বিলেতে তোমরা এত বেশি পোষাক পরো যে গড়ে আমার পোষাকের ঘাটতিটুকু ঠিক পুষিয়ে যায়। ঐ একই পোষাকে বাকিংহাম প্রাসাদে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরির সংগে চা পানের পর একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনার কি মনে হয়না যে আপনার পরণে প্রয়োজনের তুলনায় কাপড়ের কিছুটা ঘাটতি রয়েছে? গান্ধী হেসে বলেছিলেন, "খুব নেই ; কারণ সম্রাটের গায়ে প্রয়োজনের তুলনায় এত বেশি কাপড় রয়েছে যে হিসাব করলে দেখা যাবে তাতে আমাদের দুজনের প্রয়োজনই মেটে।" আধুনিক মিনি-স্কার্ট-এর যুগ হলে গান্ধী নিশ্চয়ই ঠাট্টা করে বলতে পারতেন যে তিনি পুরুষদের জন্য মিনি-পোষাকের অতি আধুনিক স্টাইল প্রবর্তন করতে অগ্রসর হয়েছেন! বিলাতে তাঁর পাঠ্যাবস্থা সময়ের অনেক বন্ধুর সংগে তিনি দেখা করেন; নিরামিষভোজী হেনরি সল্ট তাদের মধ্যে প্রথম। ইংলণ্ডে তখন বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভারতে বিলিতি বস্ত্র বয়কটের দরুণ ল্যাংকাশায়ারের কাপড়ের কলে ছাঁটাই ঘটেছে সর্বাধিক। গান্ধী ল্যাংকাশায়ারে গেলেন, শ্রমিকদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাদের মধ্যে বক্তৃতা করলেন, এবং ভারতীয়দের দৃষ্টিভংগিও তাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বল্লেন, তোমাদের দেশে ৩০ লক্ষ লোক বেকার, আর আমার দেশে ৩০ কোটি লোক বেকার ও অর্ধবেকার। তোমাদের বেকার ভাতা দেওয়া হয় মাথাপিছু ৭০ শিলিং আর আমার দেশবাসীর গড়ে মাথাপিছু আয় সাড়ে সাত শিলিং। বুঝে দেখ, কী ভয়াবহ অবস্থায় ভারতবাসীরা ইংরেজ শাসনে বাস করছে। আমি আমার দেশবাসী ভাইদের কাছে আত্মিক উন্নতির কথা, ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা কী বোলবো ; তাদের কাছে রুটি আর মাখনই একমাত্র ঈশ্বর এবং তাদের কাছে তা পৌঁছে দিতে পারছিনা। গান্ধীর বক্তৃতা শুনে একজন ইংরেজ বেকার শ্রমিক

বল্লেন, আমি নিজে বেকার। কিন্তু আমি যদি ভারতবর্ষে থাকতাম তাহলে গান্ধী যা বল্লেন আমিও ঠিক তাইই বলতাম।

গান্ধীর সংগে বার্ণার্ড শ-এরও দেখা হল। শর মনে পড়লো তরুণ বয়সে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে নিরামিষভোজী সংস্কার-পন্থীদের দলে তাঁরা দুজনেই ছিলেন সভ্য। শ তাঁর নিজস্ব ভংগিতে বল্লেন, "আমি হচ্ছি ছোটো মহাত্মা (মহাত্মা মাইনর) আর গান্ধী হচ্ছেন বড় মহাত্মা (মহাত্মা মেজর)।" তাঁদের মধ্যে বহুক্ষণ অনেক হাস্য-পরিহাস গল্প-আলোচনা হল। যখন শ-কে প্রশ্ন করা হল, গান্ধী সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? তিনি বল্লেন, "এর চেয়ে কাউকে প্রশ্ন করুন হিমালয় পর্বত সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?" আরেকজন তাঁর সংগে দেখা করতে চাইলেন। তিনি বিখ্যাত চার্লি চ্যাপলিন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে গান্ধী বল্লেন, আমি তো জীবনে এই ভদ্র লোকের নাম শুনিনি; ইনি কে? যখন তাঁকে বোঝানো হল যে চার্লি চ্যাপলিন বিশ্ববিখ্যাত ফিল্ম অভিনেতা, তিনি স্বীকার করলেন যে ফিল্ম জগৎ সম্বন্ধে তাঁর সত্যিই কোনো ধারণা নেই, এবং সানন্দে চ্যাপলিনের সংগে দেখা করতে রাজি হলেন। একজন ভারতীয় ডাক্তারের বাড়ীতে দুজনের সাক্ষাৎ হল এবং গান্ধী চ্যাপলিনকে যন্ত্রযুগের যন্ত্রণা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বল্লেন। চার্লি চ্যাপলিন এর কিছুদিন পরই ফিল্ম তুললেন "মর্ডার্ণ টাইমস"; এতে গান্ধী দৃষ্টি-ভংগির সুস্পষ্ট ছাপ আমরা দেখতে পাই।

গান্ধী কেম্ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজ দেখলেন, যেখানে নেহরু এবং অ্যাণ্ড্রুজ পড়েছেন। গেলেন অক্সফোর্ডে। অধ্যাপক গিলবার্ট মারে ছিলেন গান্ধীর অনুরাগী, তিনি সেখানে গান্ধীকে খুব খাতির করলেন। এখানে অধ্যাপক মারের সংগে ছিলেন অধ্যাপক এডোআর্ড টমসন, যিনি পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখে খ্যাত হন। গান্ধী মণ্টেসরি ট্রেনিং কলেজের নূতন শিক্ষাপদ্ধতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন এবং শ্রীমতী মারিআ মণ্টেসরি তাঁকে "মহাপ্রাণ শিক্ষক" বলে সম্বোধন করলেন।

প্রকৃতপক্ষে এই সব দেখাশোনা এবং ইংলণ্ডের নানা লোকের সংগে মেলামেশাই গোলটেবিল বৈঠকের চেয়ে গান্ধীর কাছে বেশি জরুরি এবং ভালো কাজ বলে মনে হয়েছিল। চার্চিলের দাম্ভিক উক্তিকে লজ্জা দিয়ে "অর্ধনগ্ন ফকির" যখন ভাইসরয়ের প্রাসাদে নয়, একেবারে খোদ বাকিংহাম প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়েই উঠছিলেন, তখন উইনস্টন চার্চিল একবারও সে তল্লাট মুখো হননি। চার্চিল না এলেও চার্চিলের মতো অযৌক্তিক মনোভাবাপন্ন রাজনীতি ও কূটনীতিবিদদের সংগে গান্ধী যখন গোলটেবিলে বসলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ঐ বৈঠক থেকে তাঁকে শূন্য হাতেই ফিরতে হবে। কারণ বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকার এ বৈঠকে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছিলেন যে গান্ধী ভারতের ত্রিশকোটি মানুষের একমাত্র প্রতিনিধি নন, তিনি শুধু কংগ্রেস নামক এক বর্ণ-হিন্দু সংগঠনের নেতা ও প্রতিনিধি। এই সভায় জিন্না মুসলমানদের এবং ডঃ আম্বেদকর অনুন্নত হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসাবে কথা বলার দাবী জানালেন, এবং সেই সংগে দেশীয় রাজ্যের তেইশ জন শাসকও দাবী জানালেন দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ তারা নিজেদের হাতেই রাখবেন। সভায় সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিনক্ষণ ঘোষণার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে গেল, মুখ্য হল ভাবী শাসনতন্ত্রে কার কটা আসন থাকবে। গান্ধী সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোটদানের পদ্ধতি কিছুতেই মানতে রাজি হলেন না, বিশেষত বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াসের মধ্যে তিনি দেখলেন শাসকদের দুরভিসন্ধি। তিনি ঘোষণা করলেন, "একা হলেও আমি জীবন দিয়ে এর প্রতিরোধ কোরবো।" জিন্না ও আম্বেদকর প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রে সায় দিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড হিসাব করে বল্লেন, সংখ্যালঘুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ, কাজেই তাদের পৃথক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত, গান্ধী উত্তর দিলেন তাহলে ঐ একই যুক্তিতে জনসংখ্যার

শতকরা ৫০ ভাগই যেহেতু মহিলা, অতএব শুধু মহিলাদের জন্যই শতকরা ৫০ ভাগ আসন ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বৃটিশ সরকার ভারতের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় তবুও অগ্রসর হলেন এবং ৫ই ডিসেম্বর প্রায় তিনমাস পর গান্ধী প্রকৃত পক্ষে শূন্য হাতেই দেশে ফিরলেন।

ফিরবার পথে তিনি পারি ও সুইত্জারল্যাণ্ড হয়ে যাবেন স্থির করলেন। সুইত্জারল্যাণ্ডে লেমঁ হ্রদের তীরে ভিল্নভ-এ রয়েছেন রমঁ্যা রলাঁ, যিনি ১৯২৪ সালে অর্থাত গান্ধীর সংগে সাক্ষাতের অনেক আগে গান্ধীর এক সুন্দর মর্মগ্রাহী জীবনী লিখেছিলেন। পারিতে গান্ধী এক বিরাট সভায় ভাষণ দিলেন এবং তারপর মীরা বেন, মহাদেব দেশাই প্যারেলালকে সংগে নিয়ে পৌঁছালেন ভিলনভ-এ। গান্ধীর জীবনীতে রলাঁ লিখেছিলেন, "গান্ধী একজন টলস্টয়, কিন্তু টলস্টয়ের চেয়েও ধীর এবং, আমি বোলবো, খ্রীষ্টান অর্থেই আরো বেশি শান্ত।" রলাঁর সংগে গান্ধী শিল্প, ধর্ম, অহিংসা, শ্রেণীবিপ্লব সব বিষয়েই হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা করলেন। রলাঁ পিয়ানো বাজিয়ে বিঠোফেন-এর পঞ্চম সিমফনি গান্ধীকে শোনালেন ; সত্যের পূজারীকে সৌন্দর্যের পূজারী এই ভাবেই তাঁর মনের কথা উপহার দিলেন। এখান থেকে গান্ধী গেলেন রোম। পোপের সংগে তাঁর দেখা হল না, কিন্তু মুসোলিনি গান্ধীর সংগে সাক্ষাত্ করলেন। গান্ধীকে মুসোলিনি যখন ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলেন, গান্ধী সুস্পষ্টই বল্লেন, "আপনারা তাসের দেশ তৈরি করছেন"। তখন টলস্টয়-দুহিতা রোমে বাস করছিলেন। গান্ধী তাঁকে খুঁজে বের করে তাঁর সংগেও দেখা করলেন।

১৯৩১ খৃঃ ডিসেম্বরের শেষে গান্ধী বোম্বাই এসে পৌঁছালেন। অক্টোবরের শেষে ইংলণ্ডে লেবার সরকারের পরিবর্তে রক্ষনশীল টোরি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নূতন ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন শক্ত হাতে ভারত শাসনের পরিকল্পনা করছিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নেহরু ও আবদুল গফ্‌ফর খাঁকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করলেন এবং সর্বত্র যথেচ্ছ ভাবে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ঢালাও হুকুম দিলেন। তাঁর যোগ্য অনুবর্তী হলেন বাংলার গভর্ণর অ্যাণ্ডারসন। গান্ধী বোম্বাই পৌঁছে এইসব গ্রেপ্তারের খবর শুনে ব্যথিত হয়ে বল্লেন, "লর্ড উইলিংডনের কাছ থেকে এই হচ্ছে আমাদের খৃস্‌মাসের উপহার।" ৩ জানুয়ারি গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে কবিকে জাতীয় যজ্ঞে তাঁর যথাসাধ্য আহুতি দিতে বল্লেন, এবং ঐ দিনই গোলটেবিল বৈঠকের সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যে-দুজন ডিটেকটিভ সর্বদা তাঁর সংগে থাকতো তাদের জন্য স্মারক উপহার হিসাবে দুটো ঘড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন ৪ জানুয়ারি, ১৯৩২ গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন। বোম্বাই থেকে তাঁকে আবার যারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হল। সেক্রেটারি মহাদেব দেশাইও কয়েকদিন পর যারবেদা জেলে বন্দী হয়ে এলেন। "ইয়ং ইণ্ডিয়া" ও "নবজীবন" পত্রিকা দুটিও বাজেয়াপ্ত করা হল। কংগ্রেসকে বে-আইনি ঘোষণা করে সংগে সংগে একদিনের মধ্যেই অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাকে বিদ্যুৎগতিতে গ্রেপ্তার করা হল। এবার কংগ্রেস শুধু বে-আইনি ঘোষিত হল তাই নয়, তার সম্পত্তি, ব্যাংকের টাকা, এবং কংগ্রেস-পরিচালিত বিভিন্ন প্রেস ও প্রতিষ্ঠান সবই সরকার দখল করে নিলেন। সবরমতী আশ্রমটি যদিও রেহাই পেল, কস্তুরবাঈ রেহাই পেলন না। তাঁরও জেল হল। বিলাতে উইনস্টন চার্চিল এই সব কড়া ব্যবস্থা নেওয়ায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন। প্রতিবাদে স্বতস্ফুর্তভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হল, কিন্তু নেতৃত্ববিহীন এই আন্দোলন ঠিক আগের মতো জোরালো হল না। দু-মাসের মধ্যে ত্রিশ হাজারের উপর রাজনৈতিক কর্মীর সাজা হল, বহু এলাকায় সান্ধ্য আইন এবং

নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছে পরিচয় পত্র রাখার কড়া হুকুম জারি করা হল। লাঠি চার্জের ফলে বহু ক্ষেত্রে বহু লোক আহত হল, এমনকি নেহরুর জননীকেও মাথায় লাঠির আঘাতে সংগাহীন অবস্থায় রাস্তা থেকে আনতে হল। জেলের মধ্যে বেত মারা, নারীদের উপর নিগ্রহ ইত্যাদি পুরোদমে চলতে লাগলো এবং বহু জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকদের অন্তরীণ করা হল। তাছাড়াও সংবাদ-পত্র প্রভৃতির উপর কড়া সেন্সর ব্যবস্থা চাপানো হল। মীরা বেনকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়নি, কিন্তু পরে যখন তিনি বৃটিশ রাজের অত্যাচার ফাঁস করে দিতে লাগলেন, তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হল।

অগষ্ট মাসে বৃটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করলেন। এতে হিন্দু, মুসলমান, হরিজন, শিখ ও সাহেবদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকলো। বর্ণ হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুর মধ্যে বিভেদের প্রশ্নে গান্ধী বিশেষ বিচলিত হলেন। তিনি ম্যাকডোনাল্ডকে লিখলেন, আপনার এই সিদ্ধান্ত আমাকে জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। তিনি জানালেন, ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি জেলেই অনশন শুরু করবেন। এই অনশনের কথা ঘোষিত হলে অনেকেই বিপন্ন বোধ করলেন, বিশেষত নেহরু। তাঁর আত্মজীবনীতে নেহরু লিখেছেন, "রাজনৈতিক প্রশ্নে মহাত্মার এ ধরনের ধর্মীয় ও ভাবাবেগাপ্লুত দৃষ্টিভংগির জন্য তাঁর উপর আমার খুবই রাগ হয়েছিল।" কিন্তু গান্ধী তাঁর অনশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে। বৃটিশ সরকারকে বাধ্য করবার জন্য এই অনশন নয়, হিন্দু বিবেককে জাগ্রত করাই এর উদ্দেশ্য। মাকডোনাল্ড ইংগিত করেছিলেন যে, বর্ণ হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুরা যদি একমত হন তবে বিকল্প সমাধান তিনি মেনে নিতে পারেন। ২০ তারিখের আগেই চেষ্টা আরম্ভ হল গান্ধীকে অনশন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দুদের কাছে আবেদন করলেন সমস্ত মন্দির ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হরিজনদের জন্য খুলে দেওয়া হোক এবং পণ্ডিত মদনমোহন

মালব্য এই উদ্দেশ্যে একটি কনফারেন্স ডাকলেন। রাজাগোপালাচারি ২০ সেপ্টেম্বর গণ অনশন পালনের আহ্বান জানালেন। অনুন্নত হিন্দু নেতা শ্রীরাজা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন, যদিও ডাঃ আম্বেদকার এই অনশনকে বল্লেন, "রাজনৈতিক চালবাজি।"

অবশেষে সেই ২০ তারিখটি এগিয়ে এল। রাত্রি প্রভাত হবার আগে গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, আজ মংগলবার, রাত তিনটে। কাল দ্বিপ্রহরে আমি অগ্নিদ্বারে প্রবেশ কোরবো। আপনি যদি পারেন আমার প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করবেন, আপনার আশীর্বাদ আমার প্রয়োজন। আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু, কারণ আপনি এমন একজন বন্ধু যিনি আমার সংগে মন খুলে কথা বলেছেন, আপনি যা ভেবেছেন তাই বলেছেন। আপনার মন যদি আমার এই কাজকে ঠিক বলে মনে করে, তাহলে আপনার আশীর্বাদ আমি চাই।" চিঠি ডাকে ফেলবার আগেই কবির টেলিগ্রাম এল, "ভারতের ঐক্য এবং সামাজিক শুদ্ধতার জন্য মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করা প্রয়োজন। আমাদের দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে আপনার মহত্তম তপশ্চর্যা অনুসরণ করবে।" অনশনের দিন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ উপবাসী আশ্রমিকদের সামনে এক ভাষণ দিয়ে বল্লেন, "সূর্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে, তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করেছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটেনি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎ সান্ত্বনা। জাতিভেদ বর্ণভেদ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ ও অসাম্যের প্রতি ভারতবর্ষের যে চরম ঔদাসীন্য ও জড়তা গান্ধীর আমৃত্যু অনশন যে তারই বিরুদ্ধে জ্বলন্ত বিদ্রোহ সে কথা রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দর ভাবে বোঝালেনঃ "যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয় তাকে উৎপাটিত করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপর আমাদের মমত্ব। সেই

প্রশ্রয় প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসানও ঘটতে পারে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন।"

পরদিন আবার ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ, বল্লেন, "আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই; কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি; দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই এক মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।"

অনশন শুরু হবার পর দেখা গেল গান্ধীজী নিজের সংগে সমগ্র হিন্দুসমাজকেও আত্মহোমের অগ্নিদ্বারে প্রবেশ করিয়েছেন। অস্পৃশ্যতার অভিশাপে গোটা সমাজ অভিশপ্ত, এই পাপে যেন প্রত্যেকটি মানুষ অশুচি। এলাহাবাদে, কালিঘাটে, কাশীতে, বোম্বাইতে মন্দিরের কবাট হঠাৎ অস্পৃশ্যদের জন্য অবারিত হল, দিল্লিতে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের পংক্তিভোজন বসে গেল। নেহরু বলতে বাধ্য হলেন, "গান্ধী একজন জাদুকর, জনগনের মনকে কি করে টানতে হয় তিনি চমৎকার জানেন।" জনগণের হৃদয় আছে, হৃদয় দিলে সেখানে সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু পোক্ত রাজনৈতিক নেতারা বুদ্ধি ও হিসাবের কারবারী, তাঁরা সাড়া দেন সবচেয়ে শেষে, অনেক যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে তারপর। পাঁচদিন উৎকণ্ঠার পর বর্ণহিন্দু ও হরিজন নেতারা অবশেষে একমত হয়ে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী পৃথক নির্বাচনের দাবী পরিত্যক্ত হল বটে কিন্তু হরিজনদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বাড়ানো হল। এই চুক্তি গান্ধীও অনুমোদন করলেন এবং ২৬ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে লণ্ডন ও দিল্লি থেকে বৃটিশ ও ভারত সরকার একসংগে এই চুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করার পর মহাত্মা অনশন

ভংগ করলেন। এই সময় তাঁর পাশে ছিলেন কস্তুরবাঈ এবং সেই মুহূর্তে সুদূর শান্তিনিকেতন থেকে এসে পৌঁছেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো" গীতাঞ্জলির এই গানটি তাঁকে তখনই গেয়ে শোনালেন।

গান্ধী এখানেই থামলেন না। অনশনের সমাপ্তি দিয়ে তাঁর অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের হল শুরু। এই আন্দোলনের নাম দিলেন তিনি "হরিজন" আন্দোলন। হরিজনদের সেবার জন্য তিনি একটি পৃথক সংস্থাও তৈরি করলেন। বর্ণহিন্দু হিসাবে তাঁর জন্ম হলেও তিনি নিজেকে এরপর থেকে স্বেচ্ছাবৃত হরিজন বলে ঘোষণা করলেন। "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, গান্ধী এবার সবরমতী আশ্রমও "হরিজন সেবক সংঘের" হাতে তুলে দিলেন। নূতন সাপ্তাহিক বের করলেন "হরিজন" নামে। অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজে তাঁর মন এমন মেতে উঠলো যে এমন কি জেলের ভিতরে থেকেও তিনি যাতে হরিজনদের সেবা করতে পারেন সরকারের কাছে এজন্য সুযোগ ভিক্ষা করলেন। এরপর আরো দু-একবার তিনি অল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘস্থায়ী অনশন করলেন এবং অবশেষে ২৩ অগষ্ট তারিখে পুরোপুরি জেল থেকে ছাড়া পেলেন। সবরমতী আশ্রম পরিত্যাগ করার পর ওয়ার্ধায় বিনোবাজীর সেবাগ্রামই গান্ধীর নূতন কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠলো। তিনি এখন থেকে হরিজন আন্দোলনেই সর্বক্ষণ ব্যয়িত করতে লাগলেন। গান্ধী সম্বন্ধে নানা মহল থেকে বিরূপ সমালোচনা করা হতে থাকলো। হরিজনদের একাংশের মনে সন্দেহ হল গান্ধী নিজের মতলব হাসিলের জন্যই "হরিজন" "হরিজন" করছেন, বর্ণহিন্দুদের গোঁড়া অংশ ক্ষেপে গিয়ে হরিজনদের উপর আরো বেশি নির্যাতন আরম্ভ কোরলো এবং রটনা শুরু করলো যে গান্ধী একাধিক রক্ষিতা নিয়ে বাস করেন। এমন কি গান্ধীকে লক্ষ্য করে বোমাও পড়লো।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আম্বেদকর তো আগেও বলেছিলেন, এখনও বল্লেন, সবটাই গান্ধীর একটা চালাকি, এবং অনেক কংগ্রেস কর্মীর মনে হল যে গান্ধী জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ধর্মের ভেক ধরেছেন। ১৯৩৪ খৃঃ যখন বিহার ভূমিকম্পে বহুলোক হতাহত হল, বহু এলাকা বিধ্বস্ত হল, গান্ধী বলে বসলেন, অস্পৃশ্যতার পাপের জন্যই এটা ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি। বলা বাহুল্য, এমন অযৌক্তিক কথা কেউই বরদাস্ত করতে পারেনা, গান্ধীর কাছ থেকে এলেও না। রবীন্দ্রনাথ এবং নেহরু দুজনেই এই উক্তির প্রতিবাদ করলেন। বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই কাজ করতে হয়। বিশ্বাস আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে তোলে; সেটি ভালো। কিন্তু বিশ্বাস যখন বুদ্ধিকে একেবারে অন্ধ করে দেয় এবং যুক্তিহীন কুসংস্কারকেও সমর্থন জানায় তখন তা মনুষ্যত্বকেই অপমান করে।

কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে আগেই গান্ধী ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং এখন থেকে বেশ ক' বছর তিনি রাজনৈতিক সংগঠনের একেবারে বাইরে অস্পৃশ্যতা বর্জন ও গ্রামোদ্যোগের কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন। এর আগেও একবার তিনি যখন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে প্রায় জোর করে কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়েছিল। এখনও তিনি কংগ্রেসের বাইরে থাকলেও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রয়োজন বুঝলেই সেবাগ্রামে ছুটে আসতেন, তাঁর কাছে উপদেশ নিতে। এতে গান্ধী নিজস্ব দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারতেন! আদর্শ স্বরাজের জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম রচনার কাজ তিনি কংগ্রেস বা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের প্রস্তাব পাশের উপর নির্ভরশীল না হয়েই করে যেতে পারতেন। বহুজনকে নিয়েই তিনি এগোতে চেয়েছেন, কিন্তু পরিমাণের চেয়ে গুণের উপরই তাঁর বেশি আস্থা, কাজেই বহুজনকে সংগে না পেলে অল্পজনকে নিয়েই তিনি তাঁর এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। এ যুগে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি অর্ধ-উপনিবেশ

দেশগুলিতে বহুল প্রচলিত। অবশ্য সেগুলি সশস্ত্র গেরিলা পদ্ধতি। গান্ধীরও একটি নিজস্ব গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি ছিল; সেটি অহিংস গেরিলা যুদ্ধের একক পদ্ধতি। অনেকটা চে গুয়েভারার সহিংস গেরিলা যুদ্ধের একক পদ্ধতির মতোই। অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধের সামূহিক পদ্ধতি হল হো-চি-মিনের পদ্ধতি। এই সংগে সাম্প্রতিক কালের আরো একটি সাম্যবাদী বিপ্লবী রণ কৌশলের কথা মনে আসে সেটি মাও-সে-তুং কথিত গ্রামাঞ্চল কর্তৃক শহর ঘেরাওয়ের পদ্ধতি। গান্ধীর অহিংস গেরিলা নীতি এই ত্রিবিধ নীতির বিপরীত এক বিশিষ্ট, সমন্বিত পদ্ধতি বলা যায়। গেরিলা নীতির মূল কথা হল আপাত শক্তিশালী শত্রুকে সরাসরি আক্রমণ না করে তার ঘাঁটিগুলি বিচ্ছিন্ন করা, তার শাসনকে কার্যত অস্বীকার ও বানচাল করা এবং এইভাবে শত্রুর শক্তি আহরণের শিকড়গুলি দুর্বল ও ছিন্ন করা। গান্ধীর চ্যালেঞ্জও অনেকটা এই কৌশলেই রচিত। তিনি চান গ্রামগুলি দখল করতে, গ্রাম থেকে শোষণের শিকড়—বিদেশী দেশী সব রকমের শোষণ—উৎপাটিত করতে, গ্রামে জনগণের শক্তিকে জাগ্রত করে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর জনগণের জন-অর্থনীতির উপর স্থাপিত মুক্ত গ্রাম তৈরি করতে। এই ধরণের মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি হলে শহরকেন্দ্রিক পরতন্ত্র, ধনতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, আমলাতন্ত্র সবই অকেজো হয়ে পড়তে বাধ্য, এবং তখন স্বরাজ অবশ্যম্ভাবী। এই কাজে তিনি কখনো চে-গুয়েভারার মতো একক আত্মাহুতির জন্য অগ্রসর, কখনো বা হো-চি-মিনের মতো সারা দেশকে নিয়ে সংগ্রামে লিপ্ত। গান্ধী কখনো অনশনে, কখনো আইন অমান্য আন্দোলনে, এগিয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য গ্রামে গ্রামে দেশব্যাপী মুক্তাঞ্চল বা স্বরাজ সৃষ্টি। সশস্ত্র গেরিলা, যে কোনো সশস্ত্র সংগ্রামের মতো, অপেক্ষাকৃত দ্রুত ফল দেয়; কিন্তু যে কোনো সশস্ত্র সংগ্রামের মতোই সেই ফল আবার প্রবলতর প্রতিপক্ষ সৃষ্টি হলে বিফলও হয়ে যেতে পারে। গান্ধীর নিরস্ত্র অহিংস গেরিলা পদ্ধতিতে অধৈর্যের স্থান নেই, এতে প্রয়োজন শতগুণ

বেশি মনের জোর, নীতি-নিষ্ঠা ও লক্ষ্যে আস্থা। এর সাফল্য ধীর ও বিলম্বিত, কিন্তু অর্জিত হলে তার স্থায়িত্ব ও মহত্ত্ব অতুলনীয়। গান্ধীর জীবনে বা কারো একটি মাত্র জীবনে এই নব্য গেরিলা সংগ্রামের সমাপ্তি হয়নি বা হওয়া সম্ভবও নয়। বলা যায়, গান্ধী এই নূতন দীর্ঘস্থায়ী স্ট্র্যাটেজির প্রবর্তক ও প্রথম পরীক্ষাকারী। সম্ভবত আরো বহুদিন ধরে এর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে—যদি চলে. বহু দশক এমন কি বহু শতাব্দী পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে এর পূর্ণ সাফল্যের জন্য। মানবমুক্তির সশস্ত্র সহিংস পদ্ধতি সবই এক এক করে পরীক্ষা করা হয়েছে ; নিরস্ত্র অহিংস পদ্ধতির পরীক্ষা পৃথিবীতে এই প্রথম। একে লঘুভাবে উড়িয়ে দেবেন তারাই যাদের মন বদ্ধ, অন্ধ, শৃংখলিত। সমগ্র মানব সমাজ ও সভ্যতার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য যারা ভাবেন তাদের পক্ষে গোঁড়ামিমুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যার পরীক্ষা শেষ হয়নি তাকে অসার্থক বলা অবৈজ্ঞানিক এবং একদর্শিতারই নামান্তর।

এখানে আরেকটি প্রসংগ স্বভাবতই এসে পড়ে। কেন গান্ধীজী কখনো কংগ্রেসের ভিতরে, কখনো কংগ্রেসের বাইরে? "এণ্ডস অ্যাণ্ড মিন্‌স" বা উপায় ও অম্বিষ্টের ঐক্য সম্বন্ধে গান্ধীর মতবাদ থেকেই তাঁর অহিংস আন্দোলনের সূত্রটি অনুসিদ্ধান্তের মতো বেরিয়ে আসে। উপায়টি লক্ষ্যের উপযোগী হওয়া চাই। উপায় বা অস্ত্র একটা শক্তি, এর প্রভাব উপায় বা অস্ত্র ব্যবহারকারীর উপর পড়বেই। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, গান্ধী কংগ্রেস বা ঐ ধরণের নিছক রাজনৈতিক দলীয় সংগঠনকে সত্যাগ্রহের উপযুক্ত অস্ত্র বা উপায় হিসাবে কী করে ব্যবহার করলেন? এই উপায়টিই কি তাঁর লক্ষ্যের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি? রাজনৈতিক পার্টি বা সংগঠনের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র বা শাসনক্ষমতা দখল করা ও তার উপর কর্তৃত্ব করা। এই পার্টিগুলির গঠন সেই উদ্দেশ্যেই রচিত এবং সেই উদ্দেশ্যের সংগেই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। গান্ধী এই অস্ত্র বা উপায় তাঁর নিজের অম্বিষ্ট লাভের পক্ষে সম্পূর্ণ

নিশ্চয়ই মনে করেননি, তা উপযোগী হয়ওনি, এবং সেই কারণেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বারে বারে কংগ্রেস সংগঠন থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন বা বেরিয়ে এসেছেন। সত্যাগ্রহের উপযোগী সমান্তরাল সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে তাঁর ভাগ্যে শেষ অধ্যায়ের রাজনৈতিক বিড়ম্বনা হয়তো জুটতো না। কংগ্রেস বা রাজনৈতিক পার্টি ক্ষমতালাভের পার্টি, ক্ষমতালোভীর পার্টি; যখন ক্ষমতার কাড়াকাড়ি এল তখন ক্ষমতালোভীরা গান্ধী ও গান্ধী আদর্শকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে গেল। পার্টি চায় পার্টির হাতে ক্ষমতা। জনতার হাতে ক্ষমতা সব পার্টিরই মুখের বুলি মাত্র। সেই জন্যই পার্টি-রাজনীতিতে—একক বা বহু পার্টি যাই হোক—অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় পার্টির স্বার্থে, পার্টির সুবিধা ও উন্নতির স্বার্থে, সাময়িক ভাবে বা বরাবরের জন্য জনসাধারণের স্বার্থ ও মংগল জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। ভবিষ্যৎ মংগলের দোহাই দিয়ে বর্তমানের সমস্ত অমংগল, অসত্য, অনাচার, মিথ্যাচার, জঘন্য ষড়যন্ত্র ও ভ্রাতৃহত্যা পর্যন্ত সমর্থন করা হয়। প্রচলিত ধারণায় রাজনীতি রাজনীতিই; সেখানে জোর যার মুল্লুক তার। এই জোর সব রকমের জোর হতে পারে—গায়ের জোর, বুদ্ধির জোর, চালাকির জোর, শাঠ্যের জোর, সংগঠনের জোর, আদর্শ বা ইজমের জোর, অস্ত্রের জোর, প্রপাগাণ্ডার জোর। কিন্তু রাজনীতিতে আত্মিক বা নৈতিক জোর যে একটা জোর—প্রপাগাণ্ডার জন্য ছাড়া—তা প্রাচ্যে বা পাশ্চাত্যে গান্ধীর আগে কেউ কখনো বলেননি। অধ্যাত্মিক উন্নতি একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্ম বা নীতি-চর্চার স্থান আর যেখানেই হোক রাজনীতির ক্ষেত্রে নেই। যুদ্ধে এবং পলিটিকসে অন্যায় বলে কিছু নেই; যা কাজে লাগে, যাকে কাজে লাগানো যায়, তাই ন্যায়; এক্ষেত্রে সত্য এবং অসত্যকে আলাদা করে দেখা যায় না। এখানে যেন-তেন-প্রকারেণ সাফল্যই একমাত্র সফলতা। মানবমনের শুদ্ধি, মানুষের হৃদয়-পরিবর্তন এগুলি স্বতন্ত্র সাধনার ব্যাপার; যাঁরা

এগুলিই চান তারা পলিটিকস-এ আসবেন না এটাই স্বতঃসিদ্ধ। নীতিও কোরবো, রাজনীতিও কোরবো, তা চলেনা। মানুষ যেমনটি আছে তাই নিয়েই রাজনীতির কারবার, ঠিক যেমন মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও অপরাধ প্রবৃত্তি অনুযায়ীই আইন বা দণ্ডনীতি তৈরি হয়ে থাকে। আদর্শ বা অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের চিন্তা সেখানে ঠাঁই পায় না, পেলেও সেটাই প্রবল হয়ে ওঠেনা। কংগ্রেসে গান্ধীনীতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র বসু ঠিক এই যুক্তিতেই গান্ধীকে সমালোচনা করলেন। ১৯৩৪খৃঃ "দ ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল" বইতে, এবং আগে ১৯৩৩খৃঃ ভিএনায় বিঠলভাঈ প্যাটেলের সংগে এক যুক্ত ইশতাহারে, মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাধীনতা আদায়ের জন্য, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য, ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করছে; ব্যস, সোজা কথা, এর মধ্যে কোনো হেঁয়ালি নেই। "সত্যাগ্রহ", "স্বরাজ", এসব কথা বলে শুধু হেঁয়ালি সৃষ্টি করার কী দরকার? ভিয়েনায় রমঁ্যা রলঁার সংগে ভিলনভ-এ সুভাষচন্দ্রের যখন সাক্ষাৎ ঘটে (এপ্রিল, ১৯৩৫) তখন তিনি রলঁাকে বলেছিলেন, "অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে গান্ধীর পদ্ধতি মহৎ কিন্তু এই স্থূল বাস্তব বা মেটিরিআলিস্ট জগতের পক্ষে খুব বেশি উঁচু, এবং রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বিপক্ষের সংগে তাঁর ব্যবহার বড় বেশি সোজা ও স্পষ্ট।" অর্থাৎ রাজনীতি হবে বাস্তব-ঘেঁষা, সেখানে বাঁকাচোরা শঠতা, যাকে বলে ডিপ্লম্যাসি বা কৌশল, পুরোমাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। যিনি তা পারবেন না তিনি রাজনৈতিক নেতা হবার অযোগ্য। কংগ্রেস গঠিত হয়েছে বৃটিশের নাগপাশ ছিন্ন করে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য; সেই অর্জন সুগম ও ত্বরান্বিত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই রাজনীতিতে সিদ্ধ। বলা বাহুল্য, গান্ধীনীতি সেখানে অনন্ত ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে,

চিত্তশুদ্ধির কথা বলে, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও বিবেকের আমদানি করে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকেই পিছিয়ে দিচ্ছে। রঁলা অবশ্য সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন, গান্ধীর সত্যাগ্রহ যদি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তবে তিনি খুবই হতাশ হবেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন সারা পৃথিবী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও ঘৃণার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল তখন নতুন আলো নিয়ে এলেন মহাত্মা, রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন অস্ত্রের আমদানি করলেন। রলাঁ স্পষ্টই বল্লেন, সমস্ত বিশ্বে গান্ধী এক বিরাট আশার সৃষ্টি করেছেন। গান্ধী ব্যর্থ হলে এই আশা নির্বাপিত হবে। সুভাষচন্দ্র বল্লেন, গান্ধীকে বিরোধিতা বা সমালোচনা করতে আমাদের একটুও ইচ্ছে করেনা, কারণ তিনি দেশের জন্য যা করেছেন সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে আর কেউই তা করেননি, এবং জগতের কাছে ভারতবর্ষের মর্যাদা তিনিই তুলে ধরেছেন; কিন্তু আমরা দেশকে ব্যক্তির চেয়েও ভালবাসি, এবং গান্ধী-নেতৃত্ব বৃটিশবিরোধী আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই অন্য পন্থা ভাবতে হচ্ছে। রলাঁ তবু বল্লেন, তিনি অহিংসার বিপক্ষে সায় দিতে পারছেন না, তবে তিনি এইটুকু বুঝেছেন যে অহিংসাকে সমস্ত সামাজিক কার্যের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু করা চলে না। অহিংসাকে অন্যতম উপায় হিসাবে গণ্য করা যায়, কিন্তু একমাত্র উপায় নয়। এটিকে একটি প্রস্তাবিত পরীক্ষামূলক পথ বলাই বরং সংগত।

এই বিরোধের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গান্ধী কেবলমাত্র রাজনৈতিক মুক্তির নেতৃত্ব করছিলেন না, এবং কেবলমাত্র ভারতের মুক্তির নেতৃত্বও করছিলেন না। তিনি সারা বিশ্বের জন্য এবং মানুষের এক বৃহত্তম, মহত্তম মুক্তির জন্য অভিনব বিপ্লবের অসাধারণ পরীক্ষায় নেমেছিলেন। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক যেমন কোনো একটি বিশেষ দেশ বা মানব গোষ্ঠীর জন্য ধর্মপ্রচার করেননি, সমগ্র মানবের কল্যাণ ও উৎকর্ষের জন্য করেছেন; নিউটন,

আইনস্টাইন, ফেরমি যেমন তাঁদের অসাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনব বিপ্লব ঘটিয়েছেন, গান্ধীও তেমনি। চিরাচরিত রাজনীতি বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারণা দিয়ে গান্ধী-নেতৃত্বের বিচার এই জন্যই যুক্তিযুক্ত মনে হলেও সঠিক নয়। এক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির প্রয়োগও, যুক্তিযুক্ত মনে হলেও, সঠিক হবেনা। গান্ধী রাজনীতির ক্ষেত্র বেছে নিলেও, ক্ষমতা দখলের জন্য তা বেছে নেননি, শঠে শাঠ্য নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে তা বেছে নেননি। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব। এই অভিনবত্বের তাৎপর্য না বুঝতে পারলে মনে হবে গান্ধী ভুল করেছেন, গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন, গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের রাশ টেনে ধরেছেন, তিনি অত্যাচারীর সংগে সহযোগিতা করেছেন। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি তো সব দেশে সব যুগেই হয়ে আসছে, তার সাফল্য কতো ক্ষণস্থায়ী তাও তো আমরা ইতিহাসে দেখে আসছি। কাজেই সেই সাফল্যের জন্য যিনি রাজনীতি করেননি তাঁর এই অভিনব প্রয়াস নিশ্চয়ই অভিনিবেশ সহকারে আমাদের পর্যালোচনা করা উচিত। তাকে এক কথায় বাতিল করে দিলে সেইটাই হবে চরম মূঢ়তা। রাজনীতি যতক্ষণ নিছক রাজনীতি ততক্ষণ চাণক্যনীতিই সেখানে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু রাজনীতিকে যদি ন্যায়নীতির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, রাজনৈতিক সংগ্রামকে ন্যায়নীতি ও বিবেকের সংগ্রামে পরিণত করা যায় বা ন্যায়নীতি ও বিবেকের সংগে যুক্ত করা যায়, তাহলে যে একটি নূতন অতিরিক্ত শক্তির সংযোজন ঘটে তা অবশ্যই স্বীকার্য। সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকেও ন্যায়নীতির সমতলে উঠে এসেই মোকাবিলা করতে কিছুটা বাধ্য করা যায়। এই কাজ খুব সহজ নয়। কিন্তু এর উৎকর্ষ এই যে এতে সচরাচর রাজনীতির সংগে যুক্ত নোংরামি ও ইতরতা থাকে না এবং এতে পরাজয়ের গ্লানি কখনোই মনকে স্পর্শ করেনা। দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রায়শই যুক্তি গিয়ে দাঁড়ায় নিরুপায়ের যুক্তিতে, অনেকটা এই রকম—দলকে শক্তিশালী না করলে সংগ্রামে

জেতা যাবেনা, অতএব দলের স্বার্থে অন্য সব স্বার্থ, এমনকি ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাও, বিসর্জন দিতে হবে, কারণ ন্যায়-অন্যায় আপেক্ষিক। দল যাকে ন্যায় বলবে আপাতত সেইটিই ন্যায়। কিন্তু মুশকিল ঘটে যখন একই রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ একটি দলের মধ্যেই মতভেদ দেখা দেয়, এবং দল দ্বিধা, ত্রিধা, বহুধা বিভক্ত হয়ে পরস্পরের প্রতি চরম কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়। কেন এমন হয়, এক লক্ষ্য এক প্রোগ্রাম সত্ত্বেও কেন এমন ঘটে, তার কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা আমরা প্রচলিত রাজনীতিতে পাই না। এসব ক্ষেত্রে জনসাধারণ নিজেদের খুব অসহায় বা অন্ধ মনে করে। দুটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, একই সাধারণ রাজনৈতিক শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দুটি সমাজবাদী পার্টি যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন দেখা যায়, উভয় পক্ষই নিজেদের নির্ভুল এবং অন্যদের ভুল বলে দোষারোপ করে; এই দোষারোপের লড়াইতে দলীয় সভ্যরা জঘন্যতম আচরণেও পশ্চাৎপদ হয়না। পদাতিকের বিরুদ্ধে পদাতিক, সাঁজোয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনী, এই হচ্ছে লড়াইয়ের সাধারণ নিয়ম। যদি এক পক্ষ আক্রমণের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে পারে তবে তার শক্তি বৃদ্ধি হয়। যদি একপক্ষ জল স্থল ছাড়াও আকাশ পথে বিমানযুদ্ধ চালায়, তাহলে প্রতিপক্ষকেও হয় বিমান যুদ্ধে নামতে হবে, নইলে পরাজয় বরণ করতে হবে। সত্যাগ্রহ যেন জল ও স্থল যুদ্ধের মধ্যে এই ধরণের বিমান যুদ্ধের অবতারণা, নতুন স্তরে—আকাশের উচ্চস্তরে—চ্যালেঞ্জ জানানো, রাজনীতির সংগ্রামে ন্যায়নীতির চ্যালেঞ্জ বিস্তৃত করা, সংগ্রামকে উচ্চস্তরে উন্নীত করা। বলাই বাহুল্য, বিমানবহর যার আয়ত্তে নেই তাকে শুধু জল ও স্থল বাহিনীর উপরই নির্ভর করতে হয়।

১৯৩৬ খৃঃ গান্ধী স্থায়ীভাবে সেবাগ্রামে তাঁর সর্বোদয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করলেন। তাঁর বয়স তখন ৬৬, কিন্তু নূতন নূতন এক্সপেরিমেণ্টে তখনও তিনি নবীন। ব্রহ্মচর্য ও সেক্স সম্পর্কিত

তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত আদর্শবাদী যা শুধু সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর পক্ষেই প্রযোজ্য। তাঁর বিরুদ্ধে নারী-ঘটিত কুৎসা ও অপপ্রচার অনেকবার হয়েছে, তাতে তিনি একটুও দমেননি। সত্যের পরীক্ষার মধ্যে সেক্স সম্পর্কিত সত্যও তিনি বাদ দেননি। তাঁর সবরমতী আশ্রমে নারী পুরুষ এক সংগে বাস করতো, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যৌন সংসর্গ ছিল নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছাকৃত ব্রহ্মচর্য—গান্ধীর মতো যারা পূর্বেই বিবাহিত তাদেরও বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্য—আশ্রমে একটি গৃহীত নীতি ছিল। সেবাগ্রামেও সে-নীতি বহাল রইলো। মীরা বেন গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে যোগ দেবার পর এবং মীরার সেবার মধ্যে ব্যক্তিগত অনুরাগ ও ভক্তির আভাস পেয়ে গান্ধী এই বিষয়ে আরো বেশি সজাগ, সতর্ক ও আত্ম-সমালোচক হয়েছিলেন। সন্তান লাভের জন্য ছাড়া নারী পুরুষের দৈহিক মিলনকে তিনি নিছক কাম, অতএব সত্যাগ্রহীর উন্নত জীবনের অন্তরায়, বলেই মনে করতেন। গান্ধী মনে করতেন, কাম প্রবৃত্তি জয় করে যদি নারী পুরুষ সংযমী থেকে সমানভাবে প্রকৃত আত্মিক ভালবাসায় বন্ধুর মতো এক সংগে বাস করতে পারে তবে তারা বিশেষ শক্তির অধিকারী এবং আদর্শ সত্যাগ্রহী হতে পারে। ১৮৯৯ খৃঃ থেকে তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন। গান্ধী নিজের কাম-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ জয় করেছেন ভেবে যখন তৃপ্ত ছিলেন, তখন হঠাৎ ১৯৩৬ খৃঃ বোম্বাইতে অসুস্থ অবস্থায় একদিন স্বপ্নের মধ্যে যৌন কামনা অনুভব করলেন। এতে তাঁর আত্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি একটু নড়ে উঠলো। প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তিনি ছ সপ্তাহ বিশেষ মৌন পালন করলেন এবং তারপর তাঁর মহিলা কর্মীদের কাছে এই বিষয়ে আলোচনাও করলেন। সত্যের সেবক হিসাবে বিশ্বের কাছে তিনি স্বীকারোক্তি করলেন "হরিজন" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে। জানুয়ারি মাসে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচারিকা শ্রীমতী মার্গারেট স্যাংগার যখন ওয়ার্ধা আশ্রমে এসেছিলেন, তখন গান্ধী শ্রীমতী স্যাংগারকে তার ব্যক্তিগত সেক্স জীবনের আদ্যন্ত

খুঁটিনাটি অকপটে জানিয়েছিলেন। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বা বার্থ কন্ট্রোল পদ্ধতির সপক্ষে তিনি সায় দিতে পারেন নি। কারণ স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক সম্পর্ককে তিনি জান্তব প্রবৃত্তি ছাড়া কিছু মনে করতেন না। অন্যান্য প্রবৃত্তির বেলায় যদি সংযম পালনীয় হয়, উৎকর্ষের সাধনায় প্রবৃত্তি জয় করা যদি একটি সোপান হয়, তবে যৌন প্রবৃত্তির ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। তিনি বল্লেন, মানুষ যখন অন্যান্য প্রবৃত্তির দাস হতে বাধ্য নয়, তখন এই একটা প্রবৃত্তিরই বা দাস হতে সে বাধ্য হবে কেন? যদি তাকে বার্থ কন্ট্রোলের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে প্রকারান্তরে তাকে বলেই দেওয়া হচ্ছে যে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা তার একটি আবশ্যিক কর্তব্য, যেন সেটি না করলেই তার আত্মিক বিকাশ ব্যাহত হবে। বার্থ কন্ট্রোলের প্রবক্তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথাই বলেন, যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের কথা আদপেই বলেন না। গান্ধীর আপত্তি এইখানে। একমাত্র সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে যে দৈহিক মিলন তাকে খানিকটা স্বীকার করলেও অন্য কোনো যৌন সংগমকেই তিনি স্বীকার্য মনে করেন না। শ্রীমতী স্যাংগার গান্ধীর এই যুক্তিগুলি মানতে পারেননি। তাঁর মতে সেক্স বা প্রেম স্বামী ও স্ত্রীকে একাত্ম করে, সম্পূর্ণ করে, এবং এই সম্পর্কই উভয়ের সুন্দর পারস্পরিক বোঝাপড়া, আত্মিক সমন্বয়, সাধিত করে। শ্রীমতী স্যাংগারের মতে যৌন অভিব্যক্তি একটি আত্মিক প্রয়োজন এবং এই অভিব্যক্তিতে আনন্দই আসল কথা, এর ফলাফল—যথা সন্তান লাভ—আসল কথা নয়। যৌন সম্পর্কের মান যৌন সম্পর্কজাত ফলের উপর নির্ভরশীল নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর জন্ম আকস্মিক, মাতাপিতার সন্তান কামনার সংগে যার কোনোই যোগ থাকে না। সন্তান চাই বলে নারী পুরুষ যৌন সংগমে লিপ্ত, এ বড়ো একটা ঘটে না। স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরকে ভালবাসে এবং সুখে এক সংগে বসবাস করে, তখন কি তাদের পক্ষে যৌন মিলন এতখানি নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভব যে তারা দু-বছরে মাত্র একবার মিলিত হবে?

গান্ধী অবশ্য এই সব যুক্তিকে বিশেষ আমল দেননি। তিনি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য শুধু একটি উপায়ের কথা বল্লেন যার মধ্যে খানিকটা স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণ আছে, সেটি হচ্ছে কেবলমাত্র "নিরাপদ কালে" অর্থাত "সেই ফপিরিয়ডে" স্বামী স্ত্রীরা মিলিত হবেন, অন্য সময়ে নয়। মাসের অন্য প্রায় আঠারো দিন সংযত থাকলে, আংশিক সংযম পালনও হবে, সন্তান জন্মের আশংকাও থাকবে না। যদিও গান্ধীর আদর্শ ব্যবস্থা এটি নয়, তবু এর প্রতি আংশিক সমর্থন তাঁর আছে, যেহেতু এটি যান্ত্রিক নয়, মানসিক নিয়ন্ত্রণ।

এই সময় গান্ধী আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে তাঁর মনোযোগ দেন, সেটি শিক্ষা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিনিক্স উপনিবেশ ও টলস্টয় ফার্মে এবং ভারতবর্ষে বিহারে চম্পারণে গান্ধী তাঁর নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু পরে রাজনৈতিক ঝড় ঝাপটার মধ্যে এবিষয়ে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। এখন গান্ধী তাঁর "বুনিয়াদী শিক্ষা" বা বেসিক এডুকেশন পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ করতে সচেষ্ট হলেন। এই শিক্ষা-দর্শনটির মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৯৩৭ খৃঃর শেষ দিকে গান্ধী ডঃ জাকির হোসেন এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটি গান্ধী নির্দেশিত পথে শিক্ষা সম্পর্কে যে সুপারিশ করেন তাই "জাকির হোসেন কমিটি রিপোর্ট" বা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা" নামে খ্যাত। পেস্তালজ্জি, ফ্রয়বেল প্রভৃতি শিক্ষা নায়কদের মতো গান্ধীও প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই, হাতে কলমে এক্সপেরিমেণ্ট করে, এই শিক্ষানীতির পরিকল্পনা করেন। বিবেকানন্দের মতো গান্ধীও বলেছেন শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষ গড়া ; যে শিক্ষায় ব্যক্তির দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার সুষম বিকাশ ঘটে তাই সুশিক্ষা। মেকলে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শাসকদের প্রয়োজন মেটানো, এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ইংরেজিনবীশ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তৈরি করা। গান্ধীর মতে, লক্ষ লক্ষ

ভারতবাসীকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার অর্থ তাদের দাস করে তোলা। শুকনো পুঁথিপড়া বিদ্যায় শুধু মস্তিষ্কেরই চর্চা হয়, হৃদয়ের কোনো চর্চা হয় না, চরিত্রগঠন হয় না, অতএব হাতের কাজের মাধ্যমেই শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া অর্থহীন, কারণ তা নিষ্প্রাণ এবং অস্বাভাবিক; বিষয়ের মধ্যে প্রবেশের পথে ইংরেজি ভাষা সহায়ক না হয়ে বাধা স্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দ এই বিজাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আধুনিক শিক্ষা না আধুনিক, না ভারতীয়, না শিক্ষা।" গান্ধীর মতে, ইংরেজি ভাষার উপর অকারণ গুরুত্ব আরোপের ফলে শিক্ষিত শ্রেণীর চেতনা পংগু ও অসাড় হয়ে পড়েছে, এবং তারা নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে একদিকে দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত জনগণ, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষ এই দুয়ের মধ্যে যেন এক দুর্ভেদ্য দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে। ১৯১১ খৃঃ গান্ধী যখন ট্রান্সভালে টলস্টয় ফার্ম স্থাপন করেন তখন জার্মান সহকর্মী কালেনবাক-এর সহায়তায় স্বয়ম্ভর শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম সূচনা করেছিলেন। ঐ আশ্রমে রান্না থেকে শুরু করে শৌচাগার পরিষ্কার করা সবই আশ্রমিকরা নিজেরাই করতেন এবং শিশুরাও এই কাজের সামিল হত। ছ থেকে পনর বৎসরের শিশুরা দিনরাত্রে মোট দশঘণ্টা পড়াশুনা ও হাতের কাজ করতো, তার মধ্যে আটঘণ্টা শিল্পকাজ—দারুশিল্প বা চর্মশিল্প—এবং বাকি দু ঘণ্টা পড়াশুনা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হত তাদের মাতৃভাষায়, অর্থাৎ হিন্দী, তামিল, গুজরাতী ও উর্দুতে। বিদ্যালয়ে কোনো শারীরিক শাস্তি দেওয়া হত না এবং গতানুগতিক ভাবে ইতিহাস, ভূগোল, গণিতও শেখানো হত না! এই এক্সপেরিমেন্টের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা বুনিয়াদী শিক্ষার তত্ত্বটি গড়ে ওঠে। ওয়ার্ধায় গান্ধী তাঁর শিক্ষানীতিকে একটি বৈপ্লবিক রূপ দিতে চাইলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে হাতের কাজের মাধ্যমে রূপান্তরিত

করতে অগ্রসর হলেন। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষা হবে ৭ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত সাত বৎসরের অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা (পরে এটি এক বৎসর বাড়িয়ে ৬ থেকে ১৪ করা হয়)। ঐ শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক, অর্থাৎ হস্তচালিত কোনো উৎপাদনমূলক শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ঐ শিক্ষাদানের কাজ চলবে। শিল্পকাজ শুধু শিল্প হিসাবেই শেখানো হবে না, বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ও শিল্পকাজের সংগেই যুক্ত থাকবে। বই পড়ার পর কিছুটা সময় শিল্পকাজ, তা নয়; শিল্পকাজই প্রধান ও একমাত্র কাজ, তার মধ্যেই সব শিক্ষা থাকবে। হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষারম্ভ হলে শিক্ষার সংগে সংগেই শিশু উৎপাদন করতে পারবে, এতে শিশুর সর্বোচ্চ মানসিক ও আত্মিক বিকাশ ঘটবার সুবিধা হবে। যেমন সুতো কাটা অবলম্বন করেই অংক, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান সবই শেখানো যেতে পারে! শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হবে শিশুর মাতৃ-ভাষা। কারণ তা না হলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং শিশুর মৌলিকতাও নষ্ট হয়ে যাবে। কেবলমাত্র মাতৃ ভাষার মাধ্যমেই শিশু তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আয়ত্ত করতে পারে। গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষাকে তাঁর অহিংসা নীতির সংগে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন। সাধারণত ইতিহাসে থাকে রাজারাজড়া ও যুদ্ধবিগ্রহের কথা, কিন্তু ভবিষ্যতে ইতিহাস হবে মানুষের ইতিবৃত্ত, এ সম্ভব হতে পারে কেবলমাত্র অহিংসার দৃষ্টিভংগিতে রূপায়িত ইতিহাস চেতনায়। বিদ্যালয়ে অহিংসার আবহাওয়া সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে, ছেলেমেয়েরা সেখানে একসংগে মিলেমিশে স্বাধীন ভাবে বাস করবে, শিক্ষালাভ করবে, এবং স্বেচ্ছায় সংযম অভ্যাস করবে।

বিদেশী সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যয় করতে অনিচ্ছুক। কংগ্রেসের নীতি ছিল মাদক দ্রব্য বর্জন, কিন্তু সরকারী শিক্ষাখাতের ব্যয় বেশির ভাগই মিটতো মাদক দ্রব্যের

শুরু থেকে। কাজেই গান্ধী বল্লেন, মাদক দ্রব্য বর্জন চাই, শিক্ষাও চাই। অতএব শিক্ষাকে আত্মনির্ভরশীল করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু হস্তশিল্পনির্ভরই হবে না স্বনির্ভর হবে, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের উৎপাদন বা আয় থেকেই শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। প্রতি বিদ্যালয়ে চরকা ও তাঁতের প্রচলন হলে আর্থিক স্বনির্ভরতা অসম্ভব হবে না। ছাত্রদের তৈরি জিনিষ দেশের মানুষ ও দেশের সরকার যদি কিনতে উদ্যোগী হন তাহলে সমস্যার সমাধান সহজেই হবে। জাকির হোসেন কমিটি আত্মনির্ভরশীল শিক্ষানীতি মেনে নিয়েও এর অসুবিধার দিক সম্বন্ধেও ভেবেছেন। কমিটির মতে আত্মনির্ভরশীল হতে গিয়ে, অর্থাগমের দিকটাই যদি প্রধান হয়ে ওঠে, শিক্ষক হয়তো শিক্ষার অন্যান্য দিক অবহেলা করে হস্তশিল্পের কাজেই বেশি মনোযোগ দেবেন, এবং বিদ্যালয় একটি হস্তশিল্পের কারখানায় পরিণত হবে। শিক্ষা দেওয়ার নাম করে যদি শিশুকে শ্রমিকের মতো শোষন করা হয়, তবে তা সমর্থনযোগ্য হতে পারেনা। তাছাড়া শিশু যেহেতু সবে শিক্ষার্থী, উৎপাদনের সামগ্রী তার হাতে অনেক অপচয় হবে, এবং পাকা কারিগরের তৈরি জিনিষের সংগে তার কাঁচা অপটু হাতের তৈরি জিনিষ বাজারে প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই দাঁড়াতে পারবে না। গান্ধী এর জবাবে বলেন, অনেক মিশনারি-চালিত বিদ্যালয়ে অবসর সময়ে কৃষি ও হস্তশিল্প শেখানো হয় এবং ঐ কাজের জন্য পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কিছু আয়ও হয়। এই ভাবে বিদ্যালয় থেকেই খানিকটা স্বাবলম্বী হলে তারা পরবর্তী জীবনে নিজেদের ভরণপোষণের জন্য একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে না। হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান শোষণ নয়, যেহেতু শিশুরা খেলাচ্ছলে সৃষ্টিশীল আনন্দের সংগেই এই কাজ করবে। যদি আনন্দ ও কাজ এক সংগে চলে তবে সেই শ্রম শোষণের পর্যায়ে পড়েনা। যার মধ্যে তার সার্বিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হচ্ছে তাকে শিশু-শ্রম বা 'চাইল্ড লেবর' বলা চলে না। বুনিয়াদী শিক্ষা মানে কুটিরশিল্প সংস্থা নয়। শিক্ষক ছাত্রদের

উপার্জনের উপর নির্ভর করছেন, এচিন্তাও সেখানে উঠতে পারেনা। বুনিয়াদি শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থী সুনাগরিক হয়ে উঠবে, সকলেই সহযোগিতামূলক সৃষ্টিশীল কাজে ব্যাপৃত থাকবে, এর ফলে সকলেরই দায়িত্ব বাড়বে এবং চরিত্র গঠিত হবে। এমন সব কর্মীর সৃষ্টি হবে যারা কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমকে সমান সম্মানের কাজ বলে জানবে, এবং স্বার্থবুদ্ধির পরিবর্তে পরার্থমংগলের শিক্ষা পাবে। গান্ধীর গ্রামীন কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতির সংগে বুনিয়াদী শিক্ষার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লক্ষনীয়। শিক্ষার মধ্যে হাতের কাজ থাকা উচিত, এই মত রুশো, পেস্তালজ্জি ও ডিউইর শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যেও কিছুটা পাওয়া যায়। কিন্তু গান্ধীর আগে কেউই হাতের কাজকেই শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে, সামগ্রিক শিক্ষার আধার হিসাবে, ভাবেননি। কায়িক শ্রম সম্বন্ধে কুসংস্কার দূর করার জন্যই রুশো শিক্ষার সংগে হাতের কাজের কথা বলেছেন, তবে বেশি নয়। পেস্তালজ্জি ইন্দ্রিয়গুলির উপযুক্ত অনুশীলনের জন্যই হাতের কাজের সুপারিশ করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা হবে অভিজ্ঞতা-প্রসূত। তাঁর 'আনৃশাউংগ' (Anschaung) তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে নানা ধরণের কাজের স্থান দিয়েছিলেন। শিশু কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, এই সুপারিশ তিনিই প্রথম করেন, এবং কিছুটা বাস্তবে রূপায়িতও করেন। জন ডিউইর "প্রজেক্ট মেথড"-এ হাতে কলমে কাজ করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জীবনযাপনের মাধ্যমে শিক্ষা বা "লারনিং বাই লিভিং" এই হচ্ছে ডিউইর তত্ত্ব। নির্দিষ্ট একটি প্রজেক্ট সফল করতে হলে ক্লাশের সকলের সহযোগিতাই অপরিহার্য। এই ভাবে প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে, হাতে কলমের কাজের মধ্য দিয়ে, শিশুরা সামাজিক কর্মে দীক্ষিত হয়, গণতন্ত্রের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা ও হাতে কলমের শিক্ষা সম্বন্ধে ডিউই ও গান্ধী দুজনেই উৎসাহী, কিন্তু ডিউইর সমাজ শিল্পোন্নত মার্কিন সমাজ, আর গান্ধীর গ্রামীণ ভারতীয় সমাজ।

ডিউই চান শিক্ষার ফলে শিশু যাতে বাস্তব জীবনে উন্নতি ও সাফল্য লাভ করতে পারে, গান্ধী চান শিক্ষার ফলে শিশু যেন উন্নত মানসিকতার অধিকারী হতে পারে, তার যেন আত্মিক উন্নতি ঘটতে পারে। ডিউইর প্রজেক্ট গান্ধীর হস্তশিল্পের মতো উৎপাদনশীল বা অর্থকরী নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, গান্ধীর অহিংসা, অসহযোগ, সর্বোদয় ইত্যাদির মতো বুনিয়াদী শিক্ষাও গান্ধীর নিজস্ব উদ্ভাবন। গান্ধীর এই বুনিয়াদী শিক্ষাদর্শন ভারতবর্ষের মৌলিক অবদান। এতে আদর্শবাদ, স্বভাববাদ ও প্রয়োগবাদ বা প্র্যাগম্যাটিজম নূতন ভাবে সমন্বিত হয়েছে। টলষ্টয়, রুশো ও ডিউইর সংগে এক এক বিষয়ে তাঁর আশ্চর্য মিল দেখা যায়, কিন্তু প্রত্যেকের থেকেই তিনি আবার বিশেষভাবে স্বতন্ত্র, অনন্য। নীরব সামাজিক বিপ্লবের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই শিক্ষা শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা স্থাপনের সহায়ক এবং এতে শ্রমের মর্যাদার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপিত। গান্ধীর আশা ছিল এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই সমাজ থেকে নিষ্ক্রিয় শোষক শ্রেণী উৎখাত হয়ে যাবে; সকলেই উৎপাদক শ্রেণীতে পরিণত হবে। যেমন অহিংসা ও অসহযোগ নীতির ক্ষেত্রে, তেমনি বুনিয়াদী শিক্ষার বেলায়ও, গান্ধী যে এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ করেছিলেন তা সবেমাত্র আরব্ধ, তার অনন্ত সম্ভাবনা এখনো বিকশিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিশ্চয়ই ঢেলে সাজার প্রয়োজন আছে, এবং ঢেলে সাজা সম্ভবও। শুধু গ্রামের জন্যই নয়, শহরাঞ্চলেও শহরের উপযোগী বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়। সারা দেশে যদি মাঝারি ও হাল্কা ধরণের শিল্প গড়ে ওঠে এবং শিল্পোদ্যম বাড়ে, তাহলে হস্তশিল্পের সংগে ছোটোখাটো যন্ত্রশিল্পও বুনিয়াদী ব্যবস্থার সংগে জুড়ে দেওয়া যায়। গোঁড়া গান্ধীবাদীরা হয়তো এতে "গেল গেল" রব করবেন, সর্বোদয়ের ধারণাই এতে

বিসর্জন দেওয়া হল এই সব বলবেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে গান্ধী ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল স্বপ্নদ্রষ্টা ; বাস্তব অনুযায়ী, তারই ভিত্তিতে, লক্ষ্যে বা আদর্শের দিকে অগ্রসরে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

গান্ধীবাদ বা গান্ধী-আদর্শ সম্বন্ধে সবচেয়ে মুশকিল গোঁড়া গান্ধীবাদীদের নিয়ে। তারা গান্ধীকে বাদ দিয়ে, গান্ধীর বাইরে, গান্ধীবাদের কথা ভাবতেই পারেন না। গান্ধী যা করেছেন তা করার সাধ্য আমাদের নেই, গান্ধী যা করেননি তা করার সাহসও আমাদের নেই, এই অবস্থায় আমরা গান্ধীমন্ত্রের তোতাপাখি হয়ে উঠি। অধিকাংশ মতবাদ ও মতবাদীর বেলায়—বিশেষত যখন তা গোঁড়া আনুষ্ঠানিক বা তন্ত্রের পর্যায়ে ওঠে—এই বিপদ দেখা দেয়। মার্ক্স-রচনাবলী যাঁর মুখস্থ তিনিই মার্ক্সবাদী, মাও-সে-তুঙের বাণী যিনি অবলীলাক্রমে উদ্ধৃত করতে পারেন তিনি মাওবাদী, এবং যার পরণে খাদি এবং টেবিলে গান্ধীর ছবি ও রচনাবলী, তিনিই গান্ধীবাদী! বিপ্লবের মন্ত্র আওড়ালেই যেন বিপ্লবী হওয়া যায়। যেন নেতারা বলে দিয়ে না গেলে, দেখিয়ে দিয়ে না গেলে, কিছুই করা যাবেনা, করা উচিত হবেনা। ১৯৩৬ খৃঃ যখন গান্ধীর দুশো জন অনুগামী মাশরুওয়ালার সভাপতিত্বে মিলিত হয়ে গান্ধীবাদের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন তখন অনেকে বলেন, গান্ধীর আদর্শ বা শিক্ষাগুলির উপযুক্ত প্রপাগাণ্ডা দরকার। তখন গান্ধী বলেন : “ ‘গান্ধীবাদ’ বলে কিছু নেই এবং আমি আমার মৃত্যুর পর কোনো গান্ধীসম্প্রদায় রেখে যেতে চাইনা। আমি কোনো নূতন নীতি বা মতবাদের প্রবর্তক বলে নিজেকে মনে করিনা। আমি শুধু আমার নিজের মতো করে চিরন্তন সত্যগুলিকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও জীবনসমস্যায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি। অতএব পরবর্তীদের জন্য আমার মনুসংহিতার মতো কোনো সংহিতা রেখে যাবার প্রশ্নও ওঠেনা। প্রকৃতপক্ষে সংহিতার মনুর সংগে আমার কোনো তুলনাই চলেনা। যেসব মতামত আমি পোষণ করি এবং যেসব সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেছি

তাদের কোনোটাই চূড়ান্ত নয়; আগামীকালই হয়তো আমি তাদের পরিবর্তন করতে পারি।...আমি যা বলেছি সেই বক্তব্যের মধ্যেই আমার যা কিছু দর্শন, যদি আদৌ একে গালভরা 'দর্শন' নামে অভিহিত করা সম্ভব হয়, নিহিত আছে। কিন্তু একে আপনারা 'গান্ধীবাদ' বলবেন না; এর মধ্যে কোনো 'ইজম' বা বাদ নেই এবং এর সপক্ষে কোনো বিস্তারিত সাহিত্য বা প্রপাগাণ্ডারও প্রয়োজন নেই।" গান্ধী যতোই সাবধান করুন, তাত্ত্বিক ও মান্ত্রিক গান্ধীবাদই অধুনা গান্ধীকে, গান্ধীর স্পিরিটকে, আড়াল করে ফেলছে। এ যেন "হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।" শাস্ত্র থেকে বিচ্যুতি মানেই জাত যাওয়া। অমনি "শোধনবাদী" নাম কিনতে হবে। অথচ গান্ধী নিজে কতোবার কতো শাস্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, নিজের গড়া তত্ত্ব ও বিশ্বাস নিজেই কতোবার ভেঙেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেবাগ্রামে একদল স্কুলের শিক্ষক যখন তাঁর সংগে দেখা করেন, তখন গান্ধী তাদের বলেছিলেন, "মনুষ্যজীবন হচ্ছে অগণিত আপোষের পরম্পরা; থিওরিতে যা সত্য বলে জানা যায়, আচরণে তা সবসময় পালন করা সহজ নয়।"

১৯৩৫ খৃঃ নূতন আইন অনুযায়ী সারা ভারতবর্ষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা গেল, কংগ্রেস মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। অন্যত্রও বহুসংখ্যক কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভ করেছেন। এতে কংগ্রেস অধিকাংশ ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করেনা, এই বৃটিশ যুক্তি নস্যাৎ হয়ে গেল। কিন্তু বিরোধ বাধলো গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। গান্ধী স্পষ্ট জানালেন শাসনতান্ত্রিক আওতার মধ্যে নির্বাচিত মন্ত্রীসভার কাজে গভর্ণর হস্তক্ষেপ করবেন না, এরকম প্রতিশ্রুতি না পেলে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে পারেনা। এর ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হল তার অবসান ঘটলো পাঁচ মাস পরে যখন ভাইসরয় এক আশ্বাসপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে সহযোগিতার আহ্বান

জানালেন। যখন সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হল, গান্ধী মন্ত্রীদের প্রতি উপদেশ দিলেন, কোনো মন্ত্রী মাসিক পাঁচশো টাকার বেশি বেতন নেবেন না, তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া রেলে চড়বেন না; নূতন প্রাদেশিক সরকারগুলি সুরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন, বুনিয়াদী শিক্ষা সমর্থন করবেন, ঋণভারে জর্জরিত কৃষকদের ঋণের বোঝা লাঘব করবেন এবং জেলখানাগুলিকে সংস্কারশালায় পরিণত করবেন। প্রথমে মনে হয়েছিল ইংরেজ রাজকর্মচারীদের নিয়ে কাজ করতে মন্ত্রীদের মুশকিল হবে, কিন্তু তারা বরং সহজেই পরিবর্তিত অবস্থার সংগে নিজেদের মানিয়ে নিলেন। মুশকিল হল গান্ধী-নির্দেশ সম্বন্ধে মন্ত্রীদের নিজেদেরই দ্বিধা নিয়ে। গান্ধীর শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপায়ণে নূতন মন্ত্রীদের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেলনা, কারণ ঐ শিক্ষা বিভিন্ন সরকারী পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী তৈরি করতে পারবেনা। সুরার উপর নিষেধাজ্ঞার কাজও খুব একটা এগোলো না। শুধু হরিজনদের অধিকার কিছুটা আইনসংগত ভাবে স্বীকৃত হল। আগেই জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু মন্ত্রীত্ব গ্রহণের প্রশ্নে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। নেহরু গ্রামোদ্যোগের চাইতে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রও প্রয়োজন হলে অন্যদের বাদ দিয়ে একাই বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছিলেন। গান্ধী নিজেও কংগ্রেসী মন্ত্রী ও কংগ্রেসপরিচালিত সরকারের কার্যাবলীর অনেক কিছুই পছন্দ করতে পারছিলেন না। বৃটিশ শাসকদের মতো অনাবশ্যক আড়ম্বর ও আঢ্যের মধ্যে তারাও জড়িয়ে পড়ছিলেন। কংগ্রেসী আমলেও ধর্মঘটীদের উপর এবং সাম্প্রদায়িক গোলোযোগের সময় সাধারণ হিন্দুমুসলমানের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ চলছিল। সংগঠনের মধ্যেই এখন ক্ষমতালোভীদের ভিড় জমতে আরম্ভ করেছে, সরকারের সহযোগিতা পাওয়া যাবে এই আশায় বহু স্বার্থান্বেষী এখন কংগ্রেস নেতাদের মুরুব্বি বানাবার তাল করতে আরম্ভ করেছে। কোথায় গান্ধীর অহিংসা, কোথায়

গান্ধীর গরীব গ্রামীণ ভারতবর্ষ! বামপন্থী নায়ক বলে পরিচিত সুভাষচন্দ্রও ১৯৩৮ খৃঃ হরিপুরা কংগ্রেসে যখন সভাপতি নির্বাচিত হলেন তখন তাঁকে একান্ন বলদে টানা রথে করে মহা সমারোহে মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি আপত্তি করলেন না। গান্ধীর এসব কিছুই ভাল লাগছিল না, যেন কংগ্রেসের আত্মাটি ভিতর থেকেই শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে; জনসেবার পরিবর্তে ক্ষমতা লাভের জন্য, ক্ষমতা ভোগের জন্য, নেতারা যেন বেশি উদগ্রীব। আর এই অবসরে বহুদিনের ব্যর্থতার শোধ নেবার জন্য মহম্মদ আলি জিন্না তাঁর সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে পূর্ণাহুতি দিতে এগিয়ে এলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের কাছে তাঁর বক্তব্য খুব সহজেই হৃদয়গ্রাহী হল। ভোটের জোরে কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে শাসন করবার অধিকার পেয়েছে, মুসলমানগণ যদি একজোট হয়ে "মুসলিম লীগ"-এর পতাকাতলে সমবেত হন, তবে তারাও অনুরূপ ভাবে শাসনভার হাতে পাবেন। ক্ষমতার লোভ এবং দুয়ে দুয়ে চার গণিতের এই সহজ হিসাবে তিনি বাজীমাৎ করলেন। তাঁর মতে কংগ্রেস হিন্দু সংগঠন। মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন হচ্ছে "মুসলিম লীগ"। তিনি মুসলমান ভোটদাতাদের কাছে এক স্বপ্নরাজ্য তুলে ধরলেন—স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র, পাকিস্তান, যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, মুসলমানরাই শাসক, মুসলমানরা স্বাধীন এবং হিন্দুদের শাসন ও বশ্যতা থেকে মুক্ত। তিনি অনুবর্তীদের তদানীন্তন য়ুরোপের দিকে তাকাতে বল্লেন। 'সুডেটেন জার্মান' আন্দোলন করে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে কেমন আয়ত্ত করে ফেলেছেন। পাকিস্তান আন্দোলন করে জিন্নাই বা কেন অনুরূপ সুবিধা করতে পারবেন না?

সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি গান্ধীর রাজনীতির একেবারে বিপরীত। তাঁর সত্যাগ্রহের রাজনীতি রিপুজয়ের নীতি, সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি রিপুকে উসকে দেবার নীতি। একদিকে প্রেম

অন্যদিকে হিংসা, একদিকে উদারতা অন্যদিকে চরম সংকীর্ণতা। গান্ধী দেখলেন সাম্প্রদায়িকতা ধিকি ধিকি জ্বলতে জ্বলতে যেন এবার দপ করে জ্বলে সব ছারখার করে দিতে উদ্যত। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা আংশিক ভাগবাটোয়ারাতেই ক্ষান্ত নয়, পূর্ণগ্রাসের দিকে অগ্রসর। গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী অসহায় ভাবে বলেছিলেন, সংখ্যানুপাত দিয়েই যদি আইনসভার সদস্য সংখ্যা স্থির করতে হয় তাহলে ভোটারদের অর্ধেক যখন মহিলা তখন তো নির্বাচিত সদস্যদের অর্ধেকই হওয়া উচিত মহিলা। অনুরূপ ভাবে তিনি এখন প্রশ্ন তুললেন, জিন্নার এই দাবী অযৌক্তিক। কারণ শুধু পাকিস্তান কেন, তাহলে তো শিখিস্থান, পার্শীস্থান, খ্রীষ্টানস্থান সবই মানতে হয়। হিন্দুমুসলমান ভারতের সর্বত্র একাকার হয়ে আছে, এদের এভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আলাদা করা যায় না। কিন্তু গান্ধী মনের মধ্যে সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন না। পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। মুসলমান জনসাধারণের কাছে গান্ধীর বাণী আগের মতো পৌঁছাতে পারছে না। কারণ মুসলমান সমাজের এক বৃহদংশ সত্যিই নিজেদের হিন্দুদের কাছে পরাভূত মনে করে, এবং তারা যে পশ্চাৎপদ তার জন্য হিন্দুদেরই দায়ী করে। নিজের বিশ্বাসকে ঝালিয়ে নেবার জন্য তিনি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গেলেন, সেখানে সবাই মুসলমান, তাদের নেতা গফ্ফর খান, যিনি তখনো গান্ধীপন্থী, যাঁর নাম সীমান্ত গান্ধী। গান্ধী দেখলেন সাম্প্রদায়িকতার আহ্বান সীমান্ত প্রদেশেও গিয়ে পৌঁছেছে। গান্ধী হেরে যাচ্ছেন, সীমান্তগান্ধী হেরে যাচ্ছেন, মিথ্যার কাছে সত্য পরাজিত হচ্ছে, এবং বিশ্বশান্তির বদলে য়ুরোপে বিশ্বদাবানলের আয়োজন হচ্ছে। অহিংসার পরিমণ্ডল রচনা করতে তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে ইতিমধ্যে হিংসার এলাকা মানচিত্রে এবং মানুষের মনে কতোদূর বিস্তৃত হয়ে গেছে গান্ধী তা ঠাহর করতে পারেন নি। এখন তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, আর অপেক্ষার সময় নেই ; এখন কোনো বড়ো রকমের অ্যাকশন

নেওয়া দরকার। কিন্তু কী সেই উপযুক্ত অ্যাকশন? গান্ধী নিজেও তা জানেন না।

সাম্প্রদায়িক জিন্না, ফ্যাশিষ্ট হিটলার—গান্ধী এদের ঠিক বুঝতে পারেন না, যে শক্তির বলে এরা বলীয়ান, সেই শক্তিকে গান্ধী পশুশক্তি বলেই জানেন। সত্যের কাছে, আত্মশক্তির কাছে, এই পশুশক্তি পরাজিত হবেই, এই তাঁর আজীবনের বিশ্বাস। কিন্তু কীভাবে পরাজিত হবে? এদের অগ্রগতি কীভাবে রুখতে হবে? গান্ধীর এক উত্তর—অহিংসা দিয়ে, গণ-সত্যাগ্রহ করে। যদি সকলেই মহাত্মা হতে পারতো তাহলে অবশ্য এই উত্তর গ্রাহ্য হতে পারতো! কিন্তু গান্ধী নিজেও জানতেন, গোটা জাতির পক্ষে মুহূর্তেই সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠা অসম্ভব। যারা মহাত্মা নয়, সাধারণ মানুষ, তাদের জন্য গান্ধী গ্রহণীয় কোনো নির্দেশই দিতে পারছিলেন না। হিংসার বদলে হিংসা, আঘাতের জবাবে প্রত্যাঘাত, অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র—এই আদিম যুক্তিই বিশ্ব দাবানলের মধ্যে একমাত্র সত্য হয়ে দেখা দিল। জনসাধারণ কিছুটা হতাশায়, কিছুটা অনন্যোপায় হয়ে এই আদিম অথচ জোরালো অসত্যের দিকেই ঝুঁকছিল। ঝুঁকছিল কংগ্রেসও। ১৯৩৯ খৃঃ সহিংস বিদ্রোহের প্রবক্তা সুভাষচন্দ্র গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন। গান্ধীর এই পরাজয় অভূতপূর্ব, কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর নীতির এমন সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান অবিশ্বাস্য। গান্ধী দেখলেন, তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় অহিংসা নীতি ভারতের মাটিতেই শিকড় গাড়তে পারছে না।

শুধু গান্ধীর অহিংসা নীতি নয়, সারা বিশ্ব, সমগ্র মানব সভ্যতা এক বারুদস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে। ১৯৩৯ খৃঃ পয়লা সেপ্টেম্বর সেই স্তূপে বিস্ফোরণ ঘটলো; জার্মাণী কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রান্ত হলে সারা বিশ্বের মানচিত্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখানে অনেক জল পৃথিবীর সব দেশেই নদী দিয়ে বয়ে গেছে। 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' জমে উঠেছে সর্বত্র। বারুদের স্তূপে আগুন জ্বেলেছেন সেনাপতিরা, যুযুৎসুরা, হিটলার ও মুসোলিনী এবং অস্ত্রোৎসাহীরা। গান্ধী 'একলা রাতের অন্ধকারে' পথের আলো চাইছেন; তিনিও আগুন জ্বালবেন, কিন্তু কোন্ আগুন? বিংশ শতকের জন্মলগ্নে বুঅর যুদ্ধে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসকদেরই সহায়ক ছিলেন, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সহানুভূতি ছিল বুঅরদের প্রতি। প্রথম মহাযুদ্ধেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের তিনি ছিলেন সমর্থক। কিন্তু তারপর থেকেই গান্ধীর দৃষ্টিভংগি আমূল পরিবর্তিত হতে আরম্ভ করে। বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তাঁর মোহভংগ হয়, যদিও জাতি ও ব্যক্তি হিসাবে ইংরেজ সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রশংসা স্ফুট থাকে। যুদ্ধ সম্বন্ধেও তাঁর অনাস্থা ইতিমধ্যে চরমে ওঠে। যুদ্ধ, তা সে যে কারণে বা যে উদ্দেশ্যেই হোক, এবং যেখানেই হোক, যুদ্ধ মাত্রেই বর্জনীয়, কারণ মানুষ হত্যা করে মানুষের কোনো ভাল হতে পারে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। প্রতি-আক্রমণ না করে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করাকে তিনি মনে করতেন শ্রেষ্ঠ বীরত্ব। অহিংসায় বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি এক-সময় যুদ্ধের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেছেন, এবং তাঁর আচরণ কখনো কখনো মনে হয়েছে অসংগতিপূর্ণ। পূর্ণ অহিংসা প্রচার সত্ত্বেও তিনি কিন্তু বহুবার জোর দিয়েই বলেছেন, কাপুরুষতা ও হিংসার মধ্যে যদি বেছে নিতে হয় আমি বোলবো বরং হিংসা বেছে নাও। ১৯৩৮ খৃঃ যখন বাদশা খানের সংগে তিনি তাঁর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যান, পাঠানদের কাছে তিনি বলেছিলেন, তোমরা যদি অহিংসার শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে থাকো তাহলে অস্ত্র ত্যাগ করার ফলে নিজেদের আরো

বলীয়ান বলে ভাবতে পারবে। কিন্তু যদি এই শক্তির রহস্য তোমরা না বুঝে থাকো, যদি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করার ফলে তোমাদের মন আরও সবল না হয়ে আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে মনে করো, তাহলে তোমাদের পক্ষে অহিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতেই কংগ্রেসী অকংগ্রেসী সাধারণ ভারতীয়দের মনে এই মনোভাবই দৃঢ় হতে লাগলো যে বৃটেনের মুশকিলেই ভারতের মুশকিল আসান। বিপক্ষের দুর্যোগ মানেই স্বপক্ষের সুযোগ। গান্ধীর মন কিন্তু এই পাকা হিসাবী যুক্তিতে সায় ছিল না। তিনি বল্লেন, বৃটেন ধ্বংস হোক এবং সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে, সেই ধ্বংসের ফলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি, তা চাইনা। কারণ অহিংসার পথ তা নয়। অবশ্য য়ুরোপের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বৃটেন যুদ্ধে নেমেছে একথাও তিনি মানতে পারলেন না, কারণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত ক'রে এমন দাবী করার নৈতিক অধিকার বৃটেনের থাকতে পারে না। য়ুরোপ জ্বলছে; লক্ষ লক্ষ লোকের অবর্ণনীয় ক্লেশে গান্ধী নিজেও ক্লিষ্ট। আক্রান্ত, পর্যুদস্ত ফ্রান্সের প্রতি তাঁর সহানুভূতি; সাহসিক, আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ বৃটিশ জাতির মনোবলকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, অথচ ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সেই বৃটিশেরই হৃদয়হীন মনোভাব তাঁকে পীড়া দেয়। বিশ্বের এই পরিস্থিতিতে গান্ধী স্ববিরোধী ভাবনায় ও দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ। অল্প কিছুদিন আগে হিন্দুমুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে জিন্নার সংগে বৈঠকে মিলিত হবার আগে (১৯৩৮ এপ্রিল) তিনি বলেছিলেন: আমার রাজনৈতিক বা ব্যক্তি জীবনে এই সর্বপ্রথম মনে হচ্ছে আমি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই সর্বপ্রথম দেখছি আমি হতাশার কর্দমে নিক্ষিপ্ত।

১৯৩৯, ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে নেহরুর একটি প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাবে বলা হল যে স্বাধীন ভারতের

গঠনতন্ত্র রচনার জন্য একটি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি অবিলম্বে গঠন করা হোক ; বৃটিশ সরকার যদি এতে রাজি হন, কংগ্রেস ইংরেজকে যুদ্ধে সাহায্য করতে প্রস্তুত। গান্ধী কিন্তু এই শর্তাধীন সাহায্যের প্রস্তাবে খুশি হলেন না, তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন, হয় পুরোপুরি যুদ্ধের বাইরে থাকো অথবা পুরোপুরি যুদ্ধে সাহায্য করো। গান্ধী চাইলেন, কংগ্রেস এই বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামেই নয়, স্বাধীন ভারতেও অহিংসা নীতির অনুবর্তী থাকবে, এই মর্মে ঘোষণা করুক। ভারতবর্ষে বিভিন্ন মতের মানুষ রয়েছে এবং থাকবে এটি তিনি ভালভাবেই জানতেন এবং স্বাধীন ভারতে যে-সরকারই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার পক্ষে সম্পূর্ণ অহিংস থাকা যে অসম্ভব হবে সেকথাও তিনি বুঝতেন ; সেই সময় বিমান বহর ও স্থলবাহিনী যে দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজন হবেই এবিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল এই যে সম্ভব হলে কগ্রেস সংগঠন যেন অহিংসার পতাকা জনগণের সামনে তুলে ধরে এবং অহিংসার ভাবধারায় জনগণের মন প্রস্তুত করে। তাঁর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষ হবে অহিংসার এক নূতন পরীক্ষাস্থল এবং সারা বিশ্বের কাছে স্থাপন করবে আন্তর্জাতিক নূতন এক আদর্শ, যা দেখে যুদ্ধ এবং হিংসার পথ থেকে অন্যান্য রাষ্ট্রও আস্তে আস্তে শান্তি ও সহযোগের পথে পা বাড়াবে। আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ নিরসনের নীতি গান্ধীর অহিংসা নীতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা দানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ভারত সরকার অবশ্য এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। গান্ধী এই সামরিক শিক্ষার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি এমনকি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দিয়ে দাংগানিবারণও পছন্দ করতেন না। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর মতের সমর্থন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল দেখে তিনি কয়েক বৎসর আগেই কংগ্রেসের

সভ্যপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। অবশ্য কংগ্রেসের পরামর্শদাতা ও নেতা তিনি রয়েই গিয়েছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব মানেই নানা মতের নানা ভাবনার মানুষকে সংগে নিয়ে চলা এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা। রাজনৈতিক নেতা গান্ধী এবং সত্য ও অহিংসার প্রবক্তা ও পূজারী গান্ধীর মধ্যে যোগ নানা সময়ে এজন্য বিরোধ বেধেছে; বাস্তববুদ্ধি বিসর্জন না দিয়েও তিনি সর্বক্ষেত্রেই, উচ্চ আদর্শের কথাটি স্মরণে রেখেছেন এবং আপোষের পর আপোষ করতে করতে রাজনীতি যাতে নীতির ক্ষেত্রে একেবারে দেউলিয়া না হয়ে যায় সেবিষয়ে সাবধানী থেকেছেন। ১৯৪০ খৃঃ কংগ্রেস কমিটি যে প্রস্তাব পাশ করলেন তা গান্ধীর মত পুরোপুরি গ্রহণ কোরলো। কিন্তু প্রস্থাব পাশের সময় তিনি নিজের মত অন্যদের উপরে চাপিয়ে দিলেন না। সরকারের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা বিষয়ে যখন কোনো সাড়া মিললো না তখন বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে সরকার থেকে কংগ্রেসীরা বেরিয়ে এলেন। মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রীত্ব ত্যাগকে ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তি বলে হর্ষ প্রকাশ করলেন। এদিকে ১৯৪০ খৃঃ মার্চ মাসে করাচিতে মুসলিম লীগের অধিবেশনে লীগের স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র বা পাকিস্তানের প্রস্তাব পাশ হল। দ্বি-জাতিতত্ত্ব থেকে দুই রাষ্ট্রের তত্ত্ব এই কর্মসূচিতে জন্ম নিল।

গান্ধী অনুভব করলেন যে যুদ্ধ ভালো কি মন্দ বা ইংরেজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেবে কি না দেবে এসব অসার আলোচনায় আর কালক্ষেপ না করে ভারতবর্ষের পক্ষে কোনো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তিনি ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। ভারত সরকার যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে নাগরিকদের যে বাক্-স্বাধীন তাহরণ করে নিয়েছেন তার প্রতিবাদে এই সত্যাগ্রহ। গান্ধী প্রথম সত্যাগ্রহী হিসাবে মনোনীত করলেন বিনোবা ভাবেকে। বিনোবা ভাবে ওয়ার্ধার কাছে

এক যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিলেন, এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার কোরলো। ১৯৪৩ খৃঃ শেষ অবধি অ্যাসেমব্লির প্রায় চারশো জনপ্রতিনিধি গ্রেপ্তার হলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার নাগরিক কারাগারে বন্দী হলেন। এই নিরামিষ সত্যাগ্রহ উদ্বেলিত, অপমানিত স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে নি। সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠন বৃটিশ বিরোধী রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থানের ডাক দিতে এগিয়ে এলেন, এবং সুভাষ অল্পদিনের মধ্যেই বৃটিশ পুলিশ ও মিলিটারির চোখে ধূলো দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্ধান হলেন। বহিঃশক্তির সাহায্যে সসৈন্যে ভারতবর্ষকে মুক্ত করাই তাঁর সংকল্প। ১৯৪১ খৃঃ জুন মাসে জার্মানী যখন হঠাৎ মিত্র রাশিয়াকে আক্রমণ করে বসলো তখন সাম্যবাদী মহল রাতারাতি বৃটিশ বিরোধী মনোভাব বদলে যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। জাপান কর্তৃক পার্ল হারবারে মার্কিন জাহাজ ধ্বংসের পর আমেরিকাও সরাসরি মিত্রপক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল, এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ নীতি পরিবর্তনের সুপারিশ করলেন এবং কর্ণেল লুই জনসনকে ব্যক্তিগত দূত হিসাবে ভারতে পাঠালেন। তাতে যদিও কোনো ফল হল না, তবু আমেরিকার মনোভাব ভারতবর্ষের পক্ষে একটি নতুন সম্ভাবনার ইংগিত দিল। সিঙাপুরের পতন ও জাপানী সৈন্যবাহিনীর বর্মা অধিকারের পর ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব হয়ে উঠলো। ভারতীয়দের মনে শত্রুর শত্রু মিত্র এই যুক্তিতে জাপানের প্রতি প্রবল সহানুভূতি দেখা দিল। জাপান জয়লাভ করুক তা অবশ্য খুব কম লোকই প্রার্থনা করেছিল। নেহরু ঘোষণা করলেন, ভারতের জনগণ জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবে, তবে ইংরেজের স্বার্থে ও ইংরেজের দাস হয়ে নয়, স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে। মিত্রপক্ষের বহু-ঘোষিত অতলান্তিক সনদ বা "অ্যাটলান্টিক চার্টার" ভারতবর্ষের পক্ষে প্রযোজ্য নয় বলে চার্চিল তাঁর মত ব্যক্ত করেছিলেন,

কিন্তু ১৯৪২ খৃঃ ২২ ফেব্রুয়ারি রুজভেল্ট ঘোষণা করলেন, তাঁর মতে অতলান্তিক সনদ সব জাতির প্রতিই প্রযোজ্য। মার্শাল চিয়াং কাইশেক চীন ভূখণ্ডের শাসক-প্রতিনিধি হিসাবে ভারত পরিদর্শনে এলেন এবং বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের প্রতি মনোভাব পরিবর্তন করুক এই দাবী তিনিও জানালেন। চার্চিল তখন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে দূত হিসাবে ভারতে পাঠালেন কংগ্রেসের সংগে আপোষ আলোচনার জন্য। সমাজতন্ত্রী নিরামিষাশী স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস গান্ধীর উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন বলে চার্চিল আশা করেছিলেন। কিন্তু দিল্লিতে ক্রিপসের 'যুদ্ধের পর ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এই প্রস্তাব মন দিয়ে শুনবার পর গান্ধী তাঁকে বল্লেন, আপনি দেশে ফিরে যান, এ-প্রস্তাব ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণীয় হবে না। ক্রিপস শূন্যহাতে ফিরে গেলেন। এদিকে জাপানী বোমারু বিমান ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে বোমা বর্ষণ কোরলো, এবং গান্ধীর মনে হল ইংরেজের জন্য, ইংরেজের যুদ্ধে জড়িত হয়েই, ভারতের এই অবাঞ্ছিত দুর্দশা; অতএব আর বিলম্ব না করে মূল পাপ ইংরেজ শাসনকেই চ্যালেঞ্জ করা দরকার। ইংরেজ শাসক শুধু শাসক ও শোষক, ভারতীয় নাগরিকদের রক্ষক নয়, ভারতীয়দের আগ্রাসী আততায়ীর মুখে রেখে এই শাসক অনায়াসেই পশ্চাদপসরণ করবে। মালয় ও বর্মার মতো ভারতবর্ষও নূতন বিজেতার দ্বারা লুণ্ঠিত হবে, এই নিয়তি মেনে নেওয়া অসম্ভব। গান্ধী খুব তীক্ষ্ণ, হ্রস্ব কথায় এর সমাধান ঘোষণা করলেন: ভারত ছাড়ো, 'কুইট ইণ্ডিয়া'।

'ভারত ছাড়ো' এই সংক্ষিপ্ত দুটি শব্দ মন্ত্রের মতো কাজ কোরলো। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এই দুটি শব্দই ক্রমশ বড়ো হতে হতে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুক্তির স্লোগানের সংগে মিশে গেছে। 'ভারত ছাড়ো' কথাটির মানে কি? গান্ধীজীর অনবদ্য ভাষায় এর অর্থ খুব সোজা, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দাও, বা তা যদি না সম্ভব হয় অন্তত নৈরাজ্য বা অ্যানার্কির হাতে

তাকে সঁপে দাও। ভারতবর্ষের ভাবনা নিয়ে ইংরেজের বা অন্য কারো মাথা ব্যথার দরকার নেই। ইংরেজের বা জাপানের কারো হয়েই প্রয়োজন নেই, ভারতবর্ষ নিজের পক্ষ নিজেই অবলম্বন করবে। গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো'র অর্থ কালবিলম্ব না করে এখনই ছাড়ো, 'অভি ছোড়ো, জলদি ছোড়ো।' কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিল না। ১৯৪২ খৃঃ ১০ নভেম্বর তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যকে লাটে উঠাবার কাজে সভাপতিত্ব করার জন্য আমি মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরের প্রধানমন্ত্রী হইনি।" ('I have not become the King's First Minister in order to preside at the liquidation of the British Empire.')। চার্চিল শুধু জার্মানীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছিলেন না, গান্ধী ও গান্ধীর জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করছিলেন, এবং ১৯৪৫ খৃঃ পর্যন্ত যতোদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাঁর ভারত বিরোধিতাও বরাবর বজায় রেখেছিলেন। জুন মাসে মার্কিন সাংবাদিক ও গান্ধী-জীবনীকার লুই ফিশার সেবাগ্রামে গান্ধীর সংগে দেখা করতে যান। গান্ধী ফিশারকে বলেন, "আমার মধ্যে অনেক গলদ আছে। তুমি সেবাগ্রাম ছেড়ে যাবার আগে আমার শত শত ছিদ্র ও গলদ খুঁজে পাবে, আর যদি তুমি না পাও, আমাকে বোলো আমি দেখিয়ে দেবো।" লুই ফিশার ১৯৪২ খৃঃ গান্ধীকে যেমন দেখেছিলেন সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন: গান্ধীর শরীরে বয়সের ছাপ নেই। তাঁর গায়ের চামড়া কোমল এবং মসৃণ এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। তিনি যখন খাবার খান বা লেখেন, তাঁর সুন্দর হাত একটুও কাঁপে না। তিনি কখনো অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেন না। শুধু ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং বর্তমানের আন্দোলন নিয়েই তিনি ভাবেন। তাঁর সমাজ চিন্তার বলিষ্ঠতা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির তারুণ্যেরই পরিচায়ক। তাঁর বয়স যতো বেড়েছে ততোই তাঁর গোঁড়ামি কমেছে। বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে তিনি

জমিদার কর্তৃক স্বেচ্ছায় কৃষককে জমি অর্পণের পক্ষে ওকালতি করেছেন, কিন্তু চল্লিশের দশকে এসে স্বেচ্ছাদানের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বর্জন না করলেও, তিনি আরো চরম পন্থার উপর জোর দিয়ে বলেছেন, 'কৃষকই জমি দখল করে নেবে।' লুই ফিশার যখন প্রশ্ন করেন, 'জমিদারদের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে?' গান্ধী উত্তর দিয়েছেন—'না, আর্থিক সংগতির বিচারে তা অসম্ভব।' লুই ফিশার লিখেছেন, গান্ধীর বাহ্যিক চেহারায়, আচরণে, জীবনধারণে কোথাও অনন্য-সাধারণতা নেই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে। তিনি একেবারেই সাদাসিধে মাটির মানুষ, ক্ষমতাবানের জাঁকজমক তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর কর্তৃত্ব অবিসংবাদী। গান্ধী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পুরুষ নন, কোনো শাসন যন্ত্রের কর্ণধার নন, কাউকে বাধ্য করা, শাস্তি দেওয়া বা পুরস্কৃত করার কোনো ক্ষমতাই তাঁর নেই; তবু আশ্চর্য এই যে তাঁর ক্ষমতা যদিও শূন্য, তাঁর কর্তৃত্ব সীমাহীন। তাঁর সংগে নিবিড় ভাবে মিশলে বোঝা যায় কেন লোকে তাঁকে ভালবাসে। সবাই তাঁকে ভালোবাসে কারণ তিনি সবাইকে ভালবাসেন।

তাঁর প্রতিটি কথায় ও হাবভাবে ফুটে ওঠে তাঁর জীবন সাধনা—অভিষ্টের চেয়ে উপায়ের অগ্রাধিকার, অহিংসা, সত্যানুবর্তিতা, অপরের উপর আস্থা, এবং অন্যের দ্বিধা সংশয় অসুবিধা সম্বন্ধে সচেতনতা। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজে তিনি চিরন্তন ও সর্বজনীন মূল্যবোধের প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কোনো প্র্যাকটিক্যাল সমস্যার নৈতিক দিকটি বিচার করতে ভুলতেন না। যা অন্য যে কেউ করতে পারে অথচ করে না, তিনি তাই খুব সহজে অবলীলাক্রমে করেন, এইটুকুই তাঁর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ গান্ধী সম্বন্ধে লিখেছিলেন, হয় তো গান্ধী ব্যর্থ হবেন, বুদ্ধ বা যীশুখৃষ্টের মতোই হয় তো তিনি মানুষকে সত্যের পথে টেনে নিতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবেন; কিন্তু চিরদিন লোকে তাঁকে এজন্য মনে রাখবে যে তিনি ভাবীকালের কাছে

এক আদর্শ শিক্ষাপ্রদ জীবন রেখে গেছেন। তাঁর কাজের চেয়ে তিনি বড়ো ছিলেন। তাঁর কাজ গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য যাই হোক না কেন, গান্ধী মানুষটিকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর গান্ধী লুই ফিশারকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমাদের প্রেসিডেন্ট চার দফা স্বাধীনতার কথা বলেন। ঐ চার দফার মধ্যে কি স্বাধীনতা লাভের স্বাধীনতা আছে?" এই সময় নেহরু গান্ধীকে ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে বোঝাতে আশ্রমে এসেছিলেন। কিন্তু গান্ধী তাকে সাফ জানিয়ে দিলেন, নেহরু নিজে গান্ধী আন্দোলনে যোগ দিন বা না দিন, গান্ধী অচিরেই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। গান্ধী তখন "ভারত ছাড়ো" মন্ত্রে দৃঢ় ও অবিচল। গান্ধীর প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন বিষয়ে আলোচনার জন্য ৭ই অগস্ট বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসলো এবং আইন অমান্য আন্দোলন পাশ হবার পর ৮ই অগস্ট রাত্রে গান্ধী ডেলিগেটদের সম্বোধন করে বল্লেন, আইন অমান্য এই মুহূর্তেই আরম্ভ হচ্ছে না, তার আগে তিনি ভাইসরয়ের সংগে একবার দেখা করবেন। কিন্তু আপনারা প্রত্যেকে এই মুহূর্ত থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন নাগরিক বলে মনে করবেন, এবং যেন আর সাম্রাজ্য-বাদের অধীনস্থ প্রজা নন এমন আচরণ করবেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের চিন্তা ও মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করে এই প্রচলিত বিশ্বাস উলটে দিয়ে গান্ধী বলতে চাইলেন মানুষ তার মনোভাব বদলে ফেলতে পারে এবং এই ভাবে তার পারিপার্শ্বিককেও বদলে দিতে পারে আমরা যেমন চিন্তা করি তেমন হয়ে উঠি। অবশ্য সরকার অপেক্ষা করলেন না। ৯ই আগস্ট ভোর হতে না হতে গান্ধী সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হল।

আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষিত হবার আগেই গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু এই গ্রেপ্তারের ফলে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহিংস বিদ্রোহ ঘোষণা কোরলো। শুধু আইন অমান্য নয়, স্থানে

স্থানে বৃটিশের বিরুদ্ধে রীতিমতো গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা টেলিগ্রাফের তার কাটলো, রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ কোরলো, ডাকঘর পুড়ালো এবং রাজপুরুষদের উপর হামলা চালালো। বাংলাদেশ ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং মেদিনীপুর ও সাতারা জেলা স্বাধীন মুক্তাঞ্চলে পরিণত হল এবং সেখানে কিছুদিন স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত রইলো। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী একযোগে চেষ্টা করেও এই স্বাধীন সরকারকে টলাতে পারলো না। সারা দেশে প্রায় ছত্রিশ হাজার নরনারী কারারুদ্ধ হলেন এবং প্রায় ছশো নিহত হলেন। ১৯৪৩ খৃঃ এই ঘোর অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশে চরম দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে এল এবং পনর লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারালো। ইতিমধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছেন এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে সসৈন্যে এসে হাজির হয়েছেন। সীমান্তে নেতাজীর উপস্থিতি ভারতবর্ষে এক নবীন উদ্দীপনার সঞ্চার করলেও আজাদ হিন্দ সরকার খুব স্থায়ী ফল কিছু রেখে যেতে পারেনি। বৃটিশ সরকার গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করছিলেন যে হিংসাত্মক বিদ্রোহের এঁরাই প্ররোচক। গান্ধী এর প্রতিবাদ জানালেন এবং ইংলণ্ডে নাট্যকার বার্ণার্ড শ গান্ধীর সপক্ষে বিবৃতি দিলেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার এসবে আমল দিলেন না। তখন গান্ধী ১৯৪৩ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারি তিন সপ্তাহের জন্য অনশন শুরু করলেন। এই অনশনে গান্ধীর জীবনের ঝুঁকি ছিল কিন্তু তবু লর্ড লিনলিথগো প্যারোলেও গান্ধীকে মুক্তি দিলেন না। আশ্চর্যের বিষয়, তিন সপ্তাহ অনশনের ধকল গান্ধী সহ্য করে বেঁচে রইলেন। বন্দী অবস্থায় গান্ধী এবার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শেক্‌সপিঅর ও শ-এর নাটক পড়লেন, এবং সবচেয়ে আগ্রহ নিয়ে পড়লেন কার্ল মার্ক্স-এর 'ক্যাপিট্যাল' এবং মার্ক্স, এংগেলস, লেনিন ও স্টালিনের অন্যান্য গ্রন্থাবলী। বন্দী নিবাসে গান্ধী তাঁর দুই প্রিয়জনের মৃত্যুর সাক্ষী হলেন, একজন সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই, আরেকজন

জীবনসংগিনী কস্তুরবাঈ। গান্ধী নিজে যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন ১৯৪৪ খৃঃ ৬ই মে গান্ধী ও তাঁর সাথীদের ছেড়ে দেওয়া হল। কিছুদিন জুহুর সমুদ্র তীরে বিশ্রাম গ্রহণের পর গান্ধী আবার সেবাগ্রামে ফিরে গেলেন এবং নূতন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল-এর সংগে পত্রালাপ শুরু করলেন। কংগ্রেস যখন জেলে, তখন অঞ্চলবিশেষে মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি অনেকটা বেড়ে গেছে। গান্ধী অবিলম্বে মিঃ জিন্নার সংগেও আলোচনা আরম্ভ করলেন। জিন্না ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ; তিনি কংগ্রেস-লীগ সমতার ভিত্তিতে ছাড়া আলোচনায় বসতে রাজী হলেন না। তিনি আরো দাবী করলেন যে, ইংরেজকে ভারত ছাড়তে হবে, তবে তার আগে ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যেতে হবে। যখন স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র রচনার কথা উঠলো, জিন্না বল্লেন সারা ভারতের জন্য একটি গঠনতন্ত্র হতে পারেনা; ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতি, অতএব রাষ্ট্র হবে দুটি, এবং গঠনতন্ত্র হবে দুই স্বাধীন রাজ্যের জন্য দুটি। ইংরেজ যে সত্যিই ভারত ছাড়তে চায় তা বুঝাবার জন্য ভাইসরয় প্রস্তাব করলেন, অবিলম্বে ভাইসরয়ের কাউন্সিল বা মন্ত্রণা সভাকেই অন্তর্বর্তী সরকার হিসাবে পরিবর্তিত করা হবে। এই সরকারে প্রত্যেক বড় বড় রাজনৈতিক দল থেকে মন্ত্রী গ্রহণ করা হবে। বড়লাটের ভেটো থাকবে তবে এই ক্ষমতাও খুব সীমিত রাখা হবে। কংগ্রেস রাজী হল, কিন্তু জিন্না জিদ ধরলেন লীগের প্রতিনিধি ছাড়া কোনো মুসলিম সদস্য গ্রহণ করা চলবে না। কংগ্রেস তাতে রাজী নয়, কাজেই এই প্রস্তাব কার্যকরী হল না। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শ্রমিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী এটলি নূতনভাবে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। জাপানের পরাজয়ের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈন্যদের যখন বিচার শুরু হল তখন সারা ভারতে নূতন বিদ্রোহী মনোভাবের জোয়ার দেখা দিল। ১৯৪৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় নৌবহর বিদ্রোহের ডাকে সাড়া

দিল এবং পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষে এই সময় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দেশসহ অমুসলমান অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হল। বাকি মুসলিম প্রদেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল মুসলিম লীগ। মার্চ মাসে ইংলণ্ড থেকে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এলেন। তারা প্রচার করলেন, সমস্ত ভারতের জন্য যে গঠনতন্ত্র রচিত হবে তা হবে ফেডারেল ধাঁচের; সর্বোচ্চে কেন্দ্র ও সর্বনিম্নে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য, মাঝখানে স্বেচ্ছাসংযুক্ত আঞ্চলিক জোট, যার ফলে মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করতে পারবে। গঠনতন্ত্র রচনার জন্য কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লি বসবে এবং এতে সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষাকবচের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। গঠনতন্ত্র রচিত হবার পর ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি না তা ভারতবর্ষই ঠিক করবে। সব পার্টিই পরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিল। কিন্তু কংগ্রেস তার দলের সদস্য হিসাবে হিন্দু বা মুসলিম যেকোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করবার অধিকার ছাড়তে রাজী হল না, জিন্নাও জিদ ধরলেন মুসলমান সদস্য লীগের বাইরে থেকে নেওয়া চলবে না। লর্ড ওয়াভেল লীগের দাবী নাকচ করে দিয়ে বল্লেন, কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লি বসবে এবং প্রত্যেক পার্টির অধিকার থাকবে তার ইচ্ছা মতো সভ্য নির্বাচনের। জিন্না প্রত্যুত্তরে ঘোষণা করলেন, মিশন প্রস্তাবিত ফেডারেল গঠনতন্ত্রে মুসলিম লীগের আদৌ মত নেই এবং পাকিস্তান ছাড়া অন্য কিছুতেই লীগ রাজী নয়। তিনি ঘোষণা করলে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লি তাঁর দল বয়কট করবে। লীগের পরবর্তী কার্যক্রম হল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' বা 'ডিরেক্ট অ্যাকশন'। ১২ই অগস্ট বড়লাট নেহরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে আবেদন করলেন, জিন্না প্রতিবাদে ১৬ই অগস্ট সারা ভারতে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করলেন। ঐ দিন কলকাতায় হিন্দু নিধনের এক লোমহর্ষক তাণ্ডব দেখা গেল। দাংগাকারীরা প্রায়

পাঁচ হাজার হিন্দুকে হত্যা কোরলো ; লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন আরো কতো হল তার হিসাব নেই। এই গণহত্যার প্রতিশোধ হিসাবে হিন্দু দাংগাকারীরাও সংগঠিত হতে লাগলো এবং হত্যালীলা অব্যাহত রইলো। ২রা সেপ্টেম্বর নেহরু প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন এবং লীগ প্রথমে কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন করলেও পরে জিন্না এই অন্তর্বতী সরকারে লীগ যোগ দেবে বল্লেন। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের মন্ত্রীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা রইলো না। অন্তর্বতী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বরং আরো বেড়ে উঠলো।

ক্ষমতার স্বাদ পাবার পর ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে নেতৃবৃন্দ মরিয়া হয়ে উঠলেন। হিন্দুমুসলমানের সংঘর্ষ রচনা করেই লীগের ইপ্সিত পাকিস্তান পাওয়া যাবে এই মনে করে অক্টোবর মাসে সুপরিকল্পিত ভাবে পূর্ববাংলার চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জেলায় দাংগা বাধানো হল এবং ক্রমশ এই দাংগা গৃহযুদ্ধের রূপ নিতে আরম্ভ কোরলো। নির্যাতিত, গৃহচ্যুত, আতংকিত বাস্তুহারার দল যখন পালিয়ে এসে বিহারের শহরে গ্রামে এসে আশ্রয় নিতে আরম্ভ কোরলো তখন তাদের মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে বিহারে "নোয়াখালি দিবস" পালনের আহ্বান দেওয়া হল এবং প্রতিহিংস্র লোকেরা চার হাজারের বেশি মুসলিম নরনারী হত্যা কোরলো।

গান্ধীর মন বিষাদে ভরে উঠলো। তাঁর আজীবনের আদর্শ ও সাধনা—হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্বরাজ ও ভ্রাতৃত্ব—দাংগার আগুনে দাউ দাউ করে পুড়ছে ; তিনি একে কী করে বাঁচাবেন ? তিনি স্থির করলেন নোয়াখালি যাবেন, হিন্দুদের মনে আশ্বাস ফিরিয়ে আনবেন। তাঁর কাছে এছাড়া আর কোনো সহজ পথ নেই। তিনি প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারের। নভেম্বর মাসে গান্ধী পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের সংগমে দুর্গম জেলা নোয়াখালিতে এলেন। পোড়া ঘর ভাঙা ভিটেয় বসে তিনি বুঝলেন

এটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও সবচেয়ে জটিল দায়িত্ব, তাঁর সমর্পিত জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। এখানেই হয় তাঁর মন্ত্রের সাধন, নয় তাঁর শরীর পাতন। নোয়াখালিতে গান্ধী যে চার মাস রইলেন তার কাহিনী ভারত ও পাকিস্তানের নরনারীরা চিরদিন অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে স্মরণ করবে। কখনো খালি পায়ে, কখনো বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে জীবন বিপন্ন করে, সাতাত্তর বৎসর বয়সেও অদম্য গান্ধী গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরলেন, প্রতিদিন প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছেন, যেখানে সম্ভব মিলিত প্রার্থনা ও আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে" গান্ধীর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠলো। এরপর গান্ধী গেলেন বিহারে, হিন্দু-মুসলমান একসংগে মিলে মিশে থাকতে পারে এবং থাকতেই হবে, এই বিশ্বাস তিনি আঁকড়ে রইলেন। আবদুল গফফর খান গান্ধীর সংগে বিহারের সেবাকার্যে যোগ দিলেন। কিন্তু এরপর পাঞ্জাবেও দাংগা ছড়িয়ে পড়লো এবং দেশ বিভাগের লজিক অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। ১৯৪৭ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে পাকাপাকিভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে ১৯৪৮ খৃঃর মধ্যেই তারা ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবেন এবং উত্তরাধিকারী এক বা একাধিক সংস্থার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাবেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এই হস্তান্তর সম্পূর্ণ করবার ভার নিয়ে বড়লাট হিসাবে ভারতে এলেন, সংগে লেডি মাউণ্টব্যাটেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার তারিখ এগিয়ে ১৯৪৭ সালের মধ্যেই রাখতে চাইলেন এবং কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁর নূতন পরিকল্পনা রাখলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলি ভারত থেকে ইচ্ছে করলে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়তে পারবে, এবং হিন্দুমুসলমান যেখানে প্রায় সমান সমান সেই প্রদেশগুলি—বাংলা ও পাঞ্জাব—দ্বিখণ্ডিত করা চলবে; দেশীয় রাষ্ট্রগুলি তাদের ভবিষ্যৎ ভারত বা পাকিস্তানের সংগে স্থির করবে। নেতারা এই ব্যাপারে

সম্মত হলেন। কিন্তু গান্ধী? তিনি এর আগে বলেছিলেন, গোটা ভারতবর্ষ শাসনের ভারই জিন্নাকে দেওয়া হোক, তিনি দেশের ঐক্য বজায় রেখে গোটা ভারতবর্ষকেই পাকিস্তান করুন তাতে গান্ধীর আপত্তি নেই। কিন্তু এখন? এখন অবশ্য তাঁর মতামতের প্রশ্ন অত্যন্ত গৌণ, কারণ নেতারা সকলেই মাউণ্টব্যাটেনের দলে যোগদান করেছেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টে বিনা বাধায় ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হয়ে গেল এবং ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ই অগষ্ট ক্ষমতা সম্পূর্ণ হস্তান্তরিত হবে ঘোষিত হল। কিন্তু প্রথম স্বাধীনতা উদযাপনের দিন গান্ধী পড়ে রইলেন একা, পরিত্যক্ত, রিক্ত, দিল্লির নূতন দেশী মসনদ থেকে শত শত মাইল দূরে। কলকাতার মুসলিম বস্তিতে তাঁর ভ্রাতৃঘাতী দাংগার রক্ত ধোয়ার কাজ তখনো অসমাপ্ত। শুধু ক্ষমতাই হস্তান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু হিন্দুমুসলমানের মধ্যে নূতন ভ্রাতৃত্ব, নূতন স্বদেশ গড়ার উদ্দীপনা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর জীবন সায়াহ্নে ভারতের ভূখণ্ড থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপসারণ যখন সত্যই ঘটছে তখন গান্ধী কোনো আনন্দ অনুভব করতে পারলেন না। তাঁর চারিপাশে এক প্রচণ্ড হরিষে বিষাদ। ১৫ই অগস্ট স্বাধীনতা উৎসবে তিনি কোনো অংশ গ্রহণ করলেন না। মহাত্মাজীর কাছে বি-বি-সি থেকে বাইরের বিশ্বের জন্য একটি বাণী চাওয়া হল, তিনি কোনো বাণী দিলেন না। এক প্রচণ্ড ব্যথতা, হতাশা ও ক্ষোভের মধ্যে দিল্লির নহবত থেকে দূরে তিনি গ্রামের দিকে পা বাড়ালেন; তাঁর আরব্ধ কাজ আবার নতুন করে, প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। তিনি পথিক, পথেই তাঁর স্থান; তিনি যাত্রী যাত্রাই তাঁর তপস্যা, তিনি সাধক সাধনাই তাঁর শান্তি। সামনে ম্লান, গরীব ভারতবর্ষ। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি পদদলিত নরনারী ও ছিন্নমূল মানুষের ক্রন্দনে স্বদেশ মুখরিত; তাঁর এতদিনের অনুবর্তী মন্ত্র-শিষ্যরা তাঁকে কার্যত বর্জন করেছেন, রাজনৈতিক নেতা ও নব্য শাসকদের কাছে তিনি যেন অস্পৃশ্য, পরিত্যাজ্য।

শুধু বাংলা ও পাঞ্জাব নয় হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ও ছুরি দিয়ে কাটা হল ; এবং এই বিদ্বেষের বিষ পাকাপাকি ভাবে সঞ্চারিত করার জন্য আবার দাংগা জাগিয়ে তোলা হল। পাঞ্জাবে যখন দাংগা ভয়াবহ আকার নিয়েছে বাংলা তখনো শান্ত, গান্ধী সেখানে সাম্প্রদায়িক মিলনের কাজে ব্রতী। মাউণ্টব্যাটেন বলেছিলেন, পাঞ্জাবে আমাদের পঞ্চান্ন হাজার সৈন্য থাকা সত্ত্বেও দাংগা দমন করতে পারছিনা, আর বাংলায় সৈন্য বলতে মাত্র একজন, তিনি গান্ধী। তিনি একাই বাংলা-দেশকে শান্ত রেখেছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তখন চূড়ান্ত দাবার চাল চালছে। ৩১ অগষ্ট রাত্রিবেলা একদল গুণ্ডা গান্ধী বেলেঘাটায় মুসলিম বস্তীতে যে বাড়ীতে ঘুমোচ্ছিলেন সেখানে হানা দিয়ে গান্ধীর প্রাণনাশে উদ্যত হল। গান্ধী আক্রমণকারীদের ভয়ে ভীত হলেন না। তিনি তাদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য অনশন আরম্ভ করলেন। এর পর হিন্দু মুসলমান নরনারীর মিলিত করুণ মিছিলে বেলেঘাটা ও কলকাতা ভরে উঠলো। আততায়ী দলের দলপতিরা শয্যাপাশে বসে অশ্রু বিসর্জন কোরলো।

৪ঠা সেপ্টম্বর হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দের মিলিত আশ্বাস পাবার পর গান্ধী যখন অনশন ভংগ করলেন তখন কলকাতা একেবারে শান্ত, মনে হল দাংগাবিধ্বস্ত ভ্রাতৃঘাতী শহরে আরেকটি নতুন ভ্রাতৃমুখী শহর জন্ম নিচ্ছে। বাংলা ও বিহার শান্ত হলে হবে কী ? বিভক্ত পাঞ্জাব থেকে ছিন্নমূল মানুষের স্রোতে দিল্লি ও আশেপাশের অঞ্চল ভেসে গেল। পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু ও শিখের মুখে মুখে নির্যাতন ও হত্যার নারকীয় কাহিনী ছড়াতে লাগলো এবং প্রতিশোধের স্পৃহায় মেতে উঠলো দিল্লি। গান্ধী সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লি গেলেন। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় তখন দিল্লি অস্থির। গান্ধীর হরিজন কলোনি যখন শরণার্থীতে ভরে গেল তখন তিনি বিড়লা ভবনে একতলায় একখানা ছোট ঘরে গিয়ে উঠলেন, সংগে রইলেন প্যারেলাল এবং মানু ও আভা গান্ধী। শরণার্থীদের মধ্যে সেবাকাজ

চালানো, শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমিত করাই গান্ধীর একমাত্র কাজ হয়ে উঠলো। জমিয়ত-উল-উলেমা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জাকির হোসেনকে একদল মারমুখী হিন্দু জনতা অবরুদ্ধ করে রেখেছে খবর পেয়ে গান্ধী ছুটে গেলেন। যেসব ঘরবাড়ীতে আগুন দেওয়া হয়েছিল তা নেভানো গেল না, কিন্তু জাকির হোসেনের জীবন ও বুনিয়াদি বিদ্যালয়টি তিনি রক্ষা করলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিড়লা ভবনে গান্ধী প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করতেন; এখানে সকলেরই ছিল অবারিত দ্বার। তিনি রাত্রিদিন নানা রাজনৈতিক বিষয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার উপর জোর দিয়ে ভাষণ দিতেন। কিন্তু হিন্দু মুসলমান শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠছিল কি? গান্ধীজী শেষ বারের মতো মানুষের মনে শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য অনশন আরম্ভ করলেন। এই অনশনের মধ্যেও তিনি ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করলেন পাকিস্তানকে তার দেশ বাটোয়ারার খাতে প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা অবিলম্বে দিয়ে দেওয়া হোক। ১৮ই জানুয়ারি সর্বদলের ও মতের নেতারা মিলিত প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তারা দিল্লিতে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখবেন। মিলিত অনুরোধে গান্ধী অনশন ভংগ করলেন। এখন তাঁর সামনে দুটি কাজ, একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচারে পাকিস্তান যাত্রার উদ্যোগ করা; দুই, রাজনৈতিক সনদ তৈরি করা। সনদটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনার জন্য প্রস্তাব আকারে তিনি রচনা করলেন, এতে বলা হল যে রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে কংগ্রেসের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এবং এখন থেকে কংগ্রেসের রূপ হবে গ্রামকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক সেবা প্রতিষ্ঠান। তাঁর নিজের বাসনা সেবাগ্রামে ফিরে গিয়ে গঠনমূলক কাজে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করবেন। ২০শে ফেব্রুয়ারি অভ্যর্থনা সভায় মদন খাঁ নামে মারাঠী এক যুবক একটি হাত বোমা ছুঁড়লে সভায় উপস্থিতরা ভীতিবিহ্বল

হয়ে পড়ে। মদনলাল ও তার সহযোগীদের মতে গান্ধী একজন বিশ্বাসঘাতক। গান্ধী সবাইকে শান্ত থাকতে বললেন, এবং আততায়ী মদনলালের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে অনুরোধ জানালেন। গান্ধী বুঝলেন মদনলাল একা নয়, তার দলে আরো লোক আছে। তিনি বন্ধুদের বল্লেন, "কোনো উন্মত্তের হাতে বুলেটের আঘাতে যদি আমার মৃত্যু ঘটে আমি সেই মৃত্যু হাসিমুখে বরণ কোরবো। যদি তেমন কিছু ঘটে তোমরা চোখের জল ফেলো না।" ২৭শে জানুয়ারি মিঃ শিয়ান নামে একজন মার্কিন সাক্ষাৎকারীর সংগে তিনি অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন। তিনি, তাঁকে বল্লেন "ক্ষমতা থেকে দূরে থাকা উচিত, ক্ষমতা মানুষকে খারাপ করে।" ৩০শে জানুয়ারি সকালে তিনি চিঠিপত্রের উত্তর দিলেন। বিকেলে কংগ্রেস নেতাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য তিনি সরদার বল্লভভাই প্যাটেলকে বিকেল চারটায় বিড়লা ভবনে ডেকে পাঠালেন। প্যাটেলের সংগে আলোচনায় অভ্যর্থনা সভায় যেতে তাঁর দেরি হচ্ছিল। আভা গান্ধী গান্ধীজীকে ঘড়ি দেখালেন। না আর দেরি নয়, গান্ধী চটপট উঠে পড়লেন; আভা ও মানুর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি প্রার্থনা সভায় হাজির হলেন। দুধার থেকে সমবেত নরনারী গান্ধীর জন্য পথ করে দিচ্ছেন এবং গান্ধী চাতালের সিঁড়িতে উঠছেন, এমন সময় ডান দিক থেকে ভিড় ঠেলে একজন খাকি পরা যুবক এগিয়ে এল, যেন গান্ধীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার জন্য আসছে। মানুকে দুহাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লোকটি একটু নত হয়ে অভিবাদন করলো এবং তারপর গান্ধীকে লক্ষ্য করে মাত্র দেড় হাত দূর থেকে পিস্তল বের করে পর পর তিনটি গুলি ছুঁড়লো। গান্ধী পড়ে গেলেন, অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, "হা রাম!"

৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮ জওহরলাল নেহরু দিল্লি থেকে এক বেতার ভাষণে বল্লেন:

"বন্ধুগণ, কমরেডগণ, আমাদের জীবন থেকে আলো নির্বাপিত

এবং সর্বত্র অন্ধকার। আমি জানি না তোমাদের কাছে কী বোলবো এবং কী ভাবেই বা বলবো। আমাদের প্রিয় নেতা, যাঁকে আমরা বাপু বলে ডাকতাম, আমাদের জাতির জনক, আমাদের মধ্যে আর নেই। হয়তো আমার 'নেই' বলাটা ভুল। তবু, এতদিন আমরা তাঁকে যেমন করে দেখে এসেছি আর তেমন করে দেখতে পাবো না। উপদেশের জন্য তাঁর কাছে আর ছুটে যাবো না এবং তাঁর কাছ থেকে সান্ত্বনাও চাইবো না। এটি শুধু আমার কাছেই নয়, এই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এক দারুণ আঘাত। কোনো উপদেশ দিয়ে এই আঘাতকে প্রশমিত করা আমার বা অন্য কারো পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। আলো নির্বাপিত আমি বলেছি। কিন্তু আমি ভুল বলেছি। কারণ যে আলো এই দেশে জ্বলেছিল তা সাধারণ আলো নয়। এতদিন যে আলো এই দেশকে আলোকিত করেছে সে আলো এদেশকে আরো অনেক বছর ধরে আলোকিত করবে, এবং সহস্র বৎসর পরেও সে আলো এদেশে দেখা যাবে, এবং সারা পৃথিবী তা দেখতে পাবে এবং অসংখ্য মানবহৃদয়কে সেই আলো শান্তি দেবে। কারণ সে আলো আশু বর্তমানের চাইতে আরো বেশি কিছু প্রকাশ করেছে, জীবন্ত সত্যকে প্রকাশ করেছে···এই চিরন্তন সত্য আমাদের ন্যায় পথের নির্দেশ দিয়েছে, আমাদের ভ্রান্তি থেকে বারিত করেছে, এবং এই সুপ্রাচীন দেশকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।"

২ ফেব্রুয়ারি তারিখে পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিতে গিয়ে নেহরু আবার বল্লেন: "বহুযুগ পরে ইতিহাস আমাদের এই যুগকে বিচার করবে, বিচার করবে এর সাফল্য ও ব্যর্থতার। আমরা এখনও খুব কাছের মানুষ, কী ঘটেছে কী ঘটেনি তার বিচার করতে বা বুঝতে সক্ষম নই। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে আমাদের মাঝখানে এক গৌরব ছিল যা এখন আর নেই। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে এই মুহূর্তে আমাদের চারিদিকে অন্ধকার। ততোটা অন্ধকার অবশ্যই নয়, কারণ আমরা যখন আমাদের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি দিই দেখি

তিনি যে আলো সেখানে জ্বালিয়ে গেছেন সেই আলো এখনও সেখানে দীপ্যমান। সেই দীপ্ত শিখা যদি অনির্বাণ থাকে তাহলে এদেশে কখনোই অন্ধকার নেমে আসবে না, এবং আমরা যদিও অতি ক্ষুদ্র, তবু তিনি যে আলো আমাদের মধ্যে জ্বেলে দিয়ে গেছেন তাই দিয়েই আমরা তাঁর প্রার্থনায় যোগ দিয়ে এবং তাঁর পথ অনুসরণ করে এই মাতৃভূমিকে আবার আলোকিত করে তুলতে পারবো। সম্ভবত তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক, এবং আমি বলবো, অনাগত, ভবিষ্যৎ ভারতেরও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। এই ঈশ্বর-প্রাণিত মানুষটি জীবিতকালে ছিলেন মহাত্মা, মৃত্যুতে তিনি হয়েছেন মহত্তর। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তিনি তাঁর মহৎ আদর্শই তুলে ধরেছেন, যেমন তিনি সারা জীবন ধরে তুলে ধরেছেন।"

প্রার্থনা শুরু করার আগেই গান্ধী নিহত হন, কিন্তু তাঁর প্রার্থনার গায়ে কোনো গুলি লাগেনি। তাঁর অসমাপ্ত বিশ্বমৈত্রীর প্রার্থনা-সভাটি বড় হতে হতে একদিন বিশ্ব অধিকার করে বসবে। কারণ মৈত্রীর কোনো বিকল্প নেই। অহিংসা যতো অবাস্তবই মনে হোক, অহিংসার কোনো বিকল্প নেই; জীবন যতোই নিষ্ঠুর প্রতিভাত হোক, জীবনের কোনো বিকল্প হয় না। গান্ধী ছিলেন ভারতবর্ষের একমাত্র স্বাধীন মানুষ, সম্ভবত এযুগের পৃথিবীতে প্রথম এবং একমাত্র স্বাধীন পুরুষ। মানুষ যে-মত, এবং যে-পথ ধরেই অগ্রসর হোক, সব পথই শেষ পর্যন্ত গান্ধীর পায়ে হাঁটা পথে গিয়ে মিশবে, যেমন সমস্ত জলধারা পাহাড় পর্বত সমতল অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে মেশে।

উপসংহার

"মুক্তি" কথাটি ভারতবর্ষে বহুকাল থেকে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যেমন মুক্ত পুরুষ, জীবন্মুক্ত প্রভৃতি। মুমুক্ষু বলতে অবশ্য মুক্তিকামী সাধুপুরুষকেই বুঝায়। "স্বাধীনতা"র ধারণাটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। রাজনৈতিক চেতনা বা রাষ্ট্রচেতনা আগে ছিলনা, ফলে রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণাও আগে ছিলনা। রাষ্ট্রিক চেতনা বৃদ্ধির সংগে সংগে ব্যক্তিমানুষ থেকে আমাদের ঝোঁকটি গিয়ে পড়লো নাগরিক মানুষের ওপর। নাগরিক হিসাবে, ভোটদাতা হিসাবে, আমাদের দায়দায়িত্ব, কৃত্য ও অধিকার সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠলাম। শুধু আমাদের দেশে নয়, গণতন্ত্রের আবির্ভাবের পর পৃথিবীতে সর্বত্রই এই ব্যাপারটি ঘটেছে। ন্যায়ের বিধানের পরিবর্তে আইনের বিধানই সবচেয়ে বড়ো—কখনো বা একমাত্র শক্তি হিসাবে পরিগণিত। ন্যায় অন্যায় যাই হোক, কোনো কাজ বে-আইনি না হলেই হল। ন্যায়ের বিধান আইনের শৃংখলে সংকুচিত হল। এতে আইন-বিগর্হিত "ক্রিমিন্যাল" ঘটনা কিন্তু বাড়তেই লাগলো। অপরাধ প্রতিরোধের দিকে লক্ষ্য না গিয়ে লক্ষ্য পড়লো অপরাধীর শাস্তির উপর। শাসন ও শাস্তি এই দিয়েই যেন রাষ্ট্র ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষকে অভীষ্টে নিয়ে যাওয়া যায়। গান্ধীজী এই দৃষ্টিভংগি সম্পূর্ণ উলটে নেবার কথা বললেন। ন্যায় আইনের চেয়ে বড়ো। ন্যায়কে অমোঘ জ্ঞান করলে আইন হয়ে দাঁড়ায় অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত। যদি ন্যায়ের উপর দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারতাম তাহলে আইনের উপর নির্ভর করবার দরকারই হত না। আইনশূন্য সমাজই অতএব আদর্শ সমাজ। রাজনৈতিক বা পৌর স্বাধীনতা থাকলেই মানুষ স্বাধীন হয়, এই আধুনিক কুসংস্কার বর্জন করার কথাই গান্ধী বললেন। "মুক্তি"

ছাড়া স্বাধীনতার কোনো অর্থ হয় না। আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক মুক্তি নয়, মনের মুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তি। মানুষের একটিমাত্র স্বাধীনতাই প্রয়োজন—মুক্ত হবার স্বাধীনতা, মুক্তির স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বা মুক্তির নেতিবাচক অর্থ হল—কোনো কিছু থেকে মুক্তি; শাসন, পীড়ন, পরবশ্যতা, জবরদস্তি ইত্যাদি থেকে স্বাধীনতা। ইতিবাচক দিক হল—সচ্ছন্দ সৃষ্টির স্বাধীনতা, কিছু হয়ে উঠবার স্বাধীনতা। "মুক্তি" মানে কর্মবিরতি বা বিশ্রামের অবস্থা নয়, ব্যক্তিত্ব অর্জনের অবাধ নিরন্তর সাধনা। রুশো বলেছিলেন, মানুষ যখন জন্ম নেয় তখন সে শুধু "মুক্ত"; সে স্বাধীন নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা সে পরে অর্জন করে। প্রথমে সে মুক্ত, পরে সে স্বাধীন, কিন্তু যখন সে স্বাধীন, দেখা যায় সে আর মুক্ত নেই। মুক্তি ব্যক্তির মানসলোকের ব্যাপার, "স্বাধীনতা" বা লিবার্টি নাগরিক অধিকারের ব্যাপার। লিবার্টি এক এক দেশে, সমাজে, নাগরিক পরিবেশে এক এক রকম; এটি বাস্তব অবস্থা থেকে উদ্ভূত, পরিবর্তনশীল, কিন্তু মুক্তি সর্বদেশীয় ও সর্বকালীন।

আধুনিক "অস্তিতিবাদী" বা একজিসটেনশিয়ালিস্ট মতাবলম্বীরাও বলেন, "সত্যের সার হচ্ছে মুক্তি"। হাইডেগগের-এর এই উক্তির সংগে "তত্ত্বের আগে অস্তিত্ব" সার্ত্র-এর এই উক্তিটিও মানতে হবে। গান্ধীবাদকে এই মুক্তিতত্ত্বের দিক থেকে অস্তিতিবাদের সংগে খানিকটা যুক্ত করা যায়, যদিও গান্ধীজী নিজে মনে করতেননা যে, অস্তিত্বই আগে সারতত্ত্ব পরে। কিন্তু তাঁর কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তব অবস্থা বা অস্তিত্বের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। তিনি অবস্থা অনুযায়ী কর্মনীতি নির্ধারণে বিশ্বাসী। কিন্তু তাই বলে চিরন্তন নীতিকে তিনি বিসর্জন দেননি, বরং তাঁর ন্যায়নীতির চিরন্তন ধারণাগুলিকেই বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করেছেন। বিশ্বাসের প্রশ্নটি বাদ দিলে, মুক্তিই চিরন্তন নীতি। এই সিদ্ধান্তে অস্তিতিবাদী ও গান্ধীবাদীর সংগে

কোনোই বিরোধ নেই। হাইডেগগের বলেন, সত্যের সার হচ্ছে মুক্তি; গান্ধী বলেন, মুক্তির সার হচ্ছে সত্য। একজনের কাছে মুক্তিই সত্য, আরেকজনের কাছে সত্যই মুক্তি। সার্ত্রের মতে, মানুষ হচ্ছে 'ফ্রী উইল' বা স্বাধীন ইচ্ছার ফল। গান্ধীবাদীরাও তাই বলেন। তারা আরেকটু জোর দিয়ে বলেন যে, মানুষ হচ্ছে "স্বাধীন ইচ্ছা" প্রয়োগের ফল। অস্তিতিবাদীরা প্রয়োগের উপর খুব বেশী জোর দেননা, খানিকটা জন্মগত সংস্কার বা ইনসটিংকট হিসাবে "স্বাধীন ইচ্ছা"কে ধরে নেন। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে মানুষ সর্বত্র শৃংখলিত কেন, তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

আশু লক্ষ্য ও দূর লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না রাখলে অনেকখানি এগোবার পর দেখা যায় আমরা প্রকৃতপক্ষে বেশি এগোইনি; তখন অনেক ঘুরে, লব্ধ ফলের অধিকাংশ পরিত্যাগ করে, নতুন ভাবে যাত্রা শুরু করতে হয়। "প্রগতি" শুধু গতিকেই বড়ো করে দেখে, লক্ষ্যকে নয়, পদ্ধতিকে নয়। সুগতি এবং দুর্গতি দুইই তো প্রগতির ফলশ্রুতি হতে পারে, হয়ও। দূর বা চরম লক্ষ্যের সংগে আশু লক্ষ্যকে মিলাতে পারলে অনেক পণ্ডশ্রম বাঁচানো যায়। "শুধু যাচ্ছি" তেই আমাদের সার্থকতা নয়। "কোথায় যাচ্ছি?" সেটাই বড়ো কথা। লক্ষ্য যখন দূরের, তখন "কোথায় যাচ্ছি"র চেয়েও বড়ো প্রশ্ন "কীভাবে যাচ্ছি?" কারণ লক্ষ্যে পৌঁছানো এক জীবনে, এক যুগে, এক শতাব্দীতে সম্ভব না হতে পারে, তাই বলে বহু বছরের ফলের জন্য, সুদূর বংশধরদের জন্য, মানুষকে জীবন বিসর্জন দিতে বলা নিষ্ঠুরতা; বরং পৌঁছানোর চেষ্টার পদ্ধতির মধ্যেই যদি সার্থকতার স্বাদ থাকে তবে সেটাই সবচেয়ে কাম্য। পাওয়া যদি দীর্ঘ ব্যবধানের পর হঠাৎ প্রাপ্তি না হয়ে প্রতিমুহূর্তের প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে, ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠে, পূর্ণ হয়ে ওঠে, তবে তাতে কেউই বঞ্চিত হয়না; সম্পূর্ণ প্রাপ্তির বেদীতে সম্পূর্ণ অপ্রাপ্তির মধ্যে জীবন বিসর্জন দিতে হয়না। রাজনীতি যেহেতু নিদিষ্ট স্বাধিকার

অর্জনের মধ্যে ব্যাপৃত ও সীমিত, তাই রাজনীতিপ্রধান আধুনিক জীবনধারণের আন্দোলনগুলি আশু লক্ষ্যের মধ্যেই সীমিত। এর মধ্যে অধিকার অর্জনের চেষ্টা আছে, কিন্তু মুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা নেই। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে মানুষ নিজেকে একটি দাবার ঘুঁটির চেয়ে বেশি তাৎপর্যময় মনে করতে পারেনা। এই সব আন্দোলনের "আদর্শ" তাই ব্যক্তিগত স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, রেষারেষির দ্বারা নষ্ট হয়ে থাকে। গান্ধীজীর সবচেয়ে বড়ো অবদান অভীষ্টলাভের ক্ষেত্রে পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া। মানুষের মনুষ্যত্বের উপর আস্থা রেখে, তার মনুষ্যত্ব নষ্ট না করে, মনুষ্যত্বের উপযোগী করে কর্মপদ্ধতি স্থির করা, এইটিই তাঁর পথ।

মানুষের সব মূল্যবোধই অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত এই মূল জড়বাদী সিদ্ধান্ত শতকরা একশো ভাগ মেনে নিলে মানুষের স্বাধীনতা বা স্বাধীনসত্ত্বা অস্বীকার করতে হয়। বৈষয়িক পারিপার্শ্বিকতার উপর উঠতে পারার ক্ষমতার নামই স্বাধীনতা। কোনো একটি ঘটনা, পরিস্থিতি বা অবস্থা থেকে নিজেকে মনে মনে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ঐ অবস্থা বা পরিস্থিতিকে পৃথক ভাবে বিচার করতে পারি বলেই আমরা মানুষ। কেন বা কী করে পারি, কেন মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়েও অনিয়ন্ত্রিত, কোনো জড়বাদ দিয়ে এই পারিপার্শ্বিক থেকে উত্তরণের ব্যাপারটি খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কার্যকারণের পরম্পরায় আবদ্ধ হয়ে আমরা একটি বিশেষ কাজ করতে বাধ্য হতে পারি, কিন্তু যখন এই কাজ থেকে মনকে বিশ্লিষ্ট করে, পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ঐ কাজ বা পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ করি, তখন কোন্ কার্যকারণ দ্বারা আমরা নিযুক্ত বা বাধ্য হই? অবস্থাবিশেষ থেকে স্বেচ্ছায় দূরত্ব অর্জনের প্রক্রিয়াটি একটি আত্মিক প্রক্রিয়া; আমাদের বাস্তব পারিপার্শ্বিক ও পরিস্থিতির মধ্যে এমন কিছুই নেই যা আমাদের এই আত্মিক প্রক্রিয়ায় বাধ্য করতে পারে। এটি মানুষের এক অতিরিক্ত শক্তি।

আমরা যখন কোনো পরিস্থিতির নিস্পৃহ সমালোচনা বা বিচার বিশ্লেষণ করি তখন সেই মুহূর্তে ঐ পরিস্থিতির চেয়ে আমরা বড়ো হয়ে উঠি, প্রধান হয়ে উঠি, ঐ পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও পৃথক হয়ে যাই। মার্ক্সবাদ এই আত্মবোধের প্রাধান্যকে স্বীকার করেনা। অস্তিত্তিবাদ করে। আমাদের পরিস্থিতির আমরা শরিক একথা যেমন সত্য, আবার আমাদের পরিস্থিতি থেকে ব্যক্তি হিসাবে আমরা পৃথক একথাও তেমনি সত্য। আমাদের যৌথ সত্ত্বা যেমন সত্য, যূথভ্রষ্ট হবার সাধ্য ও প্রবণতাও তেমনি সত্য। অস্তিত্তিবাদ এই একাকীত্বের উপর চূড়ান্ত জোর দেয়। অস্তিত্তিবাদ অনুযায়ী, দল থেকে, সমাজ থেকে, সব কিছু থেকে পৃথক হবার ও পৃথক থাকার নামই স্বাধীনতা। মার্ক্সবাদীরা বলেন, এই বিচ্ছিন্নতার দিকে প্রবণতা একটি সামাজিক ব্যধি, সমাজের মধ্যে যা কিছু অনৈক্য, আগ্রাসন, তার মূলে এই ব্যাধি। কিন্তু একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা কিছু অগ্রগতি ঘটেছে তার মূলে রয়েছে মানুষের এই বিচ্ছিন্ন হবার, স্বাধীনভাবে দেখবার, ভাববার ও বুঝবার ক্ষমতা। নিষ্ক্রিয় বিচ্ছিন্নতার পক্ষে নয়, গান্ধীবাদ সক্রিয় বিচ্ছিন্নতার পক্ষে। বিচ্ছিন্নতার জন্য বিচ্ছিন্নতা গান্ধীআদর্শে একেবারেই নেই। সামাজিক কার্যের জন্যই বিচ্ছিন্নতা বা স্বাধীনতা বা মুক্তির প্রয়োজন। মুক্ত মানুষ স্বভাববিমুখ নয়। মানুষ যখন মুক্তি অর্জন করবে তখন সে স্বভাবকে বর্জন করবেনা, নুতন করে অর্জন করবে। ভালবাসা, প্রেম, সহানুভূতি, মহত্ত্ব, সামাজিকতা, এগুলিই মানুষের স্বভাব ; হিংসা, ঘৃণা, পীড়ন নয়। অস্তিত্তিবাদীর কাছে মুক্তি কোনো অর্জনের বস্তু নয়, মুক্তিই অস্তিত্বের স্বরূপ। গান্ধীবাদীর কাছে মুক্তি অর্জনীয়, প্রেম দিয়ে আমাদের প্রেমস্বরূপটিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অহিংসার মধ্য দিয়ে আমাদের মৌল অহিংস স্বরূপটিকে দৃঢ় করতে হবে।

সামাজিক কর্ম গান্ধীবাদীর কাছে মুক্তির ও মুক্তি অর্জনের

চাবিকাঠি। রাজনৈতিক প্রয়োজনে, শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থে বা পার্টির নির্দেশে, মুক্তি বন্ধক রেখে সামাজিক কর্ম করার প্রয়োজনীয়তার উপর মার্ক্সবাদী জোর দেবেন। য়ুটোপিয়ান চিন্তার বিপক্ষে মার্ক্সবাদী, তিনি বলবেন, য়ুটোপিয়ান চিন্তা নয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাই প্রয়োজন। কিন্তু য়ুটোপিয়ান চিন্তার অবাধ ক্ষমতাই প্রমাণ করে যে মানুষ মুক্ত। অনাগত দূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের গঠনমূলক চিন্তার ক্ষমতা যদি আত্মিক বা ভাববাদী প্রক্রিয়া হয় তাহলে এই ভাববাদ বর্জন করা মানে মানুষের স্বাধীনতা অস্বীকার করা। রাষ্ট্রবিহীন সাম্যবাদী সমাজের ধারণাও য়ুটোপিয়ান ধারণা, এবং ভাববাদী ধারণা ; কারণ তা বাস্তবের মধ্যে নিহিত নেই, তা একটি আদর্শ সম্ভাবনা মাত্র। মার্ক্সবাদী যখন বাস্তব প্রয়োগে পূর্ব-ঘোষিত আদর্শের কোনো পরিবর্তন ঘটান, আদর্শ থেকে চ্যুত হন, সংশোধনে বাধ্য হন, তখন এই পরিবর্তন, বিচ্যুতি বা সংশোধন প্রমাণ করে যে তার প্রারম্ভিক আদর্শটি, ঘোষিত রূপ তার যাই হোক না কেন, ছিল বাস্তবতা থেকে অনেক বিচ্ছিন্ন ও দূরান্ত, অনেক বেশী আদর্শবাদী অর্থাৎ ভাববাদী। ভাববাদী কথাটি "কাজের" মানুষদের কাছে নিন্দিত। মার্ক্সবাদী এক কথায় ভাববাদকে নস্যাৎ করেন। কিন্তু ভাববাদী মানেই ঈশ্বরবাদী বা অতীন্দ্রিয়তাবাদী নয়। আমরা এখানে যে-ভাববাদের কথা বলছি তা হচ্ছে একটি মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র ; এই প্রক্রিয়ার সংগে মানুষের মৌলিক সত্তা ও স্বভাব অংগাংগী জড়িত। যে প্রক্রিয়ায় বা সামর্থ্যে আমরা খণ্ড বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতার রূপ দিয়ে থাকি, কোলরিজ যাকে বলেছিলেন 'এসেমপ্লাসিস', যার ফলে আমরা কল্পনা করতে পারি, যাকে আমরা বলি অন্তর্দৃষ্টি, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের শিল্প, সংগীত, সৌন্দর্যবোধ বিকশিত, যা শুধু বাস্তবকে গ্রহণ, ধারণ, স্মরণ বা রূপায়নের ক্ষমতা নয়, বাস্তব থেকে উত্তীর্ণ হবার, মুক্ত হবার, বিচ্ছিন্ন হবার ক্ষমতা, এক কথায় ভাববাদী

প্রক্রিয়া ; এইটিই সৃজনী প্রক্রিয়া ; আর এই সৃজনশক্তির বলেই মানুষ নতুন সমাজ, নতুন সভ্যতা, নতুন শিল্প সৃষ্টি করতে পেরেছে। য়ুটোপিয়ান চিন্তা বা তার উপযোগী ভাববাদ বর্জন করে, কেবল বাস্তবনিষ্ঠ হয়ে আমরা তুষ্ট থাকতে পারিনা। মানবসত্তা সম্বন্ধে মৌলিক প্রশ্নগুলিকে ভাববাদ বলে উড়িয়ে দেওয়াও এক ধরণের সংকীর্ণতা। এখানে যে ভাববাদের কথা বলা হচ্ছে তা অতীন্দ্রিয়তাবাদ নয়, নিরীশ্বর জড়বাদের সংগেও তার বিরোধ নেই। মানুষের মৌল সত্তা কি, স্বরূপ কি, মানুষ কেন জন্মেছে, মানুষের এই দৃশ্যমান সামাজিক ও নৈসর্গিক পশ্চাৎপট কেন, এবং কেনই বা মানুষ তার মধ্যে একটি ভগ্নাংশ হওয়া সত্ত্বেও এমন আত্মসচেতন? এই চেতনা বা আত্মসচেতনতাই বা কি? এই ভাবনাচিন্তাগুলির উপর ভ্রুকুটি নিক্ষেপ করে কোনো লাভ নেই। এগুলিকে মনের সিন্দুকে বন্ধ রেখে মুখ বুজে রাষ্ট্র বা পার্টি-নির্দিষ্ট কর্ম করে যাও, একথা সেই রাষ্ট্র বা সেই পার্টিই বলবে যে মানুষের ব্যক্তিত্বকে পীড়ন ও দমন করেই শক্তিমান হতে চায়। এক হিসাবে সব রাষ্ট্রযন্ত্রই এরূপ সর্বশক্তিমত্তায় আগ্রহী। সব অনির্বাণ প্রশ্নের একটি মাত্রই সরকারী উত্তর থাকবে এবং শুধু সেইটিই গ্রাহ্য হবে, একথা স্বীকার করা কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই সম্ভব নয়। সরকারী উত্তরে তুষ্ট না হলে কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব মতামত ধ্যানধারণা আলোচনা করতে পারবে কিনা, এটি এ যুগের একটি জরুরী প্রশ্ন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিপক্ষে সংখ্যালঘুতমের মত কীভাবে দাঁড়াতে পারে, টি কে থাকতে পারে, এটি দেখা দরকার।

সংখ্যাগুরুর মত ও নির্দেশ শিরোধার্য করাই গণতান্ত্রিক রীতি। কিন্তু গান্ধীজী গণতন্ত্রের এই যান্ত্রিক সংখ্যাতত্ত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। অন্যান্য রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শনের সংগে তাঁর মতাদর্শের প্রভেদ এখানে। আত্মতন্ত্রকে বিসর্জন না দিয়ে যে গণতন্ত্র, গান্ধীজী সেই গণতন্ত্রই মানতেন। অর্থাৎ দৈনন্দিন সামাজিক কর্মক্ষেত্রে

অধিকাংশ ব্যাপারে তিনি সংখ্যাগুরুর মত মেনে চলার পক্ষপাতী। কারণ, তা না মানলে মিলে মিশে কাজ করা, সমাজে বাস করা, অসম্ভব। নিজের অহংকে খর্ব করে অধিকাংশের সংগে মিলেমিশে মানিয়ে চলার মধ্যেই সমাজ টিঁকে থাকতে পারে। স্বেচ্ছাচার বা একতন্ত্র গান্ধীজী কখনো গ্রহণীয় মনে করতেন না। নিজের মুক্তি ও স্বাধীনতাকে তিনি যেমন মূল্যবান জ্ঞান করতেন, তেমনি অপরের মুক্তি ও স্বাধীনতার মর্যাদা দেওয়াও তিনি কর্তব্য বলে মানতেন। যুক্তি দিয়ে কাউকে স্বমতে না আনতে পারলে জোর করে তাকে নিজের মত গ্রহণে বাধ্য করাকে তিনি ঘৃণা করতেন। এমন কি প্রাচীনতম ধর্মগুরুকেও যদি যুক্তিবিরোধী মনে হয় তবে তিনি অনায়াসেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে যদি সমাজে বাস করতে হয় এবং নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হয়, তাহলে চরম স্বাধীনতার ক্ষেত্রগুলি স্বেচ্ছায় সংকুচিত করতে হবেই।

একেবারে চরম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি বাদে ব্যক্তির মতামত সমষ্টির মতামতের কাছে, সংখ্যাগুরুর মতামতের কাছে, নত রাখতেই হবে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। কারণ সর্বক্ষেত্রে মতামত বিসর্জন দিতে বাধ্য হওয়া মানেই নিজের স্বাধীনতা হারানো, সংখ্যাগুরুর দাসে পরিণত হওয়া। নিজের ব্যক্তিগত ধর্মমত, বিশ্বাস বা ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে, ব্যক্তি কারো কাছে নত হবেনা। এখানে গণতন্ত্রের উপরে আত্মতন্ত্র। আধুনিক গণতন্ত্রে এই আত্মতন্ত্রের কথা একেবারেই অস্বীকৃত, তাই গণতন্ত্রীরা যেন তেন প্রকারে সংখ্যাগুরুত্ব অর্জনেই ব্যস্ত ; কারণ গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরুত্বই সব শক্তির উৎস, আর সংখ্যা-লঘুরা হরিজন। সংখ্যাগুরুতন্ত্র যাতে ব্যক্তিত্ববিনাশী এক রাজনৈতিক কুসংস্কারে পরিণত না হয়, সেবিষয়ে গান্ধীজী ছাড়া অন্য কাউকে এত বেশী সজাগ দেখিনা। দৈনন্দিন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই গণতন্ত্র মানতে হবে ; তার কারণ এটুকু না মানলে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক

ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে না এবং ব্যক্তি স্বাধীন হতে পারবেনা। কিন্তু ব্যক্তির জন্যই ব্যষ্টি, ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যই গণতন্ত্র, একথা কিছুতেই ভোলা যায়না। পরস্পরের প্রতি আমাদের অবশ্যই সহনশীল হতে হবে। সব মানুষ কখনোই এক সংগে একই রকম চিন্তা করবেনা, করতে পারেনা; এমনকি একই সত্য একই ভাবে সব মানুষের কাছে যুগপৎ উদ্ভাসিত হবেনা; প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি দৃষ্টিকোণ আছে, প্রত্যেকেই সত্যের একটি বিশেষ ভগ্নাংশমাত্র দেখতে পায়, কাজেই প্রত্যেকের উপর কোনো একটি মানুষের বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা একটিমাত্র সত্যাংশ চাপিয়ে দেওয়া প্রত্যেকের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়; বিরোধী পক্ষের প্রতি শিষ্টাচার এবং তাদের দৃষ্টিকোণটি বুঝতে চেষ্টা করা অহিংসার অ, আ, ক, খ।

পার্টি বা দলভিত্তিক রাজনীতিতে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় বিচারের দায়িত্ব ব্যক্তির কাছ থেকে চেয়ে বা কেড়ে নিয়ে দলের নেতৃত্বের হাতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ রণনীতির কৌশলে সত্য মিথ্যার বিচার করা হয়। ন্যায়নীতির এই দলীয় ব্যাখ্যা সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা ছাড়া আর কী? পার্টি-গণতন্ত্রে যখন মতপার্থক্য দেখা দেয় তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি কাদা ছুঁড়তে থাকে, উদ্দেশ্য আরোপ করতে থাকে, এবং গালিগালাজ আরম্ভ করে দেয়। যদি ধরেও নেওয়া যায়, এক পক্ষ ঠিক এবং আরেক পক্ষ ভ্রান্ত, তবু মানতে হবে ভুল করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে, এবং মানুষ মাত্রেই ভুল করে। কিন্তু ভুল এবং অন্যায় এক কথা নয়। সব ভুলই উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। কিন্তু দলীয় রাজনীতিতে দেখি, দলের মধ্যে আবার নানা উপদল সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো একই আদর্শে স্থাপিত একটি পার্টি ভেঙে একাধিক পার্টি বা উপদলের সৃষ্টি হয়। কেন' তা হয়, তা আমাদের বুঝতে হবে। মতের পার্থক্য যেখানে নেই সেখানেও পথের পার্থক্য থাকতে পারে; লক্ষ্যের পার্থক্য যেখানে নেই সেখানেও লক্ষ্যে

পৌঁছাবার উপায় নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। কোনো একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক মতবাদকে আমরা যখন একমাত্র "বৈজ্ঞানিক মতবাদ" বলে দাবী করি তখনই ভ্রান্তি শুরু হয়। আজকাল "বৈজ্ঞানিক" কথাটিই আমরা সবচেয়ে বেশি অবৈজ্ঞানিক এবং অসংগত ভাবে ব্যবহার করছি। কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদই মানুষের আচরণ বা প্রতিক্রিয়া নিরপেক্ষ নয়, পদার্থ বা রসায়ণ শাস্ত্রের নিয়মের মতো তা অপরিবর্তনীয় নয়, নৈর্ব্যক্তিক নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন একটি জিনিষ আছে যা অনির্দেশ্য এবং গণনাতীত; কাজেই সাধারণ ভাবে মানুষের বিভিন্ন ঝোঁক সম্বন্ধে আমরা সিদ্ধান্ত করলেও, কোনো মানুষের আচরণই আমরা সম্পূর্ণ ভাবে পূর্বনির্দিষ্ট ধরে নিতে পারিনা। এই অনির্দেশ্যতা, অনিশ্চয়তা আছে বলেই মানুষ এখনো রবট না হয়ে স্বাধীন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একাধিক বিকল্প খোলা থাকে, এই একাধিক সম্ভাবনাই মানুষের মুক্তির চিহ্ন।

ক্ষমতার রাজনীতি বা "পাওয়ার পলিটিকস" আধুনিক সভ্যতা ও সমাজের একটি প্রধান সমস্যা। এই রাজনীতির প্রথম কথা হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখল করা। এর ফলে সমাজের বা ব্যক্তির নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। সর্বজনগ্রাহ্য কোনো আচরণ-বিধি না গড়ে তুলতে পারলে এই অস্থিরতার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যর্থতাবোধ থেকে সর্বপ্রকার আগ্রাসী মনোভাব ও আগ্রাসী আচরণের উদ্ভব। এই ব্যর্থতাবোধ থেকে, ব্যর্থতা বোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যুদ্ধ ও বেপরোয়া আচরণের জন্ম। সমাজ বিপ্লবের নাম করে বা ডারুইন-উক্ত অভিব্যক্তিবাদের নাম করে যা কিছু "প্রগতি"র পক্ষে তাই ন্যায্য, এই মতবাদ রাজনৈতিক মহলে খুব বেশি প্রচলিত। এই ভাবে ইতিহাসকে নীতিশাস্ত্রের স্থানে বসানো হচ্ছে।• "ইতিহাস আমাদের পক্ষে", "ইতিহাসের অমোঘ বিধানে", ইত্যাদি সর্বাত্মক স্লোগান প্রায়ই শুনতে পাই। এই ইতিহাস-পূজার চরম পরিণতি আমরা উগ্র নাৎসীবাদে দেখেছি।

ইতিহাসের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও যে ভাববাদী, এবং এই ব্যাখ্যাতেও মতের অনৈক্য থাকা সম্ভব,সেকথা সুবিধা অনুযায়ী আমরা ভুলে থাকি। রাষ্ট্রই সব নীতি বা মর‍্যালিটির বিধাতা, রাষ্ট্রনীতিই আমাদের ব্যক্তিগত নীতির নিয়ামক, রাষ্ট্রের আইন বা নিয়মই হচ্ছে নাগরিকের একমাত্র আচরণীয় নীতি; এই ঝোঁকটি সমাজতন্ত্রী দেশে খুব বেশি প্রচলিত হচ্ছে। কি জাতীয়তাবাদ, কি আন্তর্জাতীয়তাবাদ উভয় ক্ষেত্রেই ইতিহাসের একটি সুপরিকল্পিত ভাবরূপকে নীতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে দেখা যায়; ব্যক্তির বিবেক ও বিচার-বোধ, ন্যায় অন্যায়ের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে বিচ্যুতি বলে ধরে নেওয়া হয়; "বুর্জোয়া" সংস্কার বলে এর বিরুদ্ধে অভিযানও চালানো হয়। রাষ্ট্র শুধু শাসক নয়, শিক্ষকের আসনটিও পুরোপুরি দখলে রাখতে প্রয়াসী। শুধু রুটির নয়, রুচিরও নিয়ামক হতে চায়। গ্রীক সমাজে ও সভ্যতায় কোনো অতীন্দ্রিয় আদর্শের উপর নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি, হয়েছিল স্বাভাবিক নিয়মের উপর; দৈহিক বা মানসিক উৎকর্ষের ভিত্তিভূমি ছিল সুষমতা বা হার্মনি; এ হার্মনি ছিল তাদের সৌন্দর্যতত্ত্বের ভিত্তিভূমি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে, দেহমনে, প্রকৃতির অনুসরণ করে হার্মনি ও ছন্দ প্রতিষ্ঠাই ছিল জীবন নীতি। যে মানুষের জীবনে এই সুষমতার প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার আচরণ ও কাজে একটি সৌন্দর্য ফুটে ওঠে এবং তিনিই মহদাশয় বা মহাত্মা হন। সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি ছিল গ্রীক শিক্ষার আবশ্যিক অংগ; কারণ দেহের ও মনের উৎকর্ষ ঘটতো এই সুষমার চর্চায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচরণের মধ্যে সুষমতা ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করার কাজটি এখন অবহেলিত। কিন্তু ধীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে, সুষমাহীন কাজ বা আচরণের চেয়ে যে কাজ বা আচরণের মধ্যে সুষমা আছে তা অনেক বেশি কার্যকর, এবং তা মানুষকে অনেক বেশি সুখী করে। এটি স্বভাবের নিয়মেই ঘটে। আমাদের আবেগের প্রকাশ যখন

সুষম ও সুন্দর হয়, চিত্তবৃত্তির উপর যখন আমাদের কর্তৃত্ব প্রতি| হয়, আবেগের প্রকাশ যখন নিয়মিত হয়, তখনই আমরা স্বাভাবিক ভাবে ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারি, তখন সেই ন্যায়বোধই জীবনে সুখ শান্তির আধার হয়ে ওঠে। চরম ধনবৈষম্য বা শ্রেণী বৈষম্য নিশ্চয়ই সমাজের সুষমতাকে নষ্ট করে এবং তা দূর করাই সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির পথ। সংগে সংগে আমাদের দেখতে হবে, অত্যুগ্র আবেগের প্রশ্রয় না নিয়ে এই বৈষম্য দূর করার কোনো পথ আছে কি না বা বৈষম্য দূর করার পরও সুষমা প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে কিনা।

ক্ষমতার নীতিটি ভালভাবে বোঝা দরকার। ক্ষমতার ব্যবহার বা অপব্যবহার করা হচ্ছে, প্রায়ই আমরা বলে থাকি। বিশপ ক্রেটন "পোপতন্ত্রের ইতিহাস" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং ক্রেটন-সম্পাদিত একটি পত্রিকায় বইটি সমালোচনা করেন লর্ড অ্যাকটন। তাঁর মতে এই বইতে বিশপ ক্রেটন অতীতের পোপ ও সম্রাটদের কার্যাবলীর সঠিক সমালোচনা করতে ব্যর্থতা দেখিয়েছেন ; উচ্চ পদ ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিতদের কার্যাবলীর ন্যায্যতা ও অন্যায্যতা দেখানো ঐতিহাসিকদের কর্তব্য। কিন্তু বিশপ ক্রেটন সম্রাট ও পোপদের সমর্থনে অনৈতিহাসিকসুলভ ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন। পরে ক্রেটনকে লেখা একটি চিঠিতে অ্যাকটন আরো স্পষ্ট করে বলেন :

"I cannot accept your canon that we are to judge Pope and King unlike other men, with a favourable presumption that they did no wrong. If there is any presumption it is the other way, against the holders of power, increasing as the power increases. Historic responsibility has to make up for the want of legal responsibility. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men aie almost

always bad men, even when they exercise influence and not authority, still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority. There is no worse heresy than that the office sanctifies the holder of it."

অর্থাত :

"আমি আপনার এই নীতিটি মেনে নিতে পারিনা যে অন্য মানুষদের যে ভাবে বিচার করি তা থেকে পৃথক ভাবে আমরা পোপ ও সম্রাটকে বিচার কোরবো। যেমন আপনি তাদের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য ধরেই নিয়েছেন যে পোপ বা সম্রাটগণ কখনো কোনো অন্যায় করেননি। যদি কোনো মতামত পোষণ করতেই হয় তবে এর উল্টোটাই ধরে নিতে হবে, ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত তাদের বিরুদ্ধেই ধারণা করে নিতে হবে; যার ক্ষমতা যতো বেশি তার প্রতি ততো বিরূপ ধারণা করতে হবে। আইনগত দায়িত্ব তাদের বেলায় কিছুই প্রয়োগ করা যায় না বলেই এই অভাবটি ইতিহাসগত দায়িত্ব প্রয়োগ করে পূরণ করতে হবে। ক্ষমতার স্বভাবই হচ্ছে দুর্নীতি সৃষ্টি করা এবং চরম ক্ষমতা সৃষ্টি করে চরম দুর্নীতি। দেখা যায় উচ্চপদাধিকারীরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অসৎ, যখন তারা ক্ষমতা না খাটিয়ে কেবলমাত্র তাদের প্রভাব খাটান তখনও, এবং আরো বেশি যখন ক্ষমতা বা পদাধিকার থেকে সঞ্জাত দুর্নীতির সম্ভাব্যতা বা অবশ্যম্ভাবিতা এর সংগে যুক্ত করি। এর চেয়ে বড়ো মিথ্যা হতে পারেনা যে পদাধিকার পদাধিকারীকে মহত্ব দেয়।"

পদাধিকার পদাধিকারীকে মহত্ব দেয় (The office sanctifies the holder of it) এর চেয়ে বড় মিথ্যা উক্তি হয় না। কথাটা ভাববার মতো। কারণ বিবেক, ন্যায় ও নীতির বিচার বিসর্জন দিলে বিচারের মাপকাঠি এমনই ঠুনকো হয়ে পড়ে যে আমরা ইচ্ছা ও সুবিধা মতো সব কাজেরই একটি সমর্থন যোগাড় করতে পারি।

ঐতিহাসিক বা পরিস্থিতিগত ব্যাখ্যা নীতিগত বিচারের বিকল্প হয়ে ওঠে। অমুক পরিস্থিতিতে এ ছাড়া উপায় নেই, অমুক ঐতিহাসিক অবস্থায় এটিই স্বীকার্য, এরকম কথা বলা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির বিচার কে করবে? প্রত্যেকেরই কি তা করার অধিকার নেই? আগে ছিল, 'দ কিং ক্যান ডু নো রং' রাজা কখনো অন্যায় করেন না: এখন হয়েছে, প্রেসিডেণ্ট বা প্রধানমন্ত্রী কোনো অন্যায় করেন না। তার চেয়েও বেশি, পার্টি অর্থাৎ পার্টি নেতৃত্ব কখনো অন্যায় করে না। পার্টি ভুল করে, কিন্তু অন্যায় করে না। অর্থাত রাজনৈতিক কর্মধারায় কোনো অন্যায় নেই, আছে শুধু ভুল বা নির্ভুল, সঠিক বা বেঠিক পদ্ধতি; যেমন যুদ্ধে 'আনফেয়ার' বা অন্যায় বলে কিছু নেই, তেমনি রাজনীতিতে যা ফলপ্রদ, যা সাফল্য এনে দেয়, তাই সঠিক, অতএব তাই ভালো। রাজনৈতিক সাফল্য মানে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা বা অধিকার অর্জন। অথচ মজা এই যে প্রত্যেক রাজনৈতিক পার্টি বা প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেক রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে নৈতিক স্লোগান জুড়ে দেয়; ন্যায়ের জন্য, নীতির জন্যই সংগ্রাম, লোককে এটি বুঝানো হয়। নীতি মানি না, নীতি মানি—এই স্ব-বিরোধ আধুনিক রাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ লক্ষণ। পার্টি বললেই তা ঠিক, নেতা বললেই তা ঠিক—এরই বিরুদ্ধে মানুষ জেহাদ ঘোষণা করে ধাপে ধাপে তার স্বাধিকার অর্জন করেছিল; কিন্তু এখন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক যন্ত্রটি জটিল বিপুলায়তন হয়ে ওঠায় সেই অধিকার মানুষ আবার হারাতে বসেছে। আধুনিক যুগের এটি এক বিশেষ সমস্যা। জনতার হাতে ক্ষমতা আসার আগেই ক্ষমতা জনতার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। জনতার নাম করে ক্ষমতা মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত হচ্ছে। এবং মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনরা নতুন মোহ সৃষ্টি করছেন, যার অর্থ কিন্তু সেই চিরন্তন বা পুরোনো ভাঁওতা—The office sanctifies the holder of it; নিজের দল বা নেতা বললে তা ঠিক, বিরোধী দল বা নেতা বললেই তা বেঠিক, এই হচ্ছে সহজ ন্যায়বিচার। স্বাধীন বুদ্ধিজীবীর স্থান

তাই ক্রমশই সংকুচিত; কারণ সব কেন্দ্রিত শক্তিই ক্ষমতামদে মত্ত; সমাজব্যবস্থা যতো জটিল হচ্ছে, কেন্দ্র-শক্তি ততোই দুর্বার ও ও বিরাট হয়ে উঠছে; কেন্দ্রিত শক্তির অসহিষ্ণুতা ততোই বাড়ছে। আমেরিকার মতো বৃহদায়তন জটিল রাষ্ট্রে তাই যুবশক্তির বিদ্রোহ ঘটছে নানাভাবে। কখনো সিভিল রাইটস, কখনো আবার নব্য বাউলপন্থী হিপপি আন্দোলন।

শাসনক্ষমতাই যদি দুর্নীতির জনক ও পোষক হয়, তাহলে শাসন ক্ষমতার উপর অধিকার মানুষের নৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় হিসাবে মনে করাটাই ভুল। শাসনক্ষমতা জিনিষটা স্বভাবতই খারাপ বা অসৎ; যার হাতেই থাকুক না কেন শাসনক্ষমতার স্বভাবই হচ্ছে আকাংখা এবং আরো আকাংখার সৃষ্টি করা। ক্ষমতা আরো-ক্ষমতা পেতে চাইবেই, এবং ক্ষমতা শুধু ক্ষমতাসীনকে নয় অন্য সবাইকেও ক্রমশ অসুখী করে তুলবে। ক্ষমতা জিনিষটাই খারাপ, চিরকালই খারাপ, ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে, সর্বদা এবং সর্বতোভাবে। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। মানুষের মনোভাবের মধ্যে যে আদিম আগ্রাসী বৃত্তি বর্তমান তা থেকেই ক্ষমতার এই চিরন্তন স্বরূপটি বেরিয়ে আসে। অমুককে ক্ষমতা দাও, অমুক দলকে ক্ষমতায় বসাও তাহলেই সব দুর্নীতি দূর হবে, এভাবে চিন্তা করাটাই ভুল; অমুক যুক্তি ভালো বা অমুক দলের আদর্শ ভালো হতে পারে; কিন্তু ক্ষমতার সংগে যুক্ত হওয়া মাত্র অমুক ব্যক্তি বা অমুক দলের চরিত্র পরিবর্তিত হবেই। ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্তত তাই।

গান্ধীজী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবর্তক নন, সমাপকও নন। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ও শেষ অংকে আমরা তাঁকে পাই না। প্রথম অংকে তিনি অনাগত, শেষ অংকে স্বেচ্ছায় অনুপস্থিত। এই আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত অন্য অনেক নেতা ও শহীদের অনেক অবদান আছে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন, কষ্ট বরণ করেছেন এবং

নেতৃত্ব দিয়েছেন ; আমরা তাদের প্রত্যেকের কাছে ঋণী। কিন্তু গান্ধীর মতো করে আর কেউই এই আন্দোলনকে দেখেননি, দেখতে চাননি। গান্ধীজী এই আন্দোলনকে যেমন চড়াসুরে বাঁধতে চেয়েছিলেন, যেমন বড়ো আদর্শের সংগে যুক্ত ও একাত্ম করতে চেষ্টা করেছিলেন তেমনটি অন্য কেউ করেননি। পৃথিবীতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম অনেক হয়েছে, কিন্তু মুক্তির আদর্শ গান্ধীজীর "হিন্দ স্বরাজ"-এর মতো করে আর কেউ কল্পনা করেন নি। রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা, কার্যক্রম ও লক্ষ্য সব দেশে ও সব যুগে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে, তা কখনো নৈতিক আন্দোলনে রূপায়িত হয়নি। বরং দেখা যায়, ধর্মীয় বা নৈতিক আন্দোলনই কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত হয়েছে বা রাজনৈতিক সংগ্রামকে পুষ্ট করেছে, অর্থাৎ রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে উপলক্ষ্যের ভূমিকা নিয়েছে নীতি বা নীতিবোধ। নীতির বিচার ব্যক্তিগত ; কিন্তু এই বিচারকে সমষ্টির ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী।

গান্ধীজী বা গান্ধীআদর্শের ব্যর্থতার কথা একেবারেই ওঠেনা। জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী যে বৃহত্তর আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তার পরীক্ষা নিরীক্ষার অনেক বাকি ; সমাপ্তি দূরের কথা, তার প্রাথমিক পর্বই এখনো সম্পন্ন হয়নি। তাঁর স্বরাজ সাধনা শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা বা ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য। তাঁর আশা ছিল এই অভিনব পরীক্ষায় ভারতই পৃথিবীকে পথ দেখাবে, যেমন কার্ল মার্ক্স মনে করতেন জার্মানী ও ফ্রান্সেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবে, এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সারা বিশ্বের "স্বরাজ সাধনা"য় অগ্রগামী ভূমিকা নেবে। তাঁর আশা ছিল, পরাধীন দেশে এক্সপেরিমেণ্ট ফলপ্রসূ হলে, অন্য স্বাধীন দেশেও সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োগ চলতে পারবে। "সভ্যতা"র

জটিলতা নিত্যনূতন সংঘাত সৃষ্টি করবে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে অসংখ্য সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের ঘটনা ঘটবে, এবং তখন ভবিষ্যতের সত্যাগ্রহীরা যদি সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন তবে তাই হবে সারা বিশ্বে মানব কল্যাণের নূতন পথ। ভারতবর্ষে যে এই এক্সপেরিমেণ্ট যথেষ্ট হয়েছে বা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে, তা মোটেই বলা যায়না। তবে ভারতবর্ষে এই এক্সপেরিমেণ্ট ব্যাপক আকারে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করেছেন গান্ধীজী। গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ সার্থক বা সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনে করাই ভুল। গান্ধীজী এবং গান্ধীজী একাই আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার যুদ্ধ জিতেছেন একথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ। আবার গান্ধীজীর "স্বরাজ" সাধনায় শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকটতম অনুবর্তীরাও সত্য ও অহিংসার পথ থেকে বহুদূরে চলে গেছেন, ফলে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন, এমন মনে করাও ভুল। গান্ধীজীর নেতৃত্বকে একটি বিরাট এক্সপেরিমেণ্টের প্রাথমিক পর্বের বেশি কিছু বলার সময় এখনো আসেনি। বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেণ্ট যেমন কোনো বিশেষ ল্যাবরেটরিতে সফল হলে অন্য ল্যাবরেটরিতেও তা যাচাই করে দেখা যায় তেমনি সত্যাগ্রহ যদি এক দেশে সফল হয় তবে অনুরূপ পরিস্থিতিতে অন্য দেশেও তা অনুরূপ ভাবে সফল হতে পারে। "সফল" কথাটি অবশ্য এখানে খুব সাবধানে ব্যবহার্য। সাফল্যের অনেক স্তরভেদ আছে। নানা দেশে এবং নানা কালে এর অর্থভেদও ঘটে থাকে। অভিনব এক এক্সপেরিমেণ্ট গান্ধীজী সবে শুরু করেছিলেন, কিন্তু নিজে খুব বেশি দূর এগোতে পারেননি। কাজেই এর সার্থকতা ও ব্যর্থতার প্রশ্ন তখনই উঠবে যখন আরো অনেকে অনেক রকমভাবে এই এক্সপেরিমেণ্ট আরো অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

যখন তরুণেরা এই এক্সপেরিমেণ্টে এগিয়ে আসবেন তখনই প্রকৃতপক্ষে "সত্যাগ্রহে"র অসীম শক্তির প্রমাণ মিলবে, অহিংসা-শক্তির পরমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটবে। তরুণ সন্ন্যাসীরা যখন ধর্মের জন্য জীবন দিয়েছেন তখনই ধর্ম মনুষ্যসমাজে বিস্তৃত হয়েছে,

মনুষ্যসমাজকে প্রভাবিত করেছে। প্রচারক হিসাবে বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য, বিবেকানন্দ সকলেই তরুণ ছিলেন। গান্ধীজী তরুণ বয়সেই সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এবং এঁরা সকলেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রাণের তারুণ্য বজায় রেখেছিলেন। আদর্শবাদ তারুণ্যের প্রাণধর্ম। গান্ধীবাদ সবচেয়ে দুর্মর, দুরূহ আদর্শবাদ, এই আদর্শবাদে সার্থক ভাবে উদ্বুদ্ধ হতে পারে একমাত্র তরুণরাই। অবিচার, অত্যাচার, পীড়ন, শোষণের বিরুদ্ধে একমাত্র তরুণরাই নিঃস্বার্থ আদর্শবাদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। নিছক ভাবাবেগে যদি তাদের বুদ্ধি ও বিচার আচ্ছন্ন না হয় তাহলে তরুণরাই আগামী দিনের পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো সত্যাগ্রহীর ভূমিকা নিতে পারবে। কোনো তন্ত্রমন্ত্রই মানুষকে মুক্ত করতে পারেনি; গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রও এখন পর্যন্ত অপারগ; মানুষের মৌলিক মর্যাদার, স্বাধীনতার, অধিকার বিনা সংগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে, এমন সম্ভাবনা কোথাও দেখা যায় না। পুরোনো তন্ত্রমন্ত্রের বদলে নিত্য নূতন তন্ত্র ও মন্ত্র, ইজ্‌ম ও আপ্তবাক্য প্রচারিত হচ্ছে, কিন্তু মানুষের মুক্তি, জনতার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা, এগুলি পশ্চাতেই থেকে যাচ্ছে। গান্ধীজী শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বা ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা আদায়ের কথাই ভাবেননি, তিনি মনুষ্যসমাজের এই জরুরী সমস্যার পূর্ণ রূপটি দেখেছিলেন।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলেছিলেন, আমাদের শিক্ষা কোনো গোঁড়া মতবাদ নয়, 'গাইড' বা কাজের সহায়িকা বা নির্দেশিকা মাত্র! মার্ক্স ভাববাদ, য়ুটোপিয়াবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে অসংখ্য লেখা লিখেছেন। বাস্তব অবস্থা থেকেই তাঁর সব শিক্ষা উদ্ভূত এই ছিল তাঁর বক্তব্য। গান্ধীও এর বেশি কিছু বলেননি, নিজেকে একজন বাস্তববাদী বা 'রিয়্যালিস্ট' বলেই বারংবার অভিহিত করেছেন। তিনি যেন প্র্যাকটিক্যাল নেতা ছাড়া আর কিছু নন। মার্ক্স ও গান্ধীর মতো আদর্শ-বাদী বাস্তববাদীদের বেলায় দেখা যায় তাঁরা সুদূর ও

সু-উচ্চ আদর্শকেও সুদূর বা সু-উচ্চ বলে মনে করেন না; এমন ভাবে সে সম্বন্ধে কথা বলেন যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে, একটু চেষ্টাতেই, অবশ্যম্ভাবী রূপে উচ্চ আদর্শটি বাস্তবে পরিণত হবে। গান্ধীর সর্বোদয় সমাজ এমনি একটি শ্রেণীহীন, শোষণহীন, হিংসাহীন, রাষ্ট্রহীন, সম-সমাজের স্বপ্ন। মার্ক্সের "গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনা" ('ক্রিটিক অব দ গোথা প্রোগ্রাম') গ্রন্থে বর্ণিত শ্রেণীহীন সমাজও এমনি একটি শোষণহীন, হিংসাহীন, রাষ্ট্রহীন, সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন। অথচ লেনিন বলেছেন: "There is no trace of an attempt on Marx's part to make up a utopia, to indulge in idle guess-work abour what cannot be known. Marx treated the question of communism in the same way as a naturalist would treat the question of the development of, say, a new biologicai variety, once he knew that it had originated in such and such a way and was changing in such and such a definite direction" (V. I. Lenin, *Collected Works*, vol. 25).

অর্থাত :—

"যে বিষয় জ্ঞানের বাইরে সে সম্বন্ধে মার্ক্স কখনোই য়ুটোপিয়া সৃষ্টির বা অলস অনুমান বা জল্পনার সামান্যতম চেষ্টাও করেননি। যেমন একজন বৈজ্ঞানিক বা প্রকৃতিবিদ নতুন একটি জৈব সত্তার বিকাশ কীভাবে ঘটবে সে প্রশ্ন বিচার করেন, প্রথমে এই সত্তাটির উৎপত্তি কী কী উপায়ে হল এবং কোন্ কোন্ সুনির্দিষ্ট দিকে তার পরিবর্তন ঘটছে তার হিসাব করেন, ঠিক তেমনি ভাবে কম্যুনিজমের প্রশ্নটিরও মার্ক্স বিচার করেছিলেন।…

শ্রেণী সংগ্রাম থেকে সাম্যবাদী সমাজের ধারণা মার্ক্স যেমন ভাবে করেছিলেন, ঠিক এমনি ভাবেই সত্যাগ্রহ থেকে সর্বোদয় সমাজের

ধারণা করেছিলেন গান্ধী। তাঁরা নিজেরা বা তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা যাই বলুন না কেন, মার্ক্স ও গান্ধী এ বিষয়ে উভয়েই ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা, আত্মপ্রত্যয়ী, আশাবাদী স্বপ্নদ্রস্টা। স্বপ্নকে তাঁরা শুধু স্বপ্ন বলে জ্ঞান করেননি, সুদূরকে তাঁরা সুদূর বলে মানেন নি। কম্যুনিজম অবশ্যম্ভাবী, এবং সত্যের (truth force) জয় অবশ্যম্ভাবী, মার্ক্স ও গান্ধীর এই দুই উক্তিই আশাবাদী উক্তি; লক্ষ্যকে তাঁরা সম্ভাবনা বা সম্ভব নয়, একেবারে অবশ্যম্ভাবী বলে বর্ণনা করেছেন। উভয়ের আদর্শ সমাজই ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়েই মনুষ্যত্বের উপর চরম আস্থাশীল। অথচ উভয়েই বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিকূল রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে হাতে কলমে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন, কার্যক্ষেত্রে তাঁরা উভয়েই কঠোর বাস্তববাদী; কিন্তু উভয়েরই চোখে একটি স্বপ্নের ধ্রুবতারা। মার্ক্স লিখছেন: "In the higher phase of communist society, after the enslaving subordination of the individual to the division of labour and with it also the antithesis between mental and physical labour, has vanished, after labour has become not only a livelihood but life's prime want, after the productive forces have also increased with the all-round development of the individual, and all the springs of cooperative wealth flow more abundantly—only then can the narrow horizon of bourgeois right be crossed in its entirety and society inscribe in its banners :....each according to his ability, to each according to his needs! (K. Marx and F. Engels, *Selected Works*, vol II, Moscow, 1962).

অর্থাত: "কম্যুনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে, ব্যক্তি যখন শ্রমবিভাগের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে এবং সেই সংগে মানসিক ও

কায়িক শ্রমের বিরোধ ও বিভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে, যখন শ্রম শুধু জীবিকা নয় জীবনের প্রধান প্রয়োজনে পরিণত হবে, যখন ব্যক্তির সর্বাংগীন উন্নতির সংগে সংগে উৎপাদন শক্তিগুলিরও বৃদ্ধি ঘটবে এবং সমবায় ভিত্তিক ধনের সবগুলি উৎস আরো প্রচুর পরিমাণে বইতে শুরু করবে—শুধু তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্ত সম্পূর্ণ অতিক্রম করা সম্ভব হবে এবং সমাজের পতাকায় লেখা হবে : প্রত্যেকের সাধ্য অনুযায়ী কাজ এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্য !”

দেখা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের আশুলক্ষ্যে পৌঁছানর কথাই শুধু ভাবেননি, মার্ক্স পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের স্বপ্নও যথেষ্ঠ আবেগের সংগেই দেখেছেন। এই উচ্চতর পর্যায়ের স্বপ্নটি গান্ধীর স্বপ্নের খুব কাছাকাছি। গান্ধী ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির কথাই শুধু ভাবেন নি, “হিন্দ্ স্বরাজ”-এ পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ের স্বাধীনতা বা স্বরাজের স্বপ্নও দেখেছেন। মার্ক্স সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেই তুষ্ট। ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে আনলেই হাতে স্বর্গ পাওয়া যাবে ধরে নিয়েছেন, যেন তারপর আর শ্রেণী বা পীড়ন থাকতে পারেনা। গান্ধী তা মনে করেননি। ক্ষমতার প্রশ্নটিকে তিনি আরো গভীর ভাবে বিচার করেছেন। ধনবণ্টনই সব নয়, ধনবণ্টনে যে সাম্য আসে তা অকিঞ্চিৎকর সাম্য। ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নটিই আসল। প্রভু ও দাস একই আসনে একই খাদ্য গ্রহণ করলেও, এই আপাত সাম্য সত্বেও, প্রভুত্ব ও দাসত্ব থেকেই যায়। মার্ক্স ও লেনিন যে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি সৃষ্টি করেছিলেন তাতে জনগণের সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছিল পার্টির হাতে। তাঁরা ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাত থেকে কেড়ে শ্রমিক সাধারণের হাতে তুলে দেননি, তুলে দিয়েছিলেন শ্রমিকের পার্টির হাতে ; এক হিসাবে তাঁরা বুর্জোয়া এবং শ্রমিক সাধারণ উভয়ের হাত থেকেই ক্ষমতা কেড়ে পার্টির হাতে সর্বময় ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন। লর্ড অ্যাকটন-এর সুবিখ্যাত উক্তিটি এখানে স্মরণ না করে উপায় নেই : ক্ষমতা দুর্নীতির জন্ম দেয়। পুঞ্জীভূত

ক্ষমতা পুঞ্জীভূত দুর্নীতির সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক। শ্রমিক শ্রেণীর নামে বা কোনো মহৎ আদর্শের নামে উৎসকৃগাত হলেই যে ক্ষমতা নিষ্কলুষ হবে তা মনে করা অনৈতিহাসিক।

১৯১৭ সালের পর ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নটি গৌন হয়ে না গিয়ে বরং আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে সাম্যবাদী দর্শন নীরব, তাদের ধারণা সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এটিও এক ধরণের নূতন ভাগ্যবাদ। ক্ষমতাসীন পার্টি ও ক্ষমতাহীন জনগণ—এই নব্য শ্রেণী বিভাগের সম্ভাবনার কথা সেখানে অস্বীকৃত। মার্ক্স যেন ধরেই নিয়েছেন শ্রেণী লুপ্ত হলেই ক্ষমতার প্রশ্ন আর থাকবেনা, যেন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব একটি বিশেষ সামাজিক বিন্যাসের ফল, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এর জন্য দায়ী নয়। গান্ধীও মানুষের সহজাত শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রেখেছেন, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির সবটুকুই তিনি সামাজিক বিন্যাসের কাঁধে চাপিয়ে দেননি। অসাম্য দূর করার কাজটি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বদলেরই কাজ, এক শ্রেণীর কাছ থেকে আর এক শ্রেণীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ, গান্ধী তা মেনে নেননি। ইজ্‌ম বা তন্ত্রবিশেষের জন্য ব্যক্তি, না ব্যক্তির জন্যই যতো তন্ত্র ও মতবাদ এই প্রশ্নে গান্ধী ব্যক্তিকে সর্বোচ্চে রেখেছেন। গণতন্ত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিয়মও গান্ধীর কাছে অগ্রাহ্য, যখন নীতির প্রশ্ন এসে পড়ে। সকলে এক পক্ষে আর মাত্র একজনও যদি অপর পক্ষে থাকে এবং বিবেকের নির্দেশে নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকে, তবে গান্ধী বলবেন সেটাই তার পক্ষে ঠিক। শুধু বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, প্রয়োজন হলে যে কোনো সরকারের বিরুদ্ধে, শুধু বৃটিশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয় যেকোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার শিক্ষা দিতে হবে, এবং গান্ধী ছিলেন সেই শিক্ষার একজন পথপ্রদর্শক শিক্ষক। তাই নেহরু বলেছিলেন, গান্ধী আমাদের পিঠ সোজা এবং মেরুদণ্ড শক্ত করে দিয়েছেন; সোজা পিঠের উপর কোনো শক্তিই চড়ে বা চেপে বসতে পারেনা।

কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-১৮৮৩) অর্ধ শতাব্দীকাল পরে মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) আবির্ভাব, এবং মার্ক্সের মৃত্যুর পরও প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হতে চলল। মার্ক্সের মৃত্যুর ৩৪ বৎসর পর সমাজতান্ত্রিক রুশবিপ্লব (অক্টোবর ১৯১৭) ঘটে, মার্ক্সের সংগ্রাম প্রথম প্রকৃত সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু গান্ধীর জীবদ্দশাতেই, মৃত্যুর একবৎসর পূর্বে, ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে, গান্ধীজীর স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্য অর্জন করে। অবশ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম সাফল্য আরো অনেক আগেই ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। গান্ধীজীর মৃত্যুর বিশ বৎসরের মধ্যেই সত্যাগ্রহের পরীক্ষাক্ষেত্র বিস্তৃত হতে আরম্ভ করেছে, আমেরিকায় নিগ্রো সিভিল রাইটস আন্দোলন ও মার্টিন লুথার কিংএর জীবন দান, সমাজতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন, ইত্যাদি নূতন সূচনা। কার্ল মার্ক্সের মৃত্যুর বিশ বৎসর পর যদি কেউ বলতেন কার্ল মার্ক্স কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন নি এবং তাঁর মতবাদও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তবে আপাতদৃষ্টিতে সেই উক্তিকে নির্ভুল বলেই মনে হত। কার্ল মার্ক্সের আদর্শ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে আরো পরে, ১৯১৭ সালে। কাজেই আজ যদি কেউ গান্ধী-আদর্শের আপাত ব্যর্থতার কথা বলেন তবে আমরা মার্ক্সের দৃষ্টান্তই তাকে স্মরণ করিয়ে দেবো। মার্ক্সবাদ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার, কাজেই তার প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যাপক; কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নৈতিক বিচার প্রযোজ্য বলে তা প্রথম থেকেই এতটা ব্যাপক ও সর্বজনীন হতে পারেনা। মার্ক্স ও এঙ্গেলসের পর লেনিনের মতো প্রতিভাসম্পন্ন উচ্চকোটির নেতার আবির্ভাব যদি না ঘটতো তবে রুশ বিপ্লব সম্ভব হত কিনা, বা কবে সম্ভব হত, তা বলা শক্ত। মার্ক্সের পাশে এঙ্গেলস ছিলেন, কিন্তু গান্ধীর পাশে ঠিক সেরকম কেউ ছিলনা; তিনি ছিলেন একক, নিঃসংগ, এবং তাই "অন্তরের" ডাক বা inner voice-এর উপর অর্থাত নিজের উপরই

তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে। মার্ক্স-এঙ্গেলসের পর লেনিন মার্ক্সের আদর্শ ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সাহসের সংগে নূতন নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীর পর গান্ধী-আদর্শের ব্যাপক ও সাহসী প্রয়োগ তো দূরের কথা, তথাকথিত গান্ধীশিষ্য ও অনুগামীরা সকলেই গান্ধী আদর্শের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে গতানুগতিক রাজশাসনে ও ক্ষমতার কামড়া-কামড়িতে বা আনুষ্ঠানিক ভজন পূজন আরতিতে মনোনিবেশ করেছেন দেখা যায়। গান্ধী-জীবনের শেষ অংকে নিঃসংগতম সংগ্রামী অভিযানগুলিতে এই বেদনাদায়ক সত্যটি বিশেষ ভাবে প্রকট হয়ে উঠে ছিল। লেনিনের মতো দ্বিতীয় একজন আদর্শবাদী বলিষ্ঠ নেতা কবে গান্ধী-আদর্শের পতাকাটি নোংরা রাজনীতির কর্দম থেকে উচ্চে তুলে ধরবেন জানিনা, এবং তাঁর আবির্ভাব হয়তো ভারতবর্ষে হবে না, হবে অন্য দেশে; যেমন মার্ক্সের পরবর্তী নেতা জার্মানীতে না হয়ে রুশ দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মার্টিন লুথার কিংএর মধ্যে আমরা সেই সম্ভাবনার প্রথম অংকুর দেখতে পেয়েছিলাম। অন্যান্য আবির্ভাবের জন্য আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে। মার্ক্সবাদী আন্দোলন যেমন বিফল, অর্ধসফল, সফল, নানা ধারার মধ্যে নানা দেশে ব্যাপ্ত হয়েছে, গান্ধী আদর্শের আন্দোলনও তেমনি বিফল, অর্ধসফল, সফল, নানা ধারার মধ্যে নানা দেশে প্রবাহিত হবে। গান্ধীবাদ মার্ক্সবাদের পরিপূরক এবং গান্ধীবাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক দেশেও সম্ভব। এক হিসাবে সমাজতান্ত্রিক দেশেই গান্ধী আদর্শের প্রয়োগক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত। মার্ক্সবাদের মতোই গান্ধীবাদ একটি বিশ্বমতবাদ। অনগ্রসর দেশে সমাজতন্ত্র ও অগ্রসর দেশে সর্বোদয়, অনগ্রসর দেশে মার্ক্সবাদ ও অগ্রসর দেশে গান্ধীবাদ, এটিই ভাবী ইতিহাসের পথ বলে মনে হয়। মার্ক্সবাদের প্রাথমিক সাফল্যের কারণ, এটি মানুষের প্রাথমিক জৈবিক চাহিদা পূরণের স্পষ্ট ইংগিত দেয়, মেহনতী মানুষ সহজেই এই আন্দোলনে নামেন। বিকশিত ধনতান্ত্রিক সমাজে মার্ক্সের

সংগ্রামী আদর্শের প্রাসংগিকতা সবচেয়ে বেশী। গান্ধী আদর্শের প্রাসংগিকতা কিন্তু সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রকাঠামো নিরপেক্ষ। ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের আগেও পরিবর্তিত আকারে মার্ক্সবাদ প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়েছে, যেমন চীনদেশ; তেমনি সর্বোদয়ের পরিবর্তে পরাধীনতার অবসানের জন্যও গান্ধীবাদের আংশিক প্রয়োগ হয়েছে, যেমন ভারতবর্ষে। কিন্তু সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয়ের উচ্চতম প্রয়োগ ঘটবে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও স্বাধীন দেশে। অগ্রসর ধনতন্ত্র ও অগ্রসর সমাজতন্ত্রের দেশে, খুব সম্ভব আমেরিকায় ও রাশিয়ায় এবং এদের অনুগামী অন্যান্য দেশে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদ পরস্পরের কাছে আসতে বাধ্য। গান্ধীবাদের কাছে মার্ক্সবাদের শিক্ষা নিতে হবে, এবং গান্ধীবাদকেও মার্ক্সবাদের কাছে শিক্ষা নিতে হবে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, ক্ষমতাবণ্টন ও নৈতিক উৎকর্ষের প্রশ্নে গান্ধীবাদের আলোকে মার্ক্সবাদকে অগ্রসর হতে হবে এবং নাগরিককে নির্ভয় হবার শিক্ষা দিতে হবে। আবার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষেত্রে—বিশেষত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড ও শিল্পজাতীয়করণের প্রশ্নে গান্ধীবাদকে মার্ক্সবাদের সংগে চলতে হবে। এই সব ক্ষেত্রে অহিংস সত্যাগ্রহের অসহযোগের টেকনিক বেশি করে প্রয়োগ করতে হবে এবং তার সুফল হাতে কলমে দেখাতে হবে। সর্বোদয়ের দোহাই দিয়ে বড় বড় পুঁজিপতির পক্ষ সমর্থন বা অর্থনৈতিক "ফ্রি এণ্টারপ্রাইজ"এর জয়গানের কোনো স্থান এতে থাকবে না। সংগে সংগে ডিক্টেটরশিপ ও সার্বিক কেন্দ্রিত শক্তির সম্বন্ধেও শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের দোহাই দিয়ে কোনো মোহ সৃষ্টির অবকাশ থাকবে না। পার্টির "হুইপ" ব্যক্তির বিবেককে আচ্ছন্ন করবে না, আবার ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই পেড়ে সামাজিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ থেকে নিরস্ত থাকাও সমর্থিত হবেনা। "বিশুদ্ধ" মার্ক্সবাদ বা "বিশুদ্ধ" গান্ধীবাদ বলে কিছু নেই। নূতন ভাবে যারা চিন্তা করবেন

বা নেতৃত্ব দেবেন উভয়ক্ষেত্রেই "শোধনবাদী" বলে চিহ্নিত হবার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যে-গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মার্ক্স ও গান্ধী সোচ্চার ছিলেন, মার্ক্সবাদী ও গান্ধীবাদীদের মধ্যে তা খুব কম নেই। মার্ক্স ও গান্ধী বিভিন্ন পর্বে ও বিচিত্র ক্ষেত্রে নিজেদের সিদ্ধান্ত অদলবদল করেছেন, কিন্তু গোঁড়া পূজারীরা পুঁথি ছাড়া নড়েন না, মন্ত্র ভুল হবার ভয়েই তারা অস্থির। একটি বা দুটি বিপ্লব, একটি বা দুটি সাফল্য, বিশ বা পঞ্চাশ বৎসর, এতেই মানব সভ্যতার ইতিহাস সমাপ্ত হবেনা। কাজেই আপাত সাফল্য বা আপাত ব্যর্থতাকে চিরন্তন মনে করে আত্মপ্রসন্ন বা আত্মবিষন্ন হবার প্রয়োজন নেই। খোলা মনে, স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টিতে, আত্মবিশ্লেষণ সর্বদাই প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রের আগেও প্রয়োজন, এর পরেও প্রয়োজন। মানুষের জন্যই সমাজ, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, শিল্পবিপ্লব, পরমাণবিক বিপ্লব, এবং মানুষ মানেই যুগপৎ ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানুষ। অন্য দেশের নজির সর্বদা টানার দরকার নেই ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন না দিয়েও গণমুক্তি সম্ভব, এবং এখানে মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদের যৌথ দায়িত্বে ও প্রয়োগে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ সুন্দর মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মার্ক্স একবার "দর্শনের দৈন্য" (Poverty of Philosophy) নাম দিয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আধুনিক নতুন পরিস্থিতিতে এই "দর্শনের দৈন্য" আবার দেখা যাচ্ছে। শিবির-বিভক্ত যুযুধান চিন্তা সত্যসন্ধানের পরিবর্তে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার নিক্রিয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করছে। আসামী ও ফরিয়াদী পক্ষের উকিল ছাড়া যেন কোনো তৃতীয় বিচারকের স্থান নেই। এই চিন্তার দৈন্য, দর্শনের দৈন্য, স্বাধীন মতামতের দৈন্য সর্বাগ্রে দূর করা দরকার। এবং একাজের দায়িত্ব তরুণ সমাজের, তরুণ বুদ্ধিজীবীদের।

এই প্রসংগে শিল্প সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রশ্নটি এসে পড়ে। অকপটে স্বীকার করতে হবে যে অন্যান্য ক্ষেত্রে অপূর্ব সাহসিকতা ও

দূরদৃষ্টি দেখানো সত্ত্বেও মার্ক্সবাদ ও গান্ধীবাদ উভয়েই এই ক্ষেত্রে চরম অক্ষমতা, অজ্ঞতা, গোঁড়ামি ও ব্যর্থতা দেখিয়েছে। সব কথা বেদে আছে একথা ভাবা যেমন ভুল, তেমনি সব বিষয়ে সব কথা এবং শেষ কথা মার্ক্স বা গান্ধী বলে গেছেন, এটা ভাবাও ভুল। পুঁথিপড়া মতবাদী হওয়ার মুশকিল এই যে পুঁথিগুলি যে মানুষেরই রচনা এবং সেগুলি লিখবার সময় যাঁরা লিখেছেন তাঁরা চোখ কান মন খোলা রেখে নিজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির উপর নির্ভর করেই লিখেছেন একথা মনে থাকেনা। যে কোনো পরিস্থিতির অনুরূপ নজীর যে থাকবেই তার কোন মানে নেই। পরিস্থিতি ও প্রয়োজন মতো মানুষ তার স্বাভাবিক প্রতিভা বলে সমাধান খুঁজে বের করবে।

কেউ যদি বলেন, মার্ক্স প্রবর্তিত শ্রেণী-সংগ্রামের বিচার সব বিষয়ে অভ্রান্ত বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের পদ্ধতিও সর্বাংশে গ্রাহ্য বা উপযোগী নয়, তবে আমরা যেন ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে দুষতে আরম্ভ না করি। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব বিচার বুদ্ধি আছে এবং সব কিছু যাচাই করে দেখার প্রবৃত্তিও আছে। এই বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি যতো প্রযুক্ত হয় ততোই ভালো। হান্টার কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "সত্য সম্বন্ধে একজনের ধারণা অন্যজনের ধারণা থেকে তো পৃথক হতে পারে, হলে কোনটি প্রকৃত সত্য তা কে স্থির করবে?" গান্ধী উত্তর দিয়েছিলেন,: "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই তা স্থির করবে।" কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির সত্য সম্বন্ধে ধারণা বিভিন্ন হলে তাতে কি বিশৃংখলা দেখা দেবেনা? গান্ধী বলেছিলেন, তিনি তা মনে করেন না, সত্যসন্ধান অহিংস না থাকলে অবশ্য বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। প্রশ্ন: "সত্যসন্ধানীর কি নৈতিক মান ও ইনটেলেকচুয়াল মান খুব উঁচু হওয়া আবশ্যিক নয়?" গান্ধীর উত্তর ছিল: "না"। প্রত্যেকের কাছ থেকে খুব উঁচু নৈতিক বা ইনটেলেকচুয়াল মান আশা করা যায় না। যদি একজন ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় এমন একটি সত্য খুঁজে পেলে

থাকে যা দ্বিতীয়, তৃতীয় ব্যক্তি গ্রহণ করবে, তবে এই দ্বিতীয় তৃতীয় ব্যক্তিকেও প্রথম ব্যক্তির সমান নীতিবান ও ধীমান হতে হবে এটা আমি মনে করিনা। গান্ধীর এই কথাগুলি মেনে নিলে দাঁড়ায় এই যে, একজন ব্যক্তি বা নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং নৈতিক ও ইনটেলেকচুয়াল ক্ষমতায় ন্যূন অন্যেরা তা শুধু অনুসরণ করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ বা মতানৈক্য উপস্থিত হলে তা কী করে দূর করা হবে ? নেতা বা নেতৃত্ব অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অনুগামীদের উপর সহজেই একনায়কত্ব বা ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন কি না ? ইত্যাদি সমস্যা সম্বন্ধে সত্যাগ্রহের তত্ত্ব খুব সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে নি। সত্যাগ্রহ প্রয়োগের আগে শিক্ষা ও দীর্ঘ অনুশীলনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিপূজা বা একনায়কত্বের ঝোঁক গান্ধীবাদের মধ্যেও আছে, মার্ক্সবাদের মধ্যে তো আছেই। গোঁড়া গান্ধীবাদী বা মার্ক্সবাদী অবশ্য একথা স্বীকার করবেন না, বরং বিপরীত তর্ক করবেন। কিন্তু এ যুগের সত্যসন্ধানী তরুণরা তাদের নিজেদের সত্য সম্বন্ধে ধারণাটি যেন সাহসের সংগে নিজেদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদ উভয়ের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করার পরও আরো কিছু কাজ বাকি থেকে যায়, সেটি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজেই তার বাঞ্ছিত সত্য কি তা স্থির করা। গান্ধীবাদী বা মার্ক্সবাদী হওয়াই যথেষ্ট নয়, আত্মবাদীও হওয়া দরকার। গান্ধীবাদ, মার্ক্সবাদ বা অন্য যে কোনো মতবাদ পথের সাধারণ নির্দেশ দেয় মাত্র, কিন্তু বিশিষ্ট নির্দেশটি আসা উচিত ব্যক্তির নিজের ভিতর থেকে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিক উৎকর্ষ বজায় না থাকলে কোনো মতবাদই সমাজে শুদ্ধ বা ঠিক থাকতে পারে না। ক্ষমতার মধ্যে যে খারাপ করার শক্তি রয়েছে, তা যদি নিরংকুশ হয় এবং ব্যক্তির প্রতিবাদ শক্তি যদি নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে সত্যমিথ্যা, ন্যায়অন্যায়, ভালমন্দ, শুভ অশুভ, কল্যাণ অকল্যাণ কিছুই আর বিচারসহ থাকেনা।

"সভ্যতার ইতিহাস শ্রেণীসংঘাতের ইতিহাস", এই কথাটি মূলত সত্য। কিন্তু "শ্রেণী"র কোনো সর্বকালীন সংজ্ঞা নেই। শ্রেণী-সংঘাতের মতো ভাবসংঘাতও এক হিসাবে সভ্যতার নিয়ামক। প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য ঘটে এবং শ্রেণী-সংঘর্ষেরও বৈচিত্র্য দেখা যায়। আমরা যদি শুধু বর্তমান কালের ইতিহাসেই অন্ধ হয়ে না পড়ি তাহলে "শ্রেণী" সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও ব্যাপক হতে বাধ্য। গীতায় "চতুর্বণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম-বিভাগশঃ" উক্তিতে এক বিশেষ সমাজের শ্রেণী বিন্যাসের কথাই বলা হয়েছে। এখানে বর্ণ ও শ্রেণী সমার্থক। শ্রেণীবিভাগ যে অর্থনৈতিক হবেই এমন কোনো কথা নেই, যেমন ব্রাহ্মণ্য বা পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্য অর্থনৈতিক ছিলনা। সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সমাজে ক্ষমতা-বণ্টনের বিন্যাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যে, এমনকি প্রত্যেক সমাজেই, দেখা যায় একদল লোক—সংখ্যায় তারা গরিষ্ঠও হতে পারে—মনে করে তারা সমাজের মধ্যে আছে বটে কিন্তু তারা সমাজের কেউ নয়; অর্থাৎ সমাজের ক্ষমতার কেন্দ্রটি যারা দখল করে আছে তারা এদের আপনার লোক নয়; তাদের উপর এদের কোনো প্রভাব, জোর বা দাবী নেই, তারা যেন এদের থেকে পৃথক, এদের গণ্ডীর বাইরের লোক, তাদের দৃষ্টিভংগির সংগে এদের দৃষ্টিভংগির প্রধান প্রধান ব্যাপারে যেন কোনোই মিল নেই। পার্টি-রাজনীতি শাসিত দেশে দেখা যায়, যে-পার্টি সরকার গঠন করে তারাই হয় শাসক, সেই পার্টির বাইরের সবাই নিজেদের মনে করে শাসিত। একথা ঠিক, শাসক ও শাসিতের মধ্যে আইনত কোনো ভেদরেখা নেই, উভয়েই ট্যাক্স দেয়, উভয়েই কতকগুলি ন্যূনতম সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু "আমি ক্ষমতার মধ্যে আছি," এই বোধ শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন পার্টির লোকই অনুভব করে থাকে। এই বোধ থেকে স্বভাবতই আরো একটি বোধ সঞ্জাত হয়—"আমি স্বাধীন", "আমি সবচেয়ে বেশী স্বাধীন"। বিরোধী দলভুক্ত ব্যক্তি সেই

তুলনায় নিজেকে কম স্বাধীন, কখনো বা খুবই কম স্বাধীন বলে জ্ঞান করে; এবং "আমি ক্ষমতার বাইরে" এই বোধ তাকে এক ধরণের পরাধীন "সর্বহারা"য় পরিণত করে। অর্থাৎ বিত্তের বিচারে না হলেও ক্ষমতা বাটোয়ারার ব্যাপারে সে "নিঃস্ব." "নিপীড়িত", "সর্বহারা" হয়ে পড়ে। ক্ষমতার মধ্যে এবং ক্ষমতার বাইরে, ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন এই দুটিই হচ্ছে মৌলিক শ্রেণী, এবং এই দুই মৌলিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বই সভ্যতার, ইতিহাসের, সমাজ বিবর্তনের নিয়ামক। অতএব মানুষকে—মানুষের মনকে—স্বাধীন করতে গেলে এই মৌল শ্রেণী-দ্বন্দ্বের বিলোপ সাধন করতেই হবে। অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেই এই দুই মৌলিক শ্রেণী লুপ্ত হয়, একথা ঠিক নয়, কারণ অর্থ বণ্টনের সমস্যা ও ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা এক নয়। পার্টি এবং পার্টি-শাসন লুপ্ত না হলে সমাজ প্রকৃতপক্ষে মুক্ত ও স্বাধীন হতে পারেনা। অর্থাৎ ক্ষমতার কেন্দ্রটি বিকেন্দ্রিত হয়ে যখন পরিধি পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে একমাত্র তখনই মানব সমাজ মুক্ত, স্বাধীন, সমান হবে। অন্য যে কোনো সাম্য—ভোটের, আইনের, অর্থের—কথার কথা মাত্র। প্রোলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরও সমাজ নতুন করে শ্রেণী-বিভক্ত হতে পারে, বা হবে। তখন বিবদমান বা বিপরীত দুই শ্রেণী হয়ে দাঁড়ায় পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত দলের মানুষ। অর্থনৈতিক ভাবে ছাড়াও যে শ্রেণীবিভাগ হতে পারে তার প্রমাণ, সমাজবাদেও দেখি শুধু বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েত নয়, কৃষক, শ্রমিক ও ফৌজ এই তিন শ্রেণীর মানুষের প্রতি স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, যদিও এই তৃতীয় ফৌজী দলটিকে অর্থনৈতিক ও অন্য কোনো হিসাবেই শ্রেণী বলা চলে না। ফৌজ যেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের এক প্রধান বাহু সেখানে এই স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। আধুনিক কালে আবার ছাত্র বা যুবশক্তি (স্টুডেণ্ট পাওয়ার, ইয়ুথ পাওয়ার)কে আলাদা শ্রেণী বা শক্তি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

গান্ধী ও মার্ক্সের ইতিহাসদর্শনে একটি মৌল মিল আছে। গান্ধী

মনে করতেন, মনুষ্যসমাজ মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও মোটের উপর প্রগতিশীল ; মার্ক্স ও মানব প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। গান্ধী এই প্রগতিকে বলতেন ঈশ্বরের বিধান, মার্ক্সবাদী বলবেন, ইতিহাসের বিধান। বিপুল প্রগতিসত্ত্বেও মানুষের স্বভাব খুব উন্নত হয়নি, যদিও শিক্ষা অনেক উন্নত হয়েছে। ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির, জাতির সংগে জাতির সংঘর্ষ, যুদ্ধ, পরমাণবিক বোমা এগুলি মানুষের আদিম রিপুগুলিরই চিহ্ন বহন করছে। সামাজিক প্রগতি নিশ্চয়ই ঘটেছে, কিন্তু আশার কথা এই যে মাঝে মাঝে এমন ক্ষণজন্মা মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ অস্বীকার করে মানব সাধারণের ঐক্য ও সহভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন। মার্ক্সের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে না থাকলেও মার্ক্স নিজে ভবিষ্যৎ মানব সমাজের এক বিরাট সম্ভাবনাময় আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বুদ্ধ, যীশু এবং গান্ধীও তাই। মার্ক্সবাদী অবশ্য দেখাবেন যে এই সব মানবতাবাদীরা কেউই ভুঁইফোঁড় অতিমানব ছিলেন না, বাস্তব সামাজিক অবস্থা থেকেই তাদের উদ্ভব, এবং প্রগতির উৎসও খুঁজতে হবে ঐ পরিবর্তনশীল বাস্তব অবস্থার মধ্যেই। মার্ক্সবাদী বস্তু এবং বাস্তব অবস্থাকে প্রগতির জন্য দায়ী করেন ; গান্ধীবাদী দায়ী করেন ব্যক্তিকে। মার্ক্সবাদী ও গান্ধীবাদী উভয়েই অগ্রসর ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠির নেতৃত্বে বিশ্বাসী। মার্ক্সবাদীর কাছে এই প্রাগ্রসর নেতৃত্ব হচ্ছে পার্টি, গান্ধীবাদীর কাছে সত্যাগ্রহী। পার্টি বা সত্যাগ্রহী নেতৃত্ব একধরণের একনায়কত্বে বিশ্বাসী। বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে মেহনতী মানুষের অগ্রণী অংশ বা অগ্রণী শ্রেণী সংগঠন ; আবার সত্যাগ্রহীও তেমনি নৈতিক চেতনা সম্পন্ন অহিংস অকুতোভয় অগ্রণী অংশ। সত্যাগ্রহীদেরও হাল ধরেছিলেন ব্যক্তি—মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। মার্ক্স-বাদী বিপ্লবীদের কাজ বাস্তব অবস্থার বিন্যাস বদলানো, কারণ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেই মানুষের স্বভাব ও আচরণ বদলাবে। এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য মার্ক্সবাদী সহিংস বলপ্রয়োগেও

দ্বিধা করেন না। তিনি যে হিংসা করতে ভালবাসেন বা পছন্দ করেন তা নয়, তিনিও শান্তি চান, হিংসা চান না, কিন্তু তার কাছে হিংসাই সমাজ বদলানোর দ্রুততম পন্থা, এবং সেই হিসাবে খানিকটা বাঞ্ছনীয়ও বটে। ক্ষমতার দুর্গটি দখল করতে পারলে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে বা মানব সমাজের স্বার্থে প্রয়োজন হলে—হবেই—বলপ্রয়োগ করে মানুষের স্বভাব পরিবর্তন করানো হবে; কালচারাল রেভল্যুশনের তাৎপর্য সম্ভবত তাই। কিন্তু এই বলপ্রয়োগ করতে গিয়ে এই বলপ্রয়োগ থেকেই নূতন বিপত্তি ঘটতে পারে। গান্ধীর উপায় ছিল আলাদা। মানসিক বা নৈতিক পরিবর্তন ঘটানোর উপরই তাঁর জোর ছিল। ব্যক্তির বদলে গোষ্ঠীবদ্ধ সত্যগ্রহীরা এই পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করতে পারেন। গণতন্ত্রে যদিও সাংবিধানিক ও আইনগত ভাবে প্রত্যেক মানুষই ক্ষমতার অংশীদার, কার্যত তা হয় না।

ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ আমরা সকলেই চাই। কিন্তু এমন সমাজ কী করে প্রতিষ্ঠিত হবে, তা বলা সহজসাধ্য নয়। ক্ষমতা (power) একটি নির্মম সত্য; ক্ষমতার প্রয়োজন আছে এমন ধারণাও এখন প্রায় বদ্ধমূল। রাহাজানি, হানাহানি, হিংসা, ঘৃণা, আন্তর্জাতিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ ইত্যাদির বহু বিস্তৃতির ফলে এমন ধারণা আমাদের বদ্ধমূল যে পুলিশ না থাকলে, রাষ্ট্রশক্তি না থাকলে, বে-আইনি বা অরাজক ক্রিয়াকলাপ কিছুতেই রোধ করা যাবেনা। মানুষ, মনুষ্যত্ব, মানবিকতার উপর, মানুষের উপর, তার শুভবুদ্ধির উপর আস্থার বদলে আমরা আইন, পুলিশ, রাষ্ট্র ইত্যাদিতেই আস্থা রাখতে শিখেছি। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে ক্ষমতা সর্বদাই নীতিজ্ঞান ধ্বংস করে, মানুষের সুবুদ্ধি নষ্ট করে; যতোটা অন্যায় বা গর্হিতকে শাসন বা দমন করে, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্যায় বা গর্হিতকে পোষণ করে, রক্ষা করে, প্রশ্রয় দেয়।

ক্ষমতা বহুগুণ কেন্দ্রিত, এখন ক্ষমতা ভয়াবহরূপে বিপুলায়তন। ক্ষমতার এই বৃদ্ধি কি সমাজের স্থায়িত্বকে নিশ্চিন্ত করেছে? সমাজ-দেহ থেকে অন্যায়ের প্রবণতা সত্যিই কমিয়ে দিতে পেরেছে? ক্ষমতার প্রয়োগ এখন সার্বিক, কিন্তু স্থায়ী কোনো শুভবুদ্ধি কি তাতে জাগ্রত হতে সহায়ক হয়েছে? যুদ্ধে ক্ষমতা বা শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা শক্তি লড়াই করেছে, এবং তারপর পরবর্তী যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার মতো অসংখ্য অশুভ শক্তির জন্ম দিয়েছে। যুদ্ধের সমাপ্তি কোনো স্থায়ী শান্তি আনেনি। একটি বা দুটি অশুভকে ক্ষমতা সাময়িক ভাবে বলপ্রয়োগে পর্যুদস্ত করতে পেরেছে, কিন্তু তার পরিবর্তে আরো অনেক অশুভ শক্তি উদ্গত হয়েছে। ক্ষমতার প্রয়োগে কোনো ইতিবাচক ফলই লাভ করা যায়নি, সৃষ্টিশীল এমন কিছুই পাওয়া যায়নি যা সর্বাংগীন কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে। অন্যায়, অশুভ, দুর্নীতি, কদাচার এগুলি বলপ্রয়োগ বা ক্ষমতার প্রয়োগে দূর করা বা জয় করা যায় না। তা যদি না যায়, তবে একমাত্র বিকল্প যা অবশিষ্ঠ থাকে তা হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা বলপ্রয়োগ না করার নীতি। গান্ধীজী বিংশ শতকে এই নব্য নীতির সবচেয়ে বড়ো প্রবক্তা ও পথপ্রদর্শক। ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্ষমতা পরিহারের নীতি দুর্বলের নীতি নয়। ১৯৪৭ খৃঃ ২রা জুলাই দিল্লি প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন: "আমি আপনাদের হিংসা শিক্ষা দিতে পারবো না, কারণ আমি নিজে হিংসায় বিশ্বাসী নই। আমি আপনাদের শুধু শিখাতে পারি কারো কাছে মাথা নত না করতে, তাতে যদি মৃত্যু বরণ করতে হয় তবুও। প্রকৃত সাহস তাকেই বলে। কেউই আমার কাছ থেকে এই সাহস কেড়ে নিতে পারবে না।"

এই সাহসিকতার জন্যই নিহত গান্ধী একালের ভারতবর্ষে তরুণতম নেতা, প্রবীণতম দার্শনিক।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট